পিতৃস্মৃতি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জিজ্ঞাসা
ক লি কা তা

প্রকাশ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯
১এ, ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

পি তৃ স্মৃ তি

ছেলেবেলা

কলকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িটা যেন একটা প্রাচীন বটগাছ, প্রচুর ডালপালা ছড়িয়ে বেশ কয়েক বিঘা জমি অধিকার করে রয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে বাড়িটাকে খুব প্রাচীন বলা চলে না। কি করেই বা তা হবে, কলকাতার শহরই তো হল হাল আমলের, ইংরেজের হাতে তার ভিত্তিপাত। ইংরেজ বণিকেরা তাদের ব্যাবসার সুবিধার জন্য গঙ্গার উপকূলে যখন কলকাতার শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করল, আমার পূর্বপুরুষেরা সেই সময়টাতেই জোড়াসাঁকোর ধারে আমাদের বাড়ি তৈরি করলেন। ঐতিহাসিক প্রাচীনতার দাবি করতে না পারলেও এই বাড়িতে আমাদের বংশের সাত-আট পুরুষ বাস করে গেছেন। ঠিক ভগ্নাবস্থা না হলেও, বাড়িটাকে জড়ায় যে ধরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইট-পাথরের অবস্থা যেমনই হোক, এই বাড়ির সঙ্গে যে-জীবনধারা শতাধিক বর্ষ ধরে জড়িত ছিল তার চিহ্ন সেখানে এখন আর পাওয়া যায় না। বাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সারশূন্য নিষ্প্রভ কঙ্কালের মতো— প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে আর, হাসির ধ্বনি কোথাও নেই, গান শোনা যায় না ঘরে ঘরে, ভাবে বিভোর হয়ে কেউ সে-বাড়ির ছাদে-বারান্দায় আর ঘুরে বেড়ায় না।

এই বাড়িরই কোনো এক ঘরে আমি জন্মেছিলুম। আমার মনে হয় শুভক্ষণেই আমার জন্ম হয়েছিল। বাড়ির ঐশ্বর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান। আমার পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন বাড়ির কর্তা। তাঁর সাত ছেলের মধ্যে আমার পিতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আমার জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে আমিও সর্বকনিষ্ঠ হয়ে জন্মালুম। আমার আগে বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে জন্মেছে, আমার জন্ম সেইজন্য বিশেষ একটা ঘটনা বলে পরিগণিত নিশ্চয়ই হয় নি। তবে আত্মীয়স্বজনের মহলে 'রবিকাকা' সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাই শিশু অবস্থায় আমারও একটু খাতির যে হয় নি তা নয়। তার নিদর্শন পেলুম কিছুদিন আগে 'পারিবারিক খাতা'য়। আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে ফেরবার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে থাকতেন বালিগঞ্জে।

সেখানে তাঁর বাড়িতে আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রত্যহ একত্র হতেন বিকালবেলায়। খেলাধুলা, গান-বাজনা, আলাপ-আলোচনা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। যে ঘরে আড্ডা বসত সেখানে রাখা থাকত একটা মোটা-গোছের বাঁধানো খাতা। যখন যার খেয়াল যেত, যেমন খুশি তাতে লিখে রাখতেন। এরই নাম ছিল 'পারিবারিক খাতা'। তার পাতা ওলটালে দেখা যায় হালকা-রকমের হাসির কথা, মজার কবিতা, নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ চুটকি প্রবন্ধ— কত কি যে ভালোমন্দ খেয়াল মতো লেখা তার পাতায় পাতায় আছে, যা পড়লে বেশ কৌতুক বোধ হয়। এই খাতাটি কয়েক বছর আগে আমার হাতে আসে। পড়তে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল ১৮৮৮ সালে লেখা আমার দাদা হিতেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের দুটি ছোটো মন্তব্য। মন্তব্য দুটি এখানে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। আশা করছি আমার পরলোকগত দাদারা আমাকে ক্ষমা করবেন। তাঁদের নিষেধ ছিল এই খাতার কোনো লেখা প্রকাশ করা।

রবিকাকার সন্তান •

November, 1888

রবিকাকার একটী মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে, কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে।

প্রথম পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে লিখিত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

March, 1890

হিদ্দা, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও এখন চাক্ষুষ—। প্রকৃতিটা গম্ভীর যা'…তা' অস্বীকার করবার যো নেই। তবে কি না সামাজিক জীব না হ'য়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তা'ও…মনে হয় না। আর গম্ভীর হয়েছে বলে যে হাসবে না তা নয়। রবিকাকারও প্রকৃতি আসলে যদি [ধর গম্ভী]র। গম্ভীর এবং গোমড়ায় তফাৎ আছে। হাসলেই যে গাম্ভীর্য্য মারা যায় এমনও বোধ হয় না। আসল কথা গভীর[তা,] সেটা আবশ্যক— হাসি মানে সারাক্ষণ দাঁত বের করে থাকা না।

B. T. [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এতেও শেষ হল না, মন্তব্য আরো চলল—

March, 1890

বোলদা, এক হিসেবে হিদ্দা ঠিক বলেছেন। খোকা যোগ করুক আর না করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে।

সরলা [সরলা দেবী চৌধুরানী]

খোকা বেচারা যোগই করুক আর গোলযোগই করুক্, জন্মাবার আগে থেকে তার উপর যে রকম সমালোচনা চলেছে তা'তে তার পক্ষে কতদূর সুবিধের বলতে পারি নে। বড় হ'লে সে বেচারীর না জানি আরও কত সইতে হবে কিন্তু তখন হয়ত প্রতিবাদ করতে শিখ্‌বে—এরকম নীরবে সহ্য করবে না। রাম না হ'তে যে রামায়ণ হয়েছিল সে বিষয়ে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস দেখ্‌বার আবশ্যক নেই—হাতে কলমে প্রমাণ এইখেনেই। আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা [হ'ত এখন হয়] জন্মাবার আগে।

B. T. [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আমার দাদাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী কতটা ফলবতী হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়—তবে এইটুকু বলতে পারি, দাদা হিতেন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সত্ত্বেও ধ্যানধারণায় আমার জীবন অতিবাহিত হয় নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিবার তখন বৃহৎ ছিল। বাড়িটা মস্ত বড়ো, তবু সকলকে ধরত না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময় একবার নাকি আমাদের বাড়িতে আলোচনা হয় তার পরিবারের সংখ্যা কত। দাদাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল তাঁর পরিবার বড়ো, না আমাদের পরিবার বড়ো। বলুদাদা কাগজ কলম নিয়ে দুই পরিবারের সংখ্যা গুনতি করে মহা-উল্লাসে সবাইকে জানালেন মহারানীর পরিবার সংখ্যা টেনেটুনে মাত্র একশত। মহর্ষির পরিবারের শতাধিক আত্মীয়স্বজন এই একখানা বাড়িতেই বাস করছে। মহর্ষির কাছে ভিক্টোরিয়া হেরে গেলেন।

ছেলেবেলায় আমরা এই হাটের মধ্যে মানুষ হয়েছি। আমাদের দেশে যতদিন একান্নবর্তী পরিবারের রেওয়াজ ছিল, একত্রে বাস করার অনেক সুবিধা সত্ত্বেও একটা অসুবিধা ছিল, আমি ভুক্তভোগী বলে উল্লেখ করছি। আমার

ভাইবোনেরা সকলেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য, সুস্থ সুন্দর তাঁদের চেহারা। আমার সহোদরা ভগ্নীর রঙ যেমন ফরসা, চেহারাও অপরূপ সুন্দর ছিল। বাড়ির মধ্যে আমারই রঙ কালো, চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অত্যন্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে হীনমন্যতা তা যেন ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড়ো হয়েও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না। একান্নবর্তী পরিবারের এই অসুবিধা— যাদের কোনো দুর্বলতা আছে, যাদের দেহমন বলিষ্ঠ নয় তাদের বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমার যখন সাত-আট বছর বয়স, কয়েক মাসের জন্য পিতা আমাকে শিলাইদহ নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে খোলা মাঠে, নদীর চরে রোদবৃষ্টিতে ঘুরে বেড়িয়ে শরীরের উন্নতি খুবই হল বটে তবে গায়ের রঙ আরো এক পোচ কালো হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে এসে যখন গগনদাদাদের বাড়িতে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে গেলুম, তিনি আমার মুখ তুলে ধরে বললেন— 'ছিঃ, রবি তাঁর ছেলেকে একেবারে চাষা বানিয়ে নিয়ে এলেন।' সেই কথা শুনে আমি ঐ বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিলুম।

পরিবারের কর্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রভাব পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। অথচ তিনি থাকতেন না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়াটে বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠাকন্যা সৌদামিনীকে। আর তাঁর কাছে থাকতেন তাঁর প্রিয়শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। যদিও বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেন কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলোও তাঁর আদেশমতোই চলত— কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, নির্দেশের অভাবে কোনো শৈথিল্য নেই। তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর প্রভাব অনুভব করত। তাঁর আদর্শ সমস্ত পরিবারকে এমন অভিভূত করে রেখেছিল যে তাঁকে স্পষ্টভাবে কোনো আদেশ দিতে হত না। এমনই অদ্ভুত ছিল তাঁর ক্ষমতা!

মহর্ষি থাকেন পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা সর্বদাই যেতেন তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করতে অথবা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের নানান প্রদেশ

থেকেও জ্ঞানী গুণী তত্ত্ব-জ্ঞান-অনুসন্ধানী বহু লোকের সমাগম হত। আমরা বাইরে থেকে অবাক হয়ে দেখতুম প্রবীণ লোকেরাও কত সন্তর্পণে ভক্তিবিনীত ভাবে কর্তাদাদামহাশয়ের ঘরে ঢুকছেন। তাঁর সেই ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন শান্ত সমাহিত মূর্তির সামনে যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যে-কেউ উপস্থিত হতেন— তাঁদের সব আত্মগরিমা অহংকার প্রগল্‌ভতা যেন খসে যেত মুহূর্তের মধ্যে, ভক্তিতে অবনত হয়ে তাঁরা বসতেন মহর্ষির কথা শুনতে।

আমরা ছোটোরা বিশেষ কয়েকটা দিনে তাঁর কাছে যেতে পেতুম। সাতই পৌষ, এগারোই মাঘ, নববর্ষ ও মহর্ষির জন্মদিবস তেসরা জ্যৈষ্ঠতে যেতুম তাঁকে প্রণাম করতে। তাঁর ঘরে ঢুকতে আমাদের কী ভয় করত এখনো মনে পড়ে। কিন্তু পায়ের ধুলো নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখে যে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত তা দেখে সব ভয় কোথায় চলে যেত। আর খুব ভালো লাগত যখন দেখতুম আমাদের মতো ছোটো ছেলেমেয়েদেরও সকলের নাম তাঁর মনে আছে। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে যখন বেরিয়ে আসতুম মনে হত যেন নূতন জন্মলাভ করলুম।

কর্তাদাদামহাশয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন আমার বড়ো পিসিমা সৌদামিনী দেবী। পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর পর থেকেই নিজের সংসার অবহেলা করে তিনি পিতার সেবায় একান্তভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। শেষবয়সে মহর্ষি কানে কম শুনতেন বলে সব সময়েই কাউকে-না-কাউকে কাছে থাকতে হত। বাইরের ঘরে যখন বসতেন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী থাকতেন কাছে, অন্য সময় পিসিমাই দেখাশুনা করতেন। খাওয়া সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি হবার উপায় ছিল না। খুব সাদাসিধা খাবার উপকরণ— কিন্তু বাঁধা নিয়মের একচুল ব্যতিক্রম হলেই বিপদ। ডাল তরকারি সব রান্নাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি থাকা চাই। 'ঠাকুরবাড়ির রান্না মিষ্টি'— লোকের এই ধারণা সম্ভবত এর থেকেই হয়েছে। সাদাসিধা হলেও, মহর্ষির আহারের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। দুধ ও পায়েস খাবার রুপোর বাটির আয়তন দেখে আমাদের আতঙ্ক বোধ হত; ভাবতুম বুড়োবয়সে কর্তাদাদামহাশয় এতখানি দুধ-ক্ষীর কী করে খান। আগেকার কালের লোকদের হজমশক্তি নিশ্চয়ই বেশি ছিল— শুনতে পাই রামমোহন রায় নাকি একটা আস্ত পাঁঠার মাংস একাই খেতে পারতেন।

কর্তাদাদামশায়ের ঘর ছিল দোতলায়। একতলায় থাকতেন বড়ো জ্যাঠা-মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যেতেও আমার কম ভয় লাগত না। পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা পার হলেই মারতুম এক দৌড় একেবারে বাগানে। জ্যাঠামহাশয় তাঁর লম্বা দাড়ি-গোঁপের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমাদের দিকে যখন তাকাতেন ভয় হবারই কথা, কিন্তু যখন তাঁর সরল অট্টহাসিতে সমস্ত বাড়িটাতে হাসির ঢেউ খেলে যেত তখন ভয় চলে যেত, বুঝতে পারতুম তিনিও অন্য মানুষদের মতোই। জ্যাঠামহাশয়ের হাসি ভোলবার মতো নয়। তাঁর শিশুতুল্য নির্মল অন্তর থেকে হাসি যেন ফোয়ারার মতো উপচে পড়ত।

জ্যাঠামহাশয়ের নিজেরই মস্তো বড়ো সংসার, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, কিন্তু সংসার তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি কোনোদিন। পৃথিবীতে থেকেও তিনি যেন পৃথিবীর বাইরে। বাস্তব ছেড়ে ভাবরাজ্যে তিনি অহরহ বাস করতেন। তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, বেদান্ত ছিল তাঁর মনের খোরাক। তিনি জার্মান দার্শনিক কাণ্টের তত্ত্ববিচারের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু নীরস পাণ্ডিত্যই কেবলমাত্র তাঁর অবলম্বন ছিল না। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে আমরা ওঁর কবিমনের পরিচয় পাই। কল্পনার সঙ্গে ছন্দ ও ভাষার অদ্ভুত সমন্বয়ে এই কাব্য বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বই বেরোনোর পর শুনতে পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদন বার্-লাইব্রেরিতে তাঁর বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন— কারো কাছে কখনও যদি টুপি খুলে দাঁড়াতে হয় তো আমি দাঁড়াব ওই স্বপ্নপ্রয়াণের কবির কাছে। বড়ো জ্যাঠামহাশয় যে কেমন হাস্যরসিক ছিলেন তার পরিচয় পাই কতকগুলি চুটকি পদ্যরচনা থেকে। কাউকে ডেকে পাঠাতে হবে, কোনো বৈষয়িক বিষয় জানাতে হবে, নানান তুচ্ছ প্রয়োজনে গদ্যপত্র ব্যবহার না করে দু-চার লাইন পদ্য লিখে পাঠানো তাঁর স্বভাব ছিল। এই ছড়াগুলির মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরস থাকত। একটা ছড়া মনে পড়ছে—

দখিনে, উত্তরে, উদয়ে, অস্তে
গতি তোমার সরবত্র।
তোমাদের গুরুদেবের হস্তে
সঁপিয়া দিবে এই পত্র॥

বলিবে "নমো রবয়ে।
বড়দাদার তব এ
বিচিত্র হাতের লেখন।
পড়িয়া দেখি সত্বর,
দিবেন এর উত্তর,
বিদায় হই এখন ॥"

জ্যাঠামহাশয় দার্শনিক চিন্তা ছেড়ে যখন বিশ্রাম নিতে চাইতেন, বিশ্রামের উপায় ছিল অভিনব। অঙ্কের জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর কাছে খেলার মতো ছিল। তাঁর টেবিলে একরাশ খাতা থাকত— তার প্রতিপৃষ্ঠায় কত-না অদ্ভুত রেখাচিহ্ন আঁকা থাকত, দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগত। অঙ্ক ছেড়ে কখনো সাহিত্য পড়তে ইচ্ছে হত। অবসর সময়ে পড়বার খোরাক ছিল— রবিন্‌সন ক্রুসো এবং ডিকেন্স অথবা স্কটের গল্পের বই। শেষবয়স পর্যন্ত রবিন্‌সন ক্রুসো অগণ্যবার পড়েছেন। তাঁর একটি খেলা ছিল— কাগজ ভাঁজ করে জিনিস প্রস্তুত করা। যেমন-তেমন করে ভাঁজ করা নয়। কোনো নতুন জিনিস বানাতে হলে তার ভাঁজের প্রণালী যেই আবিষ্কার করলেন, মনে রাখার জন্য অমনি ছড়া তৈরি হয়ে যেত। এইরকম অনেক ছড়া একটা খাতায় লেখা ছিল, তার নাম দিয়েছিলেন বক্সোমেট্রি। আমাদের ধরে সেই ছড়া মুখস্থ করিয়ে কাগজের বাক্স তৈরি করা শেখাতে তাঁব মহা উৎসাহ ছিল। আর-একটি বিষয় উল্লেখ করছি, অনেকেরই হয়তো জানা নেই। বাংলাভাষায় শর্টহ্যাণ্ড প্রবর্তন করেন জ্যাঠামহাশয়। তাঁর এই রেখাক্ষর-বর্ণমালাও সুখপাঠ্য পদ্যে লেখা।

বড়ো জ্যাঠামহাশয়ের সরল শিশুপ্রায় অন্তঃকরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি একটি ট্রাই-সাইকেল কিনেছিলেন— মস্তবড়ো তার তিনটে চাকা। সকালবেলায় সেই ট্রাই-সাইকেলে চেপে তিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার অদ্ভুত পোশাক ছিল— পায়জামার উপর ডবল কোট। কোটের বোতাম লাগানো হাঙ্গামা বলে প্রথম কোটটি উলটো করে পরতেন, তাতে বুক ঢাকা হয়ে যেত— তার পর অন্য কোটটি যেমন সকলে পরে, সোজাভাবেই পরতেন। এই বিচিত্র সাজে গম্ভীর ভাবে বালিগঞ্জ পাড়ায় বেড়িয়ে আসতে তাঁর কিছুমাত্র সংকোচবোধ ছিল না।

জ্যাঠামহাশয়ের কাছে সেইসময়কার গণ্যমান্য অনেক লোকই দেখা করতে আসতেন। তাঁদের গুরুগম্ভীর আলোচনার বৈঠকঘর থেকে আমরা বহুদূরে থাকতুম, তবু থেকে থেকে কানে আসত তাঁর অট্টহাসির শব্দ। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কখন কোনো সময় তাঁদের খাবার নিমন্ত্রণ করে বসতেন। পরমুহূর্তেই সে কথা যেতেন ভুলে। এই নিয়ে তাঁর বড়োবউমা হেমলতা দেবীকে প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়তে হত। কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রলোক দুপুরবেলায় এসে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কে মেতে রয়েছেন, কেউই ওঠবার নাম করেন না, হেমলতা দেবী খাবার সময় হয়েছে খবর দেবার জন্য কেবলই ঘোরাঘুরি করছেন, এমন সময় একটি চিৎকার কানে এল— চাকরকে ধমক দিচ্ছেন—"খাবার কোথায়, এঁদের খেতে দিবি নে ?" এইরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। অনেকসময় কোনো ভুল হয়ে গেছে অনুমান করে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা নিজেরাই চলে যেতেন।

জ্যাঠামহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞানের সত্যই অভাব ছিল। 'সার সত্যের আলোচনা' নামে একটি দার্শনিক রচনা লেখা শেষ হয়ে গেছে। কোনো বিদ্বজ্জন-সভায় সেটা পড়া হবে। কিন্তু তার আগে কাউকে পড়ে শোনানো দরকার। লেখা যখন শেষ হল, বাড়িতে কাউকে খুঁজে পান না। কিন্তু অপেক্ষা করা তো যায় না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এক বুড়ি দাসী, আর কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল ঐ দাসী দ্বিজেন্দ্রনাথের সামনে ঘোমটা টেনে মেঝেতে বসে, আর উনি 'সার সত্যের আলোচনা' আগাগোড়া পড়ে শোনাচ্ছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কিন্তু এই বাস্তব জগতের সঙ্গে যেন তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনা জগতে নিছক একটি ভাবরাজ্যে বাস করতেন।

আমার মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনিও থাকতেন পার্ক স্ট্রীট পাড়ায়, মহর্ষির বাড়ির কাছেই। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। তিনি ছিলেন পুরানো আমলের বিলাত-ফেরত, প্রথম ভারতবর্ষীয় আই. সি. এস.। তাঁর বাড়িতে বিলাত-ফেরতই বেশি যাতায়াত করতেন। বালিগঞ্জ পাড়াটা ইংরেজরা তাদের বাসস্থান করে নিয়েছিল, তার মধ্যেই মাথা গুঁজে কয়েকজন ইংরেজ-ঘেঁষা বাঙালিও বাসা

করেছিলেন। এঁরা অধিকাংশই গণ্যমান্য—কেউ গবর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বেশির ভাগই ছিলেন ব্যারিস্টার, আইনব্যবসায়ে কৃতী হয়ে উপার্জন করছিলেন প্রচুর। ইংরেজ-রাজত্বের গোড়ার আমলে জীবিকা অর্জনের রাস্তা ছিল খুব সীমাবদ্ধ—প্রতিভাবান যুবকমাত্র সুযোগ পেলেই বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসতেন। বিলাত ফেরতের খাতির তখন খুব। হাই কোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে টাকারও অভাব হত না। এঁরাই আবার অবসরমতো দেশোদ্ধারের কাজে খানিকটা মন দিতেন। সেই সময়ে কংগ্রেসের নেতা যাঁরা ছিলেন অধিকাংশই প্রতিষ্ঠাবান আইনব্যবসায়ী। নেতা হবার সব গুণই তাঁদের ছিল, বুদ্ধি বাগ্মিতা ধন এবং খ্যাতি— কেবল ছিল না দেশের ও দেশবাসীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ। এইজন্য সে যুগের কংগ্রেস ছিল বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ দেশবাসীর অন্তরের সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। কংগ্রেসের আন্দোলনে তাদের মনও সেইজন্য সাড়া দেয় নি।

কিন্তু কংগ্রেসের কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তারা সকলেই প্রতিভাবান পুরুষ। একই সময়ে এতগুলি অসামান্য শক্তিমান পুরুষের ভারতমাতা জন্ম দিয়েছিলেন, তারও যে একটি বিশেষ সার্থকতা ছিল তা অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী ছাড়াও আরো অনেক অসামান্য পুরুষের নাম করা যায়, যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এঁরা প্রায় সকলেই মেজ জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন, আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। কংগ্রেসের এই নেতার দল ছাড়াও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক রাজকর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রত্যহই বিকেলবেলায় জ্যাঠামহাশয়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে এঁরা একত্র হতেন ও অনেক রাত পর্যন্ত তাঁদের আড্ডা জমত। যে-সব কথাবার্তা আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলত, আমার পক্ষে বোঝা অবশ্য সম্ভব ছিল না। তাঁদের যে আসর বসত জ্যাঠাইমা ছিলেন তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সকলরকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, হৃদ্যতার দ্বারা তাঁদের প্রত্যেককে তুষ্ট রাখার অদ্বিতীয়

ক্ষমতা ছিল তাঁর। এইজন্য তখনকার 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের তিনিই অধিনেত্রী হয়ে পড়েছিলেন। যশোহরের গ্রাম থেকে নিতান্ত অল্পবয়সে অশিক্ষিত বালিকা অবস্থায় ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। মেজ জ্যাঠা-মহাশয়ের হাতে তিনি যে কেবল ইংরেজি ও বাংলাতে সবরকম শিক্ষা পেয়েছিলেন তাই নয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েলি কুসংস্কার থেকেও মুক্ত হতে পেরেছিলেন। জ্যাঠামহাশয় তাঁকে বিলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে জ্যাঠামহাশয়ের কর্মস্থলেও নানা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। পার্শি, মারাঠি, গুজরাটি মেয়েদের যে সহজ স্বাধীন ভাব দেখে এসেছিলেন, বাঙালি সমাজে তা প্রবর্তন করার জন্য তিনি উৎসাহের সঙ্গে লেগেছিলেন। বাংলায় মেয়েদের সাজসজ্জা তখন নিরতিশয় শাদাসিধে ছিল. জ্যাঠাইমা-ই শেমিজ পেটিকোট প্রভৃতি অন্তর্বাস ব্যবহার করা ও বোম্বাই ফ্যাশানে শাড়ি পরা— মেয়েদের মধ্যে প্রবর্তন করেন।

বাবার সেই সময়ে একটি পাটকিলে রঙের বুড়ো ঘোড়া ও পালকি-গাড়ি ছিল। বিকেল হলেই তিনি আমাদের নিয়ে রওনা দিতেন তাঁর মেজদার বাড়ি। জোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জ বুড়ো ঘোড়া ঠুক্‌ঠুক্ করে যেতে সময় নিত অনেক। মেজ জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িতে বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিল অক্ষয় চৌধুরী ও লোকেন পালিত। বাবা যখনই নতুন কিছু লিখতেন, কবিতা বা প্রবন্ধ, এঁদের দুজনকে পড়ে শোনাতে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে খুব ভালোবাসতেন। লোকেন পালিত তখন সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছেন, কাব্য-সাহিত্য তাঁর যেমন কণ্ঠস্থ, কাব্য-আলোচনাতেও তেমনি উৎসাহ ছিল প্রচুর। লোকেনবাবুর সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব সেইজন্য শীঘ্রই জমে উঠেছিল। তাঁর সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে বাবার গভীর আস্থা ছিল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় এঁদের চেয়ে আরো বয়স্ক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও রস-বোধের উপর বাবার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল।

খেলাধুলো সামাজিকতা গল্পগুজব করতে করতে কখন রাত হয়ে যেত খেয়াল থাকত না। আবার গাড়িতে চড়ে বসা ও ঠুক্‌ঠুক্ করে বাড়িতে ফেরা। কলকাতার রাস্তায় তখন এত ভিড় ছিল না, মোটরগাড়ির চলন হয় নি, আমরা যখন ফিরে আসতুম তখন চার দিক নিঝুম, লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল সব বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল কানে আসছে আমাদেরই

ঘোড়াটার টগ্‌বগ্‌ পা ফেলার ঢিমে-তেতালা শব্দ। রাস্তার গ্যাস-ল্যাম্পের আলোতে গাছপালার ছায়া একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে পাশ ফিরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে—তার বিরাম নেই। সেই অন্ধকার রাত্রে আলোছায়ার এই অবিশ্রান্ত মোড়-ফেরা দেখতে দেখতে কত-না ভূতপত্রীর দেশের কথা মনে পড়ত। তারপর ঘুমিয়ে পড়তুম মায়ের কোলে। চিরপরিচিত জোড়াসাঁকোর গলিতে ঢুকতেই মায়ের স্নেহকণ্ঠের ডাকে আবার ঘুম ভেঙে যেত।

যে সময়কার কথা বলছি তখনকার একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। আমার মনে থাকার কথা নয়—বড়ো হয়ে বাবার মুখে শুনেছি। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানান প্রদেশ থেকে বড়ো বড়ো নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কী করে করা যায় তাই নিয়ে কদিন ধরে ওজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে। হাট ভাঙার আগে তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি দেবেন। উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া। আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে। গগনদাদাদের তিন ভাইয়েরও নিমন্ত্রণ ছিল। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল জোড়াসাঁকো-বাড়ি থেকে যে চারজন যাবেন একেবারে বাঙালি দস্তুরে ধুতিচাদর পরে ডিনারে হাজির হবেন। ধুতি-পরা বাঙালি বাবুদের ডিনারে যোগ দেওয়া বিদেশীভাবাপন্ন কংগ্রেস নেতৃবর্গের কাছে কী রকম উপহাসের বিষয় হয়েছিল অনুমান করতে পারা যায়। ইংরেজি কায়দায় ডিনার পার্টি কী ধরনের হবে বাবা সহজেই অনুমান করেছিলেন—সেই বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী গান গাইতে তাঁর একটুও ইচ্ছা করছিল না। উতলা মন নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

আহারান্তে বক্তৃতা যখন চলছে, তার মধ্যে একসময় বাবাকে গান গাইতে বলা হল। বাবা গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?।

পরে বাবা এই ঘড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় খুলেছেন। হাতে নেই টাকা, একে একে জিনিসপত্র সব, মায় নিজের বইয়ের লাইব্রেরি বিক্রি করে সেখানে ছাত্রাবাস তৈরি হতে লাগল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী (আমাদের বাড়ির সকলে তাঁকে লাহোরিনী বলে ডাকতেন) বাবার কাছ থেকে এই ঘড়িটি কিনলেন। তার অনেক বছর পরে আমার বিয়ের সময় তিনি আমাকে যখন যৌতুক হিসাবে হাতে একটি বাক্স দিলেন, তার ডালা খুলে অবাক হয়ে দেখলুম বাবার সেই ঘড়ি তার ভিতর রয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ঘড়িটি এখন রবীন্দ্রসদনে।

পকেট-ঘড়িতে দম দেওয়া হলে তারপর আসত চামড়ার বাক্সে রাখা একটি ক্যারেজ ক্লক। এই ঘড়িটার বেশ একটু ইতিহাস আছে। আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাত গিয়েছিলেন, ম্যাক্‌কেব নামে বিখ্যাত ঘড়ি তৈরি করার কারিগরকে তাঁর জন্য একটি ঘড়ি তৈরি করার বায়না দেন। ম্যাক্‌কেব বিশ্ববিখ্যাত কারিগর। তাঁর হাতের তৈরি ঘড়ি মহামূল্যবান। অর্ডারের সঙ্গে টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু ঘটে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। ম্যাক্‌কেব সে খবর পান নি। যখন ঘড়ি প্রস্তুত হল ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু চেষ্টা করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে দ্বারকানাথের ওয়ারিশের সন্ধান বের করে ম্যাক্‌কেব মহর্ষির কাছে ঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মহর্ষি ম্যাক্‌কেবের সাধুতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘড়িটা পরে বাবাকে দান করেন। বাবার কাছে এইজন্য ঘড়িটার বিশেষ মূল্য ছিল, তিনি খুব যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছিলেন, নিজেই নিয়মিত তাতে দম দিতেন। আমরা দুজনে হাঁ করে দম-দেওয়া দেখতুম। এটি একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের মতো ছিল।

বাবার কাছে সর্বদাই লোক আসত দেখা করতে। তার মধ্যে কবি, লেখক, সম্পাদক শ্রেণীর সাহিত্যিকই অধিকাংশ। ছেলেবেলায় দেখতুম প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয় চৌধুরী ও বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়েরা আসা-যাওয়া করছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তো ছিলেন আত্মীয়তুল্য— এঁকে আমরা জ্যাঠামহাশয় বলে ডাকতুম। কিন্তু ডেপুটি হয়ে মফস্বলে তাঁকে বেশি ঘুরতে হত বলে খুব ঘন ঘন জোড়াসাঁকোতে আসতে পারতেন না। আমার যখন আট-নয় বছর বয়স তখন চিত্তরঞ্জন দাশকে

আমাদের বাড়িতে সর্বদাই দেখতুম। তখন তিনি সবে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে কলকাতার হাইকোর্ট লাইব্রেরিতে বসতে আরম্ভ করেছেন। সমস্তদিন 'ব্রিফ' পাবার জন্য অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে বিকেলবেলায় ছুটে আসতেন জোড়াসাঁকোয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চেঁচিয়ে বলতেন, "কাকিমা, আমি এসেছি, লুচি-মাংস কই?" তিনি খেতে ভালোবাসতেন, মাও তাঁকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। খাওয়া হয়ে গেলে পকেট থেকে একটা খাতা বের করতেন ও বাবাকে তাঁর টাটকা-টাটকা লেখা কবিতা পড়ে শোনাতেন। চিত্তরঞ্জনের মন তখনো পলিটিক্সে যায় নি, কবি হবার অত্যন্ত আগ্রহ। কোন্ কবিতার কিরকম অদলবদল করলে ভালো হয়, বাবা বলে দিতেন, দাশ সাহেব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরতেন।

আর-যাঁরা বাবার কাছে আসতেন সকলের নাম এখন মনে পড়ে না— তবে প্রিয়নাথ সেনকে খুব মনে পড়ে। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ, অ্যাটর্নি অফিসের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সাহিত্য-রসিক বলেই বিদ্বৎসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল। ইয়োরোপীয় সাহিত্য তিনি ভালোবাসতেন, অসাধারণ ছিল তাঁর অধিকার এ বিষয়ে —নতুন বই বেরোলেই তাঁর কেনা চাই। তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল অমূল্য সংগ্রহ— প্রত্যেক বইখানাই মূল্যবান। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বিহারীবাবু ও বাবা এই দুই কবির সঙ্গেই প্রিয়নাথবাবুর আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল।

বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে— মা ছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়াসাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনোদিন কর্তৃত্ব করতে হয় নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেইজন্য ছোটোরা যেমন তাঁকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মা কখনো ইস্কুলে লেখাপড়া শেখেন নি— বাবার কাছেই যা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে

মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদাদা আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বালকবয়সের আদর্শ পুরুষ। সব সময়েই তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মা স্নান করিয়ে দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে। তাঁর দোতলার ঘরে হাজির হলে তিনি আঁচড়ে দিলে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আবার তেতলায় ছুটে আসতুম পাছে চুলের পাট খারাপ হয়ে যায়। তাঁর ঘরের পাশে একটা পেয়ারাগাছ ছিল, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাঁসা ডাঁসা ফল পেড়ে আমাকে খেতে দিতেন। আমি তো বিচি বাদ না দিয়েই সবটা খেয়ে ফেলতুম। তখন তিনি ভয় দেখাতেন— 'তুই বিচি খেয়ে ফেললি, এইবার তোর পেটে গাছ জন্মাবে।' আমার সত্যই ভয় হত, ঘরে ফেরবার সময় ছাত পেরোতে দশবার মাথায় হাত দিয়ে দেখতুম গাছ মাথা ফুঁড়ে বেরল কিনা।

বলুদাদাকে বাবাও অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সাহিত্যচর্চায় একনিষ্ঠতা দেখে বাবার খুব ভালো লাগত। আমার আর-এক দাদা সুধীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে তখন 'বালক' মাসিকপত্র বেরোতে আরম্ভ করেছে। মেজ জ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সম্পাদক। বেশিদিন এই কাগজ চলে নি, বালক-বালিকাদের উপযোগী মাসিকপত্র সম্পাদনা করার বাংলাদেশে বোধ করি এই প্রথম চেষ্টা। বলুদাদা ও সুধীদাদাকে বাবা উৎসাহ দিলেন 'বালকে'র জন্য নিয়মিত লেখা দিতে। 'বালকে' লিখে তাঁদের হাতে-খড়ি হল। পরে 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্র দুটির সম্পাদনায় এই দাদাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়েছিল।

বলুদাদার যখনই কোনো প্রবন্ধ লেখা শেষ হত বাবাকে দেখাতে নিয়ে আসতেন। ভাব ও ভাষা দুদিক থেকেই তন্ন তন্ন করে বিচার করে বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন কি করে বিষয়টি লিখতে হবে। বলুদাদা পুনরায় লিখে নিয়ে এলে যে-দোষত্রুটি বাবার তখনো চোখে পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আসতে বলতেন। যতক্ষণ-না সম্পূর্ণ মনঃপূত হত, বাবা ছাড়তেন না, বলুদাদাও অসীম ধৈর্য সহকারে লেখাটি বার বার অদলবদল করে নিয়ে

আসতেন। এইরকম কঠোর শিক্ষার ফলে বলুদাদার লেখার মধ্যে ভাব ও ভাষার আশ্চর্য বাঁধুনি দেখতে পাওয়া যায়— না আছে একটুও অতিরঞ্জন, না আছে অনাবশ্যক একটি কথা। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়, দুখানি কবিতার বই ও একখণ্ড গদ্য প্রবন্ধ-সংগ্রহ মাত্র বাংলা-সাহিত্যে তাঁর দান তিনি রেখে গেছেন। সে দান সামান্য হলেও তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-আসরে চিরকালই বিশেষ সমাদর পাবে।

আমাদের তেতলার ঘরের সামনে মস্তবড়ো ছাদ। তার মাঝখানটা আবার উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো— যেন বাড়ির খোলা বৈঠকখানা। সমস্তদিন ধরে এখানে চলত ছেলেমেয়েদের হুটোপাটি— তাদের শিশুকণ্ঠের কলরব মুখরিত করে রাখত চার পাশ। রোদ পড়ে গেলেই চাকররা জাজিম তাকিয়া পেতে দিয়ে যেত মাঝখানে উঁচু জায়গাটায়। মেয়েদের তখন সেখানে মজলিস বসত। চা-পান তখন চলন হয় নি। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন, ঘরে যেদিন যা তৈরি করতেন সকলকে তাই বিতরণ করতেন। গ্রীষ্মকালে সেইসঙ্গে থাকত আমপোড়া শরবত।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সেজবাতি ফরাস একে একে তেলের খাস গেলাস বাতি জ্বেলে ঘরে ঘরে রেখে গেছে। ছাদে জাজিমের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মেয়েদের মজলিস তখনো চলছে। বাড়ির পুরুষেরা তখন একে একে এসে সেখানে জুটতেন। মজলিস পুরোদমে জমে উঠত। গান শুরু হত। আমাদের বাড়িতে সেকালে গানবাজনা সব সময়েই চলত। বৈঠকখানা-ঘরে দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথ ওস্তাদ নিয়ে আসর জমাতেন। তখনকার নামজাদা ওস্তাদরা তাঁর বৈঠকে সর্বদাই গান গাইতে আসতেন। রাধিকা গোস্বামী বাঁধা গাইয়ে ছিলেন ধ্রুপদ গাইবার জন্য। ড্রয়িংরুমে ছিল একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। নতুন জ্যাঠামহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেটা রাতদিন বাজাতেন— কখনো পিয়ানো ছেড়ে বেহালা ধরতেন। টুং টাং করে পিয়ানো বাজিয়ে গানের সুর বসানো তাঁর অভ্যাস ছিল। দিদিদের মধ্যে প্রায় সকলেই গান গাইতে পারতেন। ঘরে-বাইরে সংগীতের আবহাওয়া বইত বললে যথেষ্ট বলা হয় না, বাড়ির সকলেই গানবাজনায় পাগল ছিলেন। সব সময়েই বাড়ির আনাচে কানাচে গানবাজনার মধুর আওয়াজ শোনা যেত।

সন্ধ্যা হতে ছাদের মজলিসে দাদাদের সঙ্গে বাবাও এসে কখনো কখনো

সেখানে বসতেন। তখন গান জমে উঠত। বাবাই বেশি গাইতেন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেয়ে যেতে তাঁর শ্রান্তিবোধ হত না। মাঝে মাঝে দিদিদের গাইতে বলতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ছিল সেজো জ্যাঠামহাশয়ের ছোটো মেয়ে অভিদিদির গলা। বাবার খুব আশা ছিল বড়ো হয়ে তিনি অপূর্ব গাইয়ে হবেন। কিন্তু বাবার আশা পূর্ণ হল না, অল্পবয়সেই অভিদিদির মৃত্যু হয়।

কতরকম গানই না হত সেই ছাদের উপর। গানের এর চেয়ে উপযোগী পরিবেশই বা মিলবে কোথায়। এক প্রাচীন শিশুগাছ ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে। দিনান্তে বসন্তের মৃদু বাতাসে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার কচি পাতা। চাঁদের ঝাপসা আলো অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করেছে সেই সান্ধ্য আসরে। হঠাৎ কবি গেয়ে উঠলেন—

চিত্ত পিপাসিত রে
গীত-সুধার তরে।

গানের ফোয়ারা খুলে গেল। কখনো বা ইমনের মিঠে সুরে ধরলেন—

তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম অসীম-গগন-বিহারী—

কবি গানের পর গান গেয়ে চলেছেন। গানের সুরধুনী নেমে এল আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির ছাদের উপর।

প্রতিদিনই এইরকম গান চলত। কত রাত পর্যন্ত তা আমরা শিশুরা জানতে পেতুম না, গানের আসর ভাঙবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

এই সময় নতুন গান বাঁধবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেছিলেন অমলাদিদি, চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়েছিল। অমলাদিদিকে মা এত স্নেহ করতেন যে আমাদের বাড়িতে নিজের কাছে এনে রাখলেন। তাঁর গান গাইবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। অল্পদিনেই ওস্তাদি অনেক গান শিখে নিলেন। অমলাদিদির গলা যেমন অনায়াসে খাদে খেলত তেমনি চড়াতে উঠত। তাঁর গলার উপযোগী গান বাবা রচনা করতে লাগলেন। অমলাদিদি গাইবেন বলে যে গানগুলি তখন বাঁধা হয়েছিল তার মধ্যে একটা-দুটো মনে পড়ে; যেমন—

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না···

এ পরবাসে রবে কে হায়···

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু···

আমার অনুমান এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়েছিলেন। অমলাদিদি আসবার পর সান্ধ্য-মজলিসে তাঁকেই বেশি গাইতে হত।

একদিন গল্প গান করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে, সকলের খিদে পেয়েছে। ঠিক হল গ্রীষ্মের রাতে ভাতই ভালো লাগবে। মা গেলেন ভাত রাঁধতে। কিন্তু কি দিয়ে ভাত খাওয়া যায় তা নিয়ে মহা সমস্যা বাধল। অত রাত্রে মাছ-মাংস তো কিছুই পাওয়া যাবে না। দাদাদের মধ্যে একজন বললেন: 'আমি এমন একটা ব্যবস্থা করে দেব যে সকলের জিবে জল আসবে।' ন' জ্যাঠাইমার ঘরের সঙ্গে একটা আম গাছ ছিল। তাঁর ভয়ে ছেলেরা কেউ সেই গাছ থেকে আম চুরি করতে পারত না। জ্যাঠাইমা তখন ঘুমচ্ছেন। সেই সুযোগে ছাত বেয়ে গাছে চড়ে এক কোঁচড় আম আনা হল। রাত দুটোর সময় পরম তৃপ্তিতে কাঁচা আমের টক সহযোগে সকলের খাওয়া হল। এরকম উদ্ভট ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

মাঘোৎসব ছিল আমাদের বাড়িতে বছরের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন খুব ঘটা করে এই উৎসব সম্পন্ন হত। মাঘোৎসবের আয়োজন এক মাস আগে থেকে শুরু হত, বিশেষ গানের রিহার্সল। বাবাকে প্রতিবছর নতুন গান রচনা করতে হত। গানের সুর বসানো হলে, রাধিকাবাবু বা অন্য কোনো গায়ককে বাবা শিখিয়ে দিতেন। তারপর রিহার্সল চালাবার ভার নিতেন দ্বিপুদাদা। তাঁর ত্রিশ-চল্লিশ জন বাঁধা গাইয়ে-বাজিয়ের দল ছিল। রোজ সন্ধেবেলায় গানের শব্দে বাড়ি গম্ গম্ করত। বাবা যেবার বেদিতে বসে উপাসনা করতেন, তিনি নিজে কোনো গান গাইতেন না। একা গাইবার জন্য কয়েকটি গান দিদিদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। অমলাদিদি যতদিন ছিলেন, তাঁর জন্য দুটি-একটি গান থাকতই। দিনেন্দ্রনাথ তখন বালক —জনসমাজে গান গাইবার মতো বয়স হয় নি। অধিকাংশ গানই সমবেত গলায় গাওয়া হত। বাংলাদেশে তখন সমবেত গানের বিশেষ চলন হয় নি —তাই মাঘোৎসবের গান শোনবার জন্য লোকের খুব আগ্রহ ছিল।

এক দিকে যেমন গানের মহড়া চলত, অন্য দিকে বাড়ি সাজানোর ধুম লেগে যেত। সাজানোর ভার নিতেন দাদা নীতীন্দ্রনাথ। যতদিন নীতুদাদা বেঁচে ছিলেন, প্রত্যেক বছর সাজাবার নতুন কোনো ধরন আবিষ্কার করতেন, একঘেয়ে মামুলি রকম সাজানো কখনো হয় নি। একবার ভারি মজা হয়েছিল। সেবার নীতুদাদার খেয়াল গেল দালানের থামগুলি আগাগোড়া মস্ (moss) দিয়ে ঢেকে তার গায়ে নানারকম ফুল গুঁজে দেবেন। অত মস্ কলকাতায় কেমন করে পাবেন, দার্জিলিং থেকে আনানোও সম্ভব হল না। কিন্তু বিরত হবার লোক তিনি ছিলেন না। জেলেদের লাগিয়ে বেহালা, কাশীপুর নানা অঞ্চল থেকে পুকুরের পানা গাড়ি গাড়ি আনিয়ে ফেললেন। তাই দিয়ে সাজানো হল। নীতুদাদার সঙ্গে গগনদাদা-অবনদাদাদের একটু রেষারেষি ছিল। সাজানো হয়ে গেলে বারান্দা থেকে নীতুদাদা ডাক দিলেন, "I say G. N. T., I say A. N. T., now you can come over." সকৌতুকে আর্টিস্ট দাদারা এলেন। দেখেশুনে কোনো কথা না বলে রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে চলে গেলেন। ব্যাপার হয়েছিল কি, পচা ডোবার পানাতে আঁশটে গন্ধ ছিল। তখন কি করা যায়, নীতুদাদা ছুটলেন দোকান থেকে ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, গোলাপজল আনতে। দু-চার গ্যালন সুগন্ধি ছিটিয়ে তবে দুর্গন্ধ গেল।

পরদিন যথারীতি মাঘোৎসব হয়ে গেল। অভ্যাগতদের নাকে রুমাল দিতে হল না।

আমাদের ছোটো ছেলেমেয়েদের আসল উৎসব হত তার পরদিন ১২ই মাঘে। উৎসবের শুরু ভাঁড়ার ঘর আক্রমণ করে বাসি লুচি ও আলু-কুমড়োর ছোঁকা খেয়ে। যজ্ঞির এই শাদাসিধে খাবার কী ভালোই না লাগত। তখনকার দিনে বিজলি ছিল না— ফৌজদারি-বালাখানার গুদাম থেকে মুটের মাথায় ঝাঁকা করে আসত মোমবাতির ঝাড় ও নানারঙের ফানুস-বাতি। উৎসবান্তে মুটেরা সেগুলি খুলে নিয়ে যাবার আগে আমরা লাগতুম পোড়া মোমবাতির টুকরো সংগ্রহ করতে। কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ঝাড়লণ্ঠন থেকে স্ফটিকের পরকলাগুলি খুলে নেবার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ভিতর দিয়ে রামধনুর রঙ দেখতে মজা লাগত। সন্ধ্যা হলে উৎসব-অনুষ্ঠানের নকল করা হত বেসুরো বিচিত্র গলায় গান গেয়ে।

আমার জ্যাঠামহাশয়দের আমলে ছিল 'বিদ্বজ্জন সভা'। বাবার আমলে তারই রূপান্তর হল 'খামখেয়ালি সভা'। 'খামখেয়ালি সভা' যখন আরম্ভ হয় তখন আমি একটু বড়ো হয়েছি। তাই এই বৈঠকের বিষয় স্পষ্ট মনে আছে। এই সভার কোনো নিয়মকানুন ছিল না। পনেরো-কুড়িজন বন্ধুবান্ধব মিলে এই সভা। বাবা ও বলুদাদার উৎসাহে এর প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার কোনো নিয়ম না থাকলেও, লেখক কবি শিল্পী সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের নিয়েই সভা গঠিত হয়। বিদ্যাবুদ্ধি যাই থাক, সভ্য হতে গেলে মজলিসি হওয়া বিশেষ গুণ বলে পরিগণিত হত। আমাদের পরিবারের মধ্যে বাবা, বলুদাদা, দ্বিপুদাদা, গগনদাদা, সমরদাদা ও অবনদাদা ছিলেন। আর ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন, বড়ো অক্ষয়বাবু, ছোটো অক্ষয়বাবু, প্রমথ চৌধুরী, সন্তোষের প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরো কয়েকজন যাঁদের নাম আমার এখন মনে নেই। সভার প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— প্রতি মাসে এক-একজন সভ্য পালা করে তাঁর বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেদিন সেখানেই বৈঠক বসত। যদিও আহারের প্রচুর আয়োজন থাকত— কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র। কবিতা বা গল্প পড়া, ছোটোখাটো অভিনয় ও গানবাজনা করা এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বাবা সেই সময় যা কিছু নতুন কবিতা বা ছোটোগল্প লিখতেন খামখেয়ালি সভাতে পড়ে শোনাতেন। অনেক সময় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর হাত ভারি মিষ্টি ছিল।

> ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে…
> যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে…
> হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে…

কবিতাগুলির ছন্দের ঝংকার পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলের সঙ্গে চমৎকার শোনাত।

প্রত্যেক অধিবেশনের জন্যই বাবা নতুন গান বেঁধে রাখতেন। যৌবন-বয়সে বাবা কী মিষ্টি অথচ জোরালো গলায় গান গাইতে পারতেন, লোকে তাঁর গান শোনবার জন্য কিরকম পাগল হয়ে যেত, যারা না শুনেছে তারা

কল্পনা করতে পারবে না। গ্রামোফোন তখন আবিষ্কার হয় নি, তাঁর গলার রেকর্ড কয়েকটি মাত্র আছে, কিন্তু তাও বৃদ্ধবয়সে নেওয়া, তখন গলা পড়ে গেছে। তখনকার দিনে ফোনোগ্রাফ নামে মেশিন ছিল, মোমের সিলিণ্ডারের উপর রেকর্ড উঠত। তার নকল নেওয়া যেত না। 'কুন্তলীন'-এর এইচ. বোস এই মেশিন এদেশে আমদানি করেন। তিনি বাবার গলার বিস্তর রেকর্ড নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর ছেলে নীতীনকে এই রেকর্ডগুলির খোঁজ নিতে বলি। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানের পর কয়েকটি মাত্র সিলিণ্ডার পাওয়া গেল—সেগুলিও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।

খামখেয়ালি সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেদিন উপস্থিত থাকতেন তাঁকে গান গাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করতেন। তিনি গাইতেন তাঁর হাসির গান। সকলে হেসে কুটিকুটি— কিন্তু দ্বিজুবাবু টেবিল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে যেতেন গম্ভীর মুখে। অতুলপ্রসাদ সেনও তখন অল্পস্বল্প গান রচনা করতে শুরু করেছেন— মাঝে মাঝে তাঁকেও গাইতে হত।

খামখেয়ালি সভার জন্য বাবা দুটো-একটা ছোটো নাটক রচনা করেন। ছোটো অক্ষয়বাবুকে মনে রেখেই সম্ভবত 'বিনি-পয়সার ভোজ' লিখেছিলেন। অক্ষয়বাবু একা সেটা অভিনয় করেন। অক্ষয়বাবু এই ধরনের কমিক পার্ট অভিনয় করতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তারপর হল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। গগনদাদাদের বাড়িতে নাচঘরে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

বাবা সেজেছিলেন	অবিনাশ
গগনদাদা	বৈকুণ্ঠ
সমরদাদা	কেদার
অবনদাদা	তিনকড়ি
ছোটো অক্ষয়বাবু	ঈশান

এই ছোট্ট নাটকখানি হাস্যরসপ্রধান— যাঁরা পার্ট নিয়েছিলেন সকলেই কমিক অভিনয় করতে পারদর্শী। বৈকুণ্ঠের পার্টে যে বেদনার রসটুকু দেবার, গগনদাদার পাকা অভিনয়ে সেটা চমৎকার ফুটে উঠেছিল। অভিনয় হয়েছিল নিখুঁত।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি কখনো কখনো একাই অভিনয় করে দেখাতেন।

একটি ডাক্তারখানার অভিনয়ের কথা মনে আছে— অদ্ভুত ভালো অভিনয় হয়েছিল।

বাবার যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। মাকে ফরমাশ দিলেন খাওয়ানোর সম্পূর্ণ নতুনরকম ব্যবস্থা করতে হবে। মামুলি কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ফরমাশ করেই নিশ্চিন্ত হলেন না, নতুন ধরনের রান্না কি করে রাঁধতে হবে তাও বলে দিতে লাগলেন। মা বিপদে পড়লেন। তিনি প্রতিবাদ না করে নিজের মতে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বাবা মনে করতেন খাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না—খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো, সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন। বলুদাদা জয়পুরের শ্বেতপাথরের বাসন আনিয়ে দিলেন। নীতুদাদা ঘর সাজানোর ভার নিলেন। মাটিতে বসে খাওয়া, কিন্তু খাবার রাখার জন্য প্রত্যেকের সামনে শ্বেতপাথরের একটি করে জলচৌকি থাকবে। অনেকগুলি পাথরের জলচৌকি করানো হল, তার অবশিষ্ট দু-চারটি এখনো শান্তিনিকেতনের উদয়ন-বাড়িতে আছে। জলচৌকিগুলি চতুষ্কোণ ভাবে সাজিয়ে মাঝখানে যে জায়গা রইল তাতে বাংলাদেশের একটি গ্রামের দৃশ্য বানানো হল। বাঁশবন, শ্যাওলাপড়া ডোবা, খড়ের ঘর কিছুই বাদ গেল না, ছবির মতো সম্পূর্ণ একটি গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর আনিয়ে খড়ের ঘর, ছোটো ছোটো মানুষ, গোরু, ছাগল বানিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল। এই সুন্দর পরিবেশে নৈশভোজন যে উপভোগ্য হয়েছিল, বলা বাহুল্য।

আমি একবারের বৈঠকের কথা বললুম। আমাদের বাড়িতে যে-কয়বার 'খামখেয়ালি সভা'র বৈঠক হয়েছিল প্রত্যেকবারেই সাজানো ও আহার্যের অভিনব পরিকল্পনার ব্যতিক্রম হয় নি।

বাবাকে কলকাতা ছেড়ে যখন শিলাইদহে চলে যেতে হল 'খামখেয়ালি সভা' আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৯৭ সালে যে ভূমিকম্প হয় সেরকম ভূমিকম্প বাংলায় আর কখনো হয় নি। ঠিক সেই সময় সেবার নাটোরে বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স

ডাকা হয়েছিল। নাটোরের মহারাজা নিমন্ত্রণকর্তা— আমাদের বাড়ির সকলকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে। পুরুষরা সকলেই নাটোর চলে গেলেন। তার দুদিন বাদেই ভূমিকম্পে কলকাতা শহর তোলপাড় করে দিল। অনেক বাড়ি পড়ল, মানুষও মারা গেল। নীচে নামবার সময় ছাদ থেকে টালি ভেঙে মা-র মাথায় পড়ল। একতলার একটা ঘরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হল। নিজের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা দুশ্চিন্তা তার বেশি হল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই— নাটোরে তাঁদের কি হচ্ছে খবর নেবার উপায় নেই। রেলপথ বন্ধ. টেলিগ্রাম যাতায়াত বন্ধ। উদ্‌বেগের মধ্যে তিন-চার দিন কাটল। তারপর যখন সকলে ফিরলেন, তাঁদের মুখে নাটোরের খবর জানা গেল। সেখানে একদিন মাত্র কনফারেন্সের অধিবেশন হতে পেরেছিল। কলকাতার চেয়ে উত্তর বঙ্গে ভূমিকম্পের প্রকোপ অনেক বেশি হয়েছিল। প্যাণ্ডাল ছেড়ে খোলা মাঠে যখন সকলে আশ্রয় নিলেন তখন সেখানকার মাটিতে ফাটল ধরে জল বেরোতে আরম্ভ করেছে। আশ্রয় নেবার জায়গা রইল না। মহারাজার প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। দু-চারটে খড়ের আটচালা বেঁচে গিয়েছিল, তাতেই সকলে মাথা গুঁজে কোনোরকমে রাত কাটিয়েছিলেন।

প্রথম দিনেই যা কনফারেন্স হয়েছিল। ঘটনার অনেকদিন পরে বাবার কাছে তার একটি গল্প শুনি। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয় তার মানে আছে, কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলনেও ইংরেজিতে বক্তৃতা হবে বাবার তাতে খুব আপত্তি ছিল। কনফারেন্সের সভাপতি মেজজ্যাঠামহাশয়েরও তাই মত দেখে, বাবা বললেন বাংলাভাষা ব্যবহার হোক এই মর্মে সভার প্রারম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুলবেন। স্থির হল মহারাজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন। প্রস্তাব উপস্থিত হতেই অধিকাংশ সভ্যেরা উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের সম্মতি জানালেন। প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসের যাঁরা প্রকৃত পাণ্ডা তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদের শান্ত করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। তাঁরা তখনকার মতো আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনে রাগ রয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের মহারথীরা বরাবর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁদের ইংরেজি

ভাষায় যেমন দখল, বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাও তেমনি আশ্চর্য। তাঁরা বাংলায় কি করে বক্তৃতা দেবেন? তাঁরা কয়েকজন ইংরেজিতেই বললেন, বাবা সেগুলি বাংলাতে তর্জমা করে দিলেন। অধিবেশন ভাঙার সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) ঠাট্টা করে বাবাকে শোনালেন—"Rabi Babu, your Bengali was wonderful, but do you think that your *chasas* and *bhusas* understood your mellifluous Bengali better than our English ?"

নাটোর কনফারেন্সের আগের বছর (১৮৯৬) কলকাতায় কংগ্রেস হয়। সেই সময় ইংরেজ সরকার ময়দানের দিকে কোথাও পোলিটিক্যাল মিটিং করতে দিত না। ঠিক হল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের প্যাণ্ডাল খাড়া করা হবে। বিডন স্কোয়ার আমাদের বাড়ির খুব কাছে। আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করবার। রিহার্সল চলতে থাকল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গান গাইলেন, সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন। তখন মাইক প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডালের বিপুল জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্' প্রথম গাওয়া হয়।

দু-এক বছর পরেই বাবাকে শিলাইদহে যেতে হল। কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ কিছুকালের জন্য ছিন্ন হল।

শিলাইদহের স্মৃতি

আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগাধ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বিলাতে তাঁর যখন আকস্মিক মৃত্যু হল— দেখা গেল ব্যাবসাক্ষেত্রে দেনাও অগাধ রেখে গেছেন তিনি। মহর্ষি তখন বিষয়-সম্পত্তি, এমন-কি, বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে সমস্ত দেনা শোধ করলেন। তৎসত্ত্বেও যা থাকল তা নিতান্ত সামান্য নয়। উড়িষ্যায় তিনটি জমিদারি, পাবনায় সাহাজাদপুর, রাজশাহিতে কালীগ্রাম ও নদিয়াতে বিরাহিমপুর— এই কয়েকটা সম্পত্তি শেষপর্যন্ত তাঁর রয়ে গেল। বিষয়-সম্পত্তির সব কাজ মহর্ষি নিজেই তত্ত্বাবধান করতেন। জমিদারি চালনা সম্বন্ধে তিনি নিজের কাছে একটি নোটবই রাখতেন। সেটি এখন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। তার থেকে বেশ বোঝা যায় তিনি কেমন দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি চালাতেন তেমনি প্রজাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার বা অত্যাচার না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন। ছেলেরা বড়ো হলে মহর্ষির ইচ্ছা হল, তাঁদের মধ্যে দু-একজন 'তৈরি হয়ে উঠুক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে। বড়োছেলে দার্শনিক গবেষণায় মগ্ন— তাঁর উপর কোনো বৈষয়িক ভার দেওয়া চলে না; নতুন জ্যাঠামহাশয় গানবাজনা সাহিত্যচর্চা নিয়েই মশগুল হয়ে থাকতেন, জমিদারি কাজকর্মের দিকে তাঁর তত মন ছিল না। কিছুদিন পরে মহর্ষি তা বুঝতে পারলেন, তখন আমার পিতার উপর আদেশ হল যে তাঁকেই জমিদারি পরিচালনা করতে হবে এবং কলকাতা ছেড়ে বিরাহিমপুরের কাছারি শিলাইদহে গিয়ে বাস করতে হবে। একে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, তার উপর কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষি এই কাজের জন্য মনোনীত করায় বাড়ির আত্মীয়স্বজন অবাক হয়ে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে জমিদারির সর্বতোভাবে উন্নতি দেখে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন এবং মহর্ষির অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতে লাগলেন।

অন্যান্যদের মতো বাবা তখন দুশো টাকা মাত্র মাসোহারা পেতেন। তাতেই তাঁকে সংসার চালাতে হত। এখনকার দিনে সেই টাকার পরিমাণ নগণ্য মনে হয়— কিন্তু তখন ঐ টাকার মধ্যেই মা সচ্ছলভাবে সংসার চালিয়ে, উদ্‌বৃত্ত থেকে বাবার বই কেনার বিল মেটাতেন। জমিদারির ভার বাবাকে

উপর যখন দেওয়া হল তখন মহর্ষি তাঁকে আরও একশো টাকা মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। বহুকাল ধরে এই তিনশো টাকাই বাবার মাসিক বরাদ্দ ছিল।

শিলাইদহে বিরাহিমপুরের কাছারি-বাড়ি খরসেদপুর গ্রামের পাশেই ছিল। নিতান্ত গ্রাম হলেও, স্থানটির ইতিহাস ও মাহাত্ম্য আছে। নামটি যদিও মুসলমানি, খরসেদপুর ব্রাহ্মণদের গ্রাম। গ্রামের মাঝখানে গোবিন্দজিউর পুরোনো মন্দির। সেটি প্রতিষ্ঠা করেন রানী ভবানী। এই গ্রামের বাইরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মস্তবড়ো নীলকুঠি তৈরি হয়। নীলের ব্যাবসা ছেড়ে সাহেবরা চলে গেলে, কুঠির প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ির নীচের তলায় জমিদারির কাছারি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরের তলা জমিদারবাবুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার হত। কুঠির চার দিকে বিস্তৃত সুন্দর বাগান ছিল সেই আমলে। কুঠিবাড়ি ছিল গোরাই (মধুমতী) ও পদ্মার মোহানার কাছে, বাগানের দু-দিক দিয়ে এই দুটি নদী বয়ে যেত, আর বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যেত অপূর্ব দৃশ্য।

বাবা যখন আমাদের নিয়ে শিলাইদহে গেলেন তখন এই নীলকুঠি নেই— তার ধ্বংসাবশিষ্টই আমরা দেখতুম নদীর ধারে বেড়াতে গেলে। বাংলাদেশে এসে পদ্মানদী খুব খামখেয়ালি স্বভাবের হয়ে গেছে। কখনো গা ঘেঁসে এসে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করছে, আর অন্য পাড়ে নতুন-পলি-পড়া উর্বরা জমি তৈরি করে দিচ্ছে ; কখন কার প্রতি রুষ্ট কার প্রতি তুষ্ট কিছুই বলা যায় না। এইরকম লুকোচুরি খেলা তার লেগেই আছে। পদ্মার ধারে যারা বাস করে তারা এইজন্য সর্বদাই আতঙ্কে থাকে। নীলকুঠির প্রতি অনেকদিন পর্যন্ত পদ্মার নজর যায় নি, হঠাৎ খেয়াল গেল, সেইদিকের পাড় ভাঙতে শুরু করল। বাড়িসুদ্ধ নদীগর্ভে যাবে এই ভয়ে বাড়িটা আগে থেকেই ভেঙে ফেলা হল। তার মালমশলা নিয়ে নদী থেকে খানিকটা দূরে আর-একটা কাছারি ও কুঠিবাড়ি তৈরি করা হয়। আমরা যখন শিলাইদহে গেলুম— এই নতুন বাড়িতে বাস করতে লাগলুম। (এই কুঠিবাড়িটা এখনো আছে। শুনতে পাই, পাকিস্তান সরকার সেই বাড়িটা মিউজিয়াম করে রক্ষা করার ব্যবস্থা এখন করেছেন।) কিন্তু আশ্চর্য, পুরানো কুঠিটা ভাঙা হল বটে, কিন্তু নদী বাগানের গেট পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। যতদিন আমরা শিলাইদহে ছিলুম সেই নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ অটুট ছিল।

শিলাইদহ গোরাই ও পদ্মার মোহানায় অবস্থিত। নদী এখানে ঘুরে গেছে বলে মোহানার কাছেই স্রোতের ঘূর্ণিতে একটা মস্তবড়ো 'দহ'র সৃষ্টি হয়েছিল। তার থেকে শিলাইদহ নাম। ঝড়-বাদলের সময়েও তার ভিতর তুফান ঢুকতে পারত না। নৌকা রাখার পক্ষে বড়ো সুবিধা। নানারকমের নৌকা এসে শিলাইদহের ঘাটে লাগত— নাক-থ্যাবড়া পশ্চিমি মহাজনি নৌকা, ছিপছিপে গোল-ছাউনি ঢাকাই পানসি, আর ছোটোবড়ো নানাবিধ জেলেডিঙি। জেলেডিঙিগুলি দিনরাত জাল ফেলে মাছ ধরতে ব্যস্ত— মাছ ধরে শিলাইদহের ঘাটে নিয়ে আসে, স্টীমার এসে মাছ কুষ্টিয়ায় নিয়ে যায়। জেলেরা নিজেরা মাছ বেচে না, নিকারিদের দেয় বিক্রির জন্য, তাই জেলেদের নৌকার পিছনে একদল নিকারির নৌকাও ঘোরাফেরা করে। নিকারিরা মাছ আনে, পশ্চিমি বজরা তাদের দেশ থেকে গম আনে, আর বোঝাই করে নিয়ে যায় ডাল সরষে গুড় পাট, আরো কত কী। ঢাকাই পানসি আসে ধানের সময় ধান নিতে। তাই শিলাইদহের ঘাটের উপর অনেকগুলি মহাজনদের আড়ত, রাতদিনই তাদের কারবার চলে। শিলাইদহ এই কারণে পদ্মার ধারের বেশ বড়োরকমের একটি বন্দর ছিল।

শিলাইদহে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম, কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে; খরসেদপুর গ্রাম, কাছারি-বাড়ি বা শিলাইদহের ঘাট থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। বাবা মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন বাড়িতে থাকি। আমার ছোটোবোন রানী ও মীরা আর ছোটো-ভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু। এই নির্জনতার মধ্যে দিদি আর আমি বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি পেলুম। বাবা তখন আমাদের দুজনকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। বাবা নিজে ইস্কুল-কলেজে বিদ্যার্জন করেন নি। কলকাতার দু-একটা ইস্কুলে যে অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এত পীড়াদায়ক যে তার স্মৃতি তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। নিজের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে তাই গোড়া থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি জোড়াসাঁকের বাড়িতেই একটা ইস্কুল খুলেছিলেন। সর্বসমেত দশ-পনেরো জনের বেশি ছাত্রছাত্রী জুটল না।

একজন বৃদ্ধ হেডমাস্টার ও দুজন অধ্যাপক আমাদের পড়াতে লাগলেন। অধ্যাপকদের বিষয়ে একটু বলা দরকার। হেডমাস্টারমশায় সনাতনী শিক্ষা-পদ্ধতিতে পাকা হয়ে গেছেন। বাবা বুঝলেন এঁকে কোনো নতুন পদ্ধতি আর শেখানো সম্ভব নয়। তাই দুজন অল্পবয়সের মাস্টার নিয়ে এলেন। তখন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সবে প্রচলিত হয়েছে। অবিনাশ বসু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই কিণ্ডারগার্টেন সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। পরে এঁরা কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হিসাবে বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর অভ্যাস ছিল ক্লাসে বসেই pindrop silence, please— বলা। এই শব্দটি বারবার শোনবার জন্য আমরা ইচ্ছা করেই গোলমাল করতুম। আরও মজা লাগত যখন চৌকোনা, গোল প্রভৃতি বোঝাতে নানান ছড়া বানিয়ে বলতেন। ফুটবল গোল আবার রসগোল্লাও গোল শুনলেই আমরা হেসে ফেলতুম। তখন pindrop silence আর থাকত না। রসময় হেডমাস্টার মশায় দুপুরবেলা জেগে থাকতে পারতেন না। তিনি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ঢুলতে থাকতেন। আমরাও টাস্ক বন্ধ করে দিয়ে সবাই মিলে বুড়ো আঙুল চুষতে আরম্ভ করতুম। আমাদের মধ্যে দিদির দুষ্টুবুদ্ধি ছিল বেশি— কখন নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে মাছভাজা বেগুনি প্রভৃতি উপাদেয় খাবার নিয়ে এসে আমাদের বিতরণ করে আবার চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে পড়ত। বিতরণটা অবশ্য ঘুষ। হঠাৎ জেগে পড়লে হেডমাস্টার মশায় দেখতেন একধার থেকে সবগুলো ডেস্ক-এর ডালা তোলা। ডালার আড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। গলা খাঁকরি শুনে ডালা বন্ধ হত এবং যে যার কাজ করে যেত। ডেস্কের মধ্যে অর্ধভুক্ত মাছভাজা তখনকার মতো তোলা থাকত। এই সব খাবারের সঙ্গে দিদি দু-একটা সাজা পানও মায়ের ডিবে থেকে চুরি করে আনত। বেশি বকাঝকা করলে রসময়বাবুকে সেই পান দিয়ে বলত, 'মাস্টারমশায়, চট করে ঘরে গিয়ে আপনার জন্য পান নিয়ে এলুম।' হেডমাস্টার মশায় আর কিছু বলতেন না।

এই ঘরোয়া ইস্কুলে আমাদের ভাইবোনেদের হাতে-খড়ি হয়েছিল মাত্র। শিলাইদহে এসে বাবার নিজের তত্ত্বাবধানে রীতিমতো পড়াশুনা শুরু হল। আমাদের দেশে ইংরেজ সরকারের অধীনে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত

ছিল তার আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকদিন আগে থেকেই বাবা ভাবছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন ১২৯৯ সালে 'সাধনা' মাসিকপত্রে। তিনি যে-ধরনের শিক্ষা অপছন্দ করেন, তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা সেই শিক্ষা পাবে তা তিনি কেমন করে সহ্য করেন? বাবা নিজেই আমাদের বাংলা পড়াতে লাগলেন। দিদি তবু একটু বাংলা শিখেছিলেন, আমি তখন নিতান্তই অজ্ঞ। কিন্তু বাবা তা অগ্রাহ্য করে ভালো ভালো কবিতা শুনিয়ে আমাদের মুখস্থ করতে দিতেন, বুঝি আর নাই বুঝি। অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের নীরস ও আধো-আধো ভাষায় লেখা ছেলেমানুষী পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে তা তিনি পছন্দ করতেন না। সুখপাঠ্য সত্যিকার সাহিত্য তাদের গোড়া থেকেই পড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সবটা প্রথমে বুঝতে না পারলেও, শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে আপনা থেকেই বুঝবে। তখন 'কথা' ছাপা হয়ে গেছে। অল্পদিনের মধ্যেই তার সব কবিতা আমাদের আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে গেল। তার পর বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা পড়ালেন। আমাদের পড়াতে গিয়ে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বাবার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, পরে শান্তিনিকেতনে তাঁকে তা খুব সাহায্য করেছিল। Direct method-এ পড়ানো তিনি আমাদের নিয়েই অভ্যাস করেছিলেন এবং এই প্রণালীতে কত শীঘ্র ও কত সহজে ভাষা শেখানো যায় তার ফল দেখে তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক কান চোখ ও অবয়ব মাত্রেরই খুব চর্চার প্রয়োজন আছে— বাবা বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির সহায়তায় তা যত সহজে হয়, আর কিছুতে না। ছেলেরা ডানপিটেমি করলে তিনি ভয় পেতেন না, কখনো শাসন করতেন না। সেই অল্পবয়স থেকেই আমার স্বাধীনতা ছিল— যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া, মাছ-ধরা, নৌকা বাওয়া, লাঠি-সড়কি খেলা, সাঁতার-কাটা ইত্যাদি সবরকম খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ করার। মা আমাকে শখের জিনিস কেনার জন্য মাসে পাঁচ টাকা করে পকেট-মনি দিতেন। খেলনা না কিনে, সেই টাকা জমিয়ে কয়েকমাস পরে একটা ছোটো ডিঙি কিনলুম। তাতে দাঁড় টেনে, গুন বয়ে, পাল তুলে শনি-রবিবার সমস্ত দিন নদীর এপার ওপার করতুম। বাবা নিজেই আমাকে সাঁতার শিখিয়ে-

ছিলেন। তাঁর শেখাবার প্রণালী খুব সহজ। বোটের উপর থেকে একদিন আমাকে নদীর জলে ফেলে দিলেন। খানিকটা হাবুডুবু খেয়ে একদিনেই সাঁতার শেখা হয়ে গেল। বাবা নিজে খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারতেন। গোরাই নদীর এপার ওপার করতে তাঁকে অনেকবার দেখেছি।

বাবার কাছে বাধা পেয়েছিলুম একবার মাত্র। একটা গুলতি তৈরি করে প্রথম দিনই একটা শালিক পাখি মেরে ফেলেছিলুম। বাবা খুব রাগ করেছিলেন। জমিদারির মধ্যে পাখি মারা নিষেধ বলে তিনি একবার আদেশ দিয়েছিলেন। এর পিছনে একটি ঘটনা আছে। বাবা তখন পদ্মার চরে বোট বেঁধে আছেন। এক জোড়া চকাচকি রোজ রাত্রে বোটের কাছে এসে বসত। দুর্বুদ্ধিবশত বোটের মাঝি তার একটিকে একদিন মেরে বসল। তারপর জোড়াটা রোজ রাত্রে ঘটনাস্থলে এসে সঙ্গীর জন্য বিলাপ করত। কান্না সহ্য করতে না পেরে বাবা বোট অন্যত্র সরিয়ে নেবার আদেশ দিলেন ও নায়েব-মশায়কে ডেকে বলে দিলেন যেন তদ্দণ্ডে প্রচার করে দেওয়া হয় যে ঠাকুরবাবুদের এলাকার মধ্যে কেউ চকাচকি হাঁস প্রভৃতি শিকার করতে পারবে না। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত এই নিষেধ মেনে চলতেন।

সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখাবার জন্য দুজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন। শিবধন বিদ্যার্ণব যদিচ শ্রীহট্টের টোলে-পড়া পণ্ডিত, তাঁর সংস্কৃত-উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল। মহর্ষির মতো বাবাও বাঙালি-ধরনের সংস্কৃত উচ্চারণ পছন্দ করতেন না। শিবধন বিদ্যার্ণবের কাশীর পণ্ডিতদের মতোই বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখে বাবা তাঁকে আমাদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য রাখলেন। পরে মহর্ষি শিবধন পণ্ডিত-মহাশয়কে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য করেছিলেন।

ইংরেজির জন্য একজন খাঁটি ইংরেজকেই পাওয়া গেল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ফিরে তিনি ভারতবর্ষেই থেকে যান। তাঁর নাম ছিল মিস্টার লরেন্স। তিনি পড়াতেন খুব ভালো— তাঁর হাতে ইংরেজিভাষার গোড়াপত্তন আমাদের পাকারকমের হল। কিন্তু লোকটি মজার— পাগলাটে-গোছের— ছিলেন। রাজশাহি থেকে ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য, কিন্তু তার মধ্যে একটুও শুষ্কতা ছিল না। তিনি যখন বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা বলতেন, গল্পের মতো ফুটে উঠত চোখের সামনে পুরানো ইতিবৃত্তের কথা। বাবার সঙ্গে

ইতিহাস ছাড়াও নানা বিষয়ে আলোচনা হত, যা থেকে তাঁর মনের গভীরতায় প্রচুর পরিচয় পাওয়া যেত। অক্ষয়বাবু রাজশাহিতে উকিল ছিলেন— কিন্তু পড়াশুনা, ইতিহাসের গবেষণা নিয়েই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। উত্তর বঙ্গে পুরানো মুদ্রা, পাথরের মূর্তি প্রভৃতি অনেক ইতিহাসের মালমশলা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেইগুলি দিয়ে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র মিউজিয়াম গঠন করেন।

অক্ষয়বাবুর আর-একটি শখ ছিল, তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের কোনো যোগ ছিল না। বাংলাদেশে রেশমের চাষের কী করে উন্নতি করা যায় তাই নিয়ে পাগল ছিলেন। রেশমের গুটিপোকা কী করে জন্মাতে হয়, তাদের কী খেতে দিতে হয়, তারা গুটি বাঁধলে তার থেকে রেশমের সুতো কী করে কাটতে হয় ইত্যাদি রেশম চাষের যত-কিছু তথ্য লোকদের শেখাতে তাঁর পরম উৎসাহ ছিল। একবার শিলাইদহে এসে অক্ষয়বাবু লরেন্স সাহেবকে তাঁর শিষ্য বানিয়ে নিলেন। সাহেব থাকতেন একটা আটচালা বাড়িতে— সেটা হয়ে গেল গুটিপোকার চাষ ও রেশম-উৎপাদনের কারখানা। লরেন্স সাহেবের মাছধরার বাতিক ছিল, সে-সব ভুলে গিয়ে তখন থেকে গুটিপোকা নিয়ে পড়লেন। বাড়িতে যেখানে যা জায়গা ছিল, গুটিপোকা তা দখল করে নিল। আমরা দেখতুম রবিবার দিন তিনি খবরের কাগজ জড়িয়ে গুটিপোকাদের মধ্যে শুয়ে আছেন আর পোকারা তাঁর সর্বাঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিঃসন্তান এই সাহেবের এরাই ছিল সন্তান-সন্ততি।

পুরানো আমলে দিদিমাদের কাছ থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনত। গল্পের ভিতর দিয়ে তারা অনেক জ্ঞান লাভ করত, তাদের মনে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বেশ পাকা ভিত্তি হয়ে থাকত। খুব অল্প বয়স থেকেই তখন ইস্কুলে যেতে হত, সেখানে পাঠ্যপুস্তকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংরেজদের জীবনযাত্রার কাহিনী পড়তে হত, ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের কোনো সুযোগ তারা পেত না। বাবা মনে করতেন— রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু ছেলেদের পড়ে শোনানো যায় বা তাদের হাতে পড়তে দেওয়া যায় এমন কোনো বই তখন ছিল না। ভাষার বিশেষ পরিবর্তন করে, প্রক্ষিপ্ত ও অবান্তর ঘটনা বাদ দিয়ে

মূল গল্প দুটি অটুট রেখে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করার আগ্রহ তাঁর এই সময়ে দেখা গেল। রামায়ণ সংক্ষিপ্ত করার ভার দিলেন মাকে আর মহাভারত সুরেনদাদাকে। তাঁকে বললেন কালীপ্রসন্ন সিংহের তর্জমা অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত করতে। রামায়ণ সম্বন্ধে কিন্তু মাকে বললেন মূল সংস্কৃত থেকে সংক্ষেপ করে তর্জমা করতে। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে মা আগাগোড়া রামায়ণ পড়ে নিয়ে তর্জমা করতে লাগলেন। প্রয়োজনমতো বাবা পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিতেন। একটি বাঁধানো খাতাতে কপি করে রেখেছিলেন— তার থেকে মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শোনাতেন। মৃত্যুর পূর্বে মা এ কাজটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, তবে অল্পই বাকি ছিল। দুঃখের বিষয়, বাবার মৃত্যুর পর যখন তাঁর সমস্ত কাগজপত্র রবীন্দ্রসদনে দেওয়া হল তখন এই খাতাটি পাওয়া গেল না।

সুরেনদাদা প্রায়ই শিলাইদহে আমাদের কাছে আসতেন। তাঁর আসার জন্য দিদি আর আমি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতুম। জানতুম, তিনি মহাভারত সংকলনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসবেন, যতটা লেখা হয়েছে আমাদের পড়ে শোনাবেন। লেখা শেষ হতে দেরি হল। আমরা তখন শান্তিনিকেতনে চলে গেছি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাবার অভ্যাস ছিল সন্ধেবেলায় ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করা, তাদের গল্প বলা। এর থেকেই সন্ধ্যার ঐ সময়টার নাম হয়ে গিয়েছিল 'বিনোদন পর্ব'। ১৯০৩ সালের শীতকালে আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (বাবার বন্ধু ও লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র) মার্চ মাসে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, বাবা সেই সময় লাইব্রেরির বারান্দায় বসে সুরেনদাদার সংকলিত মহাভারত ছেলেদের পড়ে শোনাতে লাগলেন। পড়াশুনা ফেলে আমরা দুজনেও মহাভারতের গল্প শুনতে বসে গেলাম। মাস্টারমশায়রা বাবার কাছে নালিশ জানালেন। হরিবাবু (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) বললেন, সংস্কৃতে এরা কাঁচা, সন্ধেবেলায় একটু সংস্কৃত না পড়লে কিছুতেই পরীক্ষা পাস করতে পারবে না। স্থির হল, লাইব্রেরিরই পাশের একটা ঘরে মাস্টামশায় আমাদের পড়াবেন। বারান্দায় কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ চলছে আর আমরা দুজনে ঘরের ভিতর ভর্তৃহরির জটিল শ্লোকের অন্বয় করব— সে কি সম্ভব ? পড়তে কিছুতেই মন বসল না, চোখ থাকে বইয়ের উপর কিন্তু কান চায় গাণ্ডিব-ধনুর টংকার শুনতে। হরিবাবু বুঝলেন পড়ানোর

বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। বাবা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন : সংস্কৃত পরীক্ষায় ফেল করলেও ওদের যদি পড়া শুনতে দেওয়া হয়, অন্ততপক্ষে মহাভারত তো ওদের ভালো করে জানা হবে। মহাভারত শোনা হল, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাতে পাসও করা গেল। মহাভারতের এই সংকলন সুরেনদাদা যতটা লিখেছিলেন সবটাই ছাপা হয়েছিল, পরে তার থেকে আরো সংক্ষেপ করে, বাবার সম্পাদনায় 'কুরুপাণ্ডব' নামে বই ছাপা হয়।

শিলাইদহে থাকতে বাবা আমাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। তাঁর প্রণালী ছিল বেশ নতুন রকমের। রবিবার দিন তিনি চাকর-বামুন সকলকে ছুটি দিতেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমাদের করতে হত। রান্নার কাজে আমার খুব উৎসাহ বোধ হত— রান্না কেমন হল, তা বোঝাবার জন্য রাঁধুনির মাঝে মাঝে চেখে দেখার স্বাধীনতায় কেউ তো বাধা দিতে পারে না!

এইরকম করে শহরের জটিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে ও পিতামাতার স্নেহের অন্তরালে আমরা কয় ভাইবোন বড়ো হতে লাগলুম।

শিলাইদহের বাড়িতে অতিথির অভাব হত না। বাবার কাছে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা সর্বদাই আসা-যাওয়া করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছুটি পেলেই শিলাইদহে চলে আসতেন। তখন তাঁর হাসির গান খুব শোনা যেত। আমরা তাঁর গান শুনে হেসে লুটোপাটি খাচ্ছি— তিনি কিন্তু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গম্ভীরভাবে গান গেয়ে যেতেন। মুখে একটুও হাসির চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তখন সে খুবই ছোটো, দুষ্টু যত না হোক, বেশ 'আবদারে' ছিল। যত-কিছু আবদার তার বাবার কাছে। তিনি বিরক্ত না হয়ে হাসিমুখে তার সব অন্যায় আবদার সহ্য করতেন। বাবাকে বলতেন, দিলীপকে তিনি প্রচলিত শিক্ষা দিতে চান না। তিনি পরীক্ষা করতে চান কোনোরকম শিক্ষা না দিয়ে, কোনোরকম শাসন না করে তার নিজস্ব স্বাধীন প্রকৃতি কেমন প্রকাশ পায়।

আমাদের দেশে তখনকার দিনে সাধারণের মধ্যে আলু খাওয়ার তেমন প্রচলন হয় নি। আলুর চাষ করতে কৃষকরা জানত না। দ্বিজেন্দ্রলাল

কৃষিবিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি একবার এসে আলুর চাষ প্রচলিত করবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেন। বাগানের এক প্রান্তে খেত প্রস্তুত করা হল। আলুর চাষের এইটাই হবে পরীক্ষাকেন্দ্র। দ্বিজুবাবু বললেন, তিনিই বীজ পাঠিয়ে দেবেন এবং কী করে জমির পাট করতে হবে, কী সার দিতে হবে সব বিষয়ে মালীকে বুঝিয়ে দেবেন। জমি প্রস্তুত হল, যথাসময়ে (সরকারি ব্যাপার, বলা যায় না, যথাসময়ে না হয়ে যথেষ্ট অসময়েও বীজ এসে থাকতে পারে) বীজ এল, তা যথারীতি পোঁতা হল। দুঃখের বিষয়, ফসল তোলবার সময় দেখা গেল যে-পরিমাণ বীজ লাগানো হয়েছিল সে-পরিমাণও আলু তোলা গেল না। তার পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন আসতেন তাঁর সঙ্গে বাবা সাহিত্য-আলোচনাই করতেন।

নিয়মিতভাবে শিলাইদহে আসতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৯৭ সালে বাবার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্ভবত প্রথম পরিচয় ঘটে— অল্পদিনের মধ্যেই সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পদ্মার চর জগদীশচন্দ্রের খুব ভালো লাগত। শীত পড়লে পদ্মানদী শীর্ণ হয়ে আসত, আর দু-পারে বালির চর জেগে উঠত। চর শুকিয়ে গেলেই আমরা কুঠিবাড়ি ছেড়ে নদীর ধারে গিয়ে বাস করতুম। দুটি বড়ো বড়ো ঢাকাই বজরা ছিল— বাড়ির মতোই তাতে বেশ আরামে বাস করবার ব্যবস্থা থাকত। তা ছাড়া কয়েকটা পানসি, লালডিঙি, জলিবোট প্রভৃতি বিচিত্র রকমের নৌকা নানান প্রয়োজনের জন্য ঘাটে বাঁধা থাকত। বালির চরের উপর ঝাঁপ ও উলুখড় দিয়ে কয়েকটি অস্থায়ী রকমের ঘরও বানানো হত— রান্নাবাড়ি বা চাকরদের ব্যবহারের জন্য। আমাদের সবচেয়ে পছন্দ ছিল নদীর উপর যে স্নানাগার তৈরি হত। সেইটির ডাঙার অংশে কাপড় ছাড়বার ঘর— আর জলের উপর খুঁটি ও বেড়া দিয়ে ঘেরা অংশ স্নানের জন্য। তার ভিতর ডুবজল কোথাও নেই বলে আমরা নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে পারতুম। এর ভিতর কুমির আসবারও উপায় ছিল না। এইটাই ছিল আমাদের খেলাঘর। এইরকরম করে সারা শীতকাল আমাদের কাটত পদ্মার কোলে, বালির চরের কোনো নিরালা একধারে— যেখানে জনমানবের সংস্রব নেই— থাকত কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস চকাচকি।

জগদীশচন্দ্র প্রতি সপ্তাহে শনিবার দিন সেখানে আসতেন, দু-রাত কাটিয়ে সোমবার কলেজের কাজে আবার ফিরে যেতেন। বাবার সঙ্গে দেখা হতেই

প্রথমেই তাঁর দাবি জানাতেন— গল্প চাই। প্রতি সপ্তাহেই একটি করে নতুন ছোটোগল্প তাঁকে পড়ে শোনানো যেন বাঁধা দস্তুর হয়ে গিয়েছিল। লেখা শেষ হলেই প্রথমে পড়ে শোনাতে হবে জগদীশচন্দ্রকে, তার পর ছাপতে যাবে। বন্ধুত্বের এই দাবি বন্ধুর পক্ষে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না।

বাবা যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে জগদীশচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন, আমারও তেমনি ঔৎসুক্য কম ছিল না। আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন— ছোটো বলে উপেক্ষা করতেন না। আমি তাঁর স্নেহপাত্র হতে পেরেছি বলে আমার খুব অহংকার বোধ হত। আমি মনে মনে কল্পনা করতুম বড়ো হলে জগদীশচন্দ্রের মতো বিজ্ঞানী হব।

বর্ষার পর নদীর জল নেমে গেলে বালির চরের উপর কচ্ছপ উঠে ডিম পাড়ত। জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে ভালোবাসতেন। আমাকে শিখিয়ে দিলেন কি করে ডিম খুঁজে বের করা যায়। শুকনো বালির উপর কচ্ছপের পায়ের দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, সেই সার-বাঁধা পায়ের চিহ্ন এঁকে বেঁকে বহুদূর পর্যন্ত চলে। গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপ না পেলে ডিম ফোটে না, তাই কচ্ছপরা নদী ছাড়িয়ে যতটা সম্ভব উঁচু ডাঙায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। বালি সরিয়ে গর্তের মধ্যে ডিম পেড়ে আবার বালিগুলি সমান করে চাপা দিয়ে যায় যাতে শেয়াল সন্ধান না পায়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও, ধূর্ত শেয়ালকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিতে পারে না। আমাকে জগদীশচন্দ্র শিখিয়ে দিলেন কি করে পায়ের দাগ ধরে ধরে গর্তের মধ্যে কচ্ছপের ডিম আবিষ্কার করতে হয়। শেয়ালের সঙ্গে আমার রেষারেষি চলতে থাকত। ডিমের খোঁজ করতে গিয়ে অনেকসময় কচ্ছপ-মাতারও সন্ধান মিলত। ডাঙার উপরে তার পালানোর উপায় নেই, উলটে দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসা সহজ। কচ্ছপের মাংস খেতেও জগদীশচন্দ্র খুব পছন্দ করতেন।

পদ্মার চরে বসবাস জগদীশচন্দ্রের বড়ো ভালো লাগত। দেশ-বিদেশে কত সুন্দর জায়গা তিনি দেখে এসেছেন। তবু আমাদের বলতেন, পদ্মার চরের মতো এমন মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্নানের পূর্বে আমাকে দিয়ে তিনি বালির মধ্যে কয়েকটি গর্ত করিয়ে রাখতেন। সকলকে এক-একটি গর্তের মধ্যে আকণ্ঠ বালি চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে হত। যখন সমস্ত শরীর গরম হয়ে প্রায় আধসিদ্ধ হয়ে উঠত তখন পদ্মার ঠাণ্ডা

জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত। তিনি বলতেন এতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

জগদীশচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তাঁর প্রকাশভঙ্গিও ছিল ভারি সুন্দর ও সরস। গল্প বলার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যরস থাকত বলে তাঁর কাছে গল্প শুনতে খুব ভালো লাগত, কৌতূহল জেগে উঠত, ক্লান্তিকর কখনো মনে হত না। দিনের বেলা গল্পগুজবে ও নানান বিষয়ের আলোচনায় কেটে যেত। সন্ধ্যা হলেই উনি বাবাকে ধরতেন তাঁর লেখা পড়ে শোনাবার জন্য। কবিতা প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেবার উপায় ছিল না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সব থেকে বেশি আগ্রহ ছিল ছোটোগল্প শুনতে। আহারাদির পর শুরু হত গান। কয়েকটি গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। যে গানটি বাবাকে বার বার গাইতে বলতেন, সেটি হচ্ছে—

এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস—

এইরকম বিমল আনন্দে কেটে যেত প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার। কলকাতায় ফেরবার মুখে জগদীশচন্দ্র বন্ধুকে নোটিশ দিয়ে রাখতেন আসছে সপ্তাহে আর-একটা নতুন গল্প চাই।

একজন বিজ্ঞানী, অন্যজন কবি— এঁদের মধ্যে যে আকর্ষণ ছিল সে কেবল বন্ধুত্ব বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। কথাবার্তা গল্প করার মধ্যে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা যেন সর্বদাই চলত। নতুন গল্পের প্লট বা যে প্রবন্ধ লিখছেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে বাবা আলোচনা করতেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্‌ভাবিত নতুন যন্ত্রের কথা বলতেন, নতুবা বলতেন জড় ও জীবের মধ্যে কি সব অদ্ভুত মিল তিনি সেই যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন। দুজনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চললেও তাঁরা যেন যথেষ্ট খোরাক পেতেন পরস্পরের কথাবার্তা আলোচনা থেকে।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গান পেয়ে বসত— অমলাদিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলাদিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মুখরোচক নানারকম ঢাকাই-রান্নাতে তাঁর হাতযশ ছিল— মা তাঁর কাছ থেকে সেই-সব রান্না শিখে নিতেন। আর মা শেখাতেন তাঁকে যশোহর অঞ্চলের নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধার পদ্ধতি। সন্ধে হলেই, অন্য-সব কাজ ফেলে গান শোনবার জন্য সবাই সমবেত হতেন।

মাঝিরা জলিবোটটা বজরার গায়ে বেঁধে দিতে যেত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে জানলা দিয়ে টপকে সেই বোটটাতে গিয়ে বসতুম। সুরেনদাদার হাতে এসরাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে রাখা হত। তার পর শুরু হত গান— পালা করে বাবা ও অমলাদিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন। আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত অবারিত জলরাশি, গানের সুরগুলি তার উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে গিয়ে কোন্ সুদূরে যেন মিলিয়ে যেত, আবার ওপারের গাছপালার ধাক্কা খেয়ে তাব মৃদু প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে ফিরে আসত। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে চারি দিক নিঝুম হয়ে আসত। নৌকা-চলাচল তখন বন্ধ। বোটের গায়ে থেকে-থেকে ঢেউগুলি এসে লাগছে এবং কুলুকুলু শব্দ করে স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে নদীর জল কোথাও কোথাও ঝিকিমিকি করে ওঠে। কখনো দু-একটা জেলে-ডিঙিতে মাঝিরা ভাটিয়ালি সুরে দাঁড় ফেলাব তালে তালে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। গানের আসর ভাঙবার আগেই আমি মা'ব কোলে ঘুমিয়ে পড়তুম। সে-সব রাত আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু আজও যখন

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে···

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা···

প্রভৃতি গান শুনি, সেই-সব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়— যে রাত্রে গানের সুর জলের কলধ্বনি ও ফুরফুরে দক্ষিণের হাওয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেত, যে রাত্রে চাঁদের আলোর বন্যায় নদীর জলে ও নদীর চরে অপূর্ব এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করত। গানের এমন মনোরম পরিবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

লোকেন পালিত তখন রাজশাহির ডিস্ট্রিক্ট জজ। তিনিও আদালতের কাজ ছেড়ে কখনো কখনো বাবার কাছে শিলাইদহে পালিয়ে আসতেন। সাহিত্য-আলোচনায় দুজনের আনন্দে সময় কাটত। লোকেনবাবু খুব সিগারেট খেতেন। একদিন খাওয়াদাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত বাবা তাঁকে কবিতা পড়ে শুনিয়ে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিলেন। বাবাও নিজের ঘরে এসে শুয়েছেন; তখনো ঘুমিয়ে পড়েন নি, এমন সময় ধোঁয়ার গন্ধ পেলেন। কোথাও আগুন লাগল কিনা সন্ধান করতে গিয়ে দেখেন, লোকেনবাবু যে খাটে শুয়ে ছিলেন

তার মশারি দাউ দাউ করে জ্বলছে— তিনি সেই আগুনের মধ্যে দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তার আগুনে মশারি ধরে গিয়েছিল।

পদ্মার ধারে বোটে থাকতে একবার কয়েকদিনের জন্য নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন বেড়াতে। তাঁর সাহিত্য- ও সংগীত-রসবোধ সম্বন্ধে সকলেই অবগত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি তারা জানে না— তাঁর কিরকম সরল স্বভাব ছিল, তিনি কিরকম অবিচারে সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশতে পারতেন। আর তাঁর প্রধান গুণ ছিল মজলিস জমানো। সেকালের লোকদের মধ্যে এই গুণটি খুব দেখা যেত। দুঃখের বিষয় এখন মজলিসও লোপ পেয়েছে, মজলিসি লোকেরও অভাব হয়েছে।

মহারাজা আসতেই পদ্মার চরের নির্জনতা মুহূর্তের মধ্যেই যেন ঘুচে যেত। হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে জমে উঠত দিনগুলি। আমাদের মজা লাগত তাঁর কাছে শুনতে— মহারাজা হবার যোগ্যতা কি কঠিন পরিশ্রমে তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল। নিঃসন্তান বিধবা রাজমাতা তাঁকে যখন গরিব আত্মীয়ের ঘর থেকে নিয়ে এসে মহারাজার গদিতে বসালেন তখন তিনি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিন্তু তখন থেকেই রাজকীয় আচার-ব্যবহার তাঁকে শিখতে হল। সমস্ত দিন ধরে গানবাজনা আমোদপ্রমোদ যা-কিছু হত, তাঁকে উপস্থিত থাকতে হত। তারপর সন্ধ্যা হতে যখন শ্রান্তি ও ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়তেন তখন রাজমাতা এসে জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলতেন, 'মহারাজা হয়েছিস, এই সবে সন্ধে, এখন কি খাবি, রাত তিনটের সময় রাজারাজড়ারা খেয়ে ঘুমোতে যায়।' আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'রথী রে, মহারাজা যেন কখখনো হতে যাস নে।'

গবেষক জীবনচরিত-লেখকরা সঠিক খবর দিতে পারবেন, তবে সাধারণ-ভাবে আমার ধারণা, বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয় নি। এই সময় তিনি অনর্গল কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প লিখে গেছেন— একদিনের জন্যও কলম বন্ধ হয় নি। শিলাইদহের যে-রূপবৈচিত্র্য, তার মধ্যে পেয়েছিলেন তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ। নদীর পারে বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল তৃণভূমি, তারই প্রান্ত দিয়ে বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ছোটো ছোটো গ্রাম। শরতের রোদ খেত-ভরা

পাকা ধানের উপর দিয়ে ঝলক দিয়ে যাচ্ছে। শীতের ঝির্‌ঝিরে হাওয়া দুলিয়ে দিয়ে যায় সরষের হলদে ফুলের গোছা। সেখানকার প্রকৃতির এই রমণীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা তাঁর বহু রচনায় আমরা দেখতে পাই।

বাবা সমস্ত দিন ধরে লিখতেন তাঁর ঘরে— সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ —মা বারণ করে দিয়েছিলেন। লেখার ঝোঁক যখন বেশি চাপত তখন খাওয়া-দাওয়া এক-রকম ছেড়ে দিতেন। মা খুব রাগারাগি করতেন কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে: বাবা তখন সরলাদিদির উপর 'ভারতী'র সম্পাদনভার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভার লাঘব বিশেষ-কিছু হল না। লেখার জন্য তাঁর উপর দাবি সমানই থেকে গেল। প্রতিমাসেই সরলাদিদির কাছ থেকে তাগিদের চিঠি আসে। সরলাদিদি ভারতীর জন্য বাবাকে একটা প্রহসন লিখে দিতে বলেন কিন্তু বাবার সময় আর হয় না। এদিকে বড়ো লেখা না হলে সরলাদিদির চলে না, তাই তিনি গত্যন্তর না দেখে তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন যে, পরের মাস থেকে ভারতীতে নিয়মিত রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রহসন বেরোবে। ভারতীর পক্ষ থেকে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে বাবাকে বিজ্ঞাপনের খবরটাও জানিয়ে দিলেন। চিঠি পেয়ে বাবা প্রথমটা একটু বিরক্ত হন। কিন্তু সরলাদিদিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করতে পারেন না, কাজেই অবিলম্বে লেখায় হাত দিলেন। 'আমি লিখতে যাচ্ছি—খাবার জন্য আমাকে ডাকাডাকি কোরো না', এই বলে তিনি লিখতে বসে গেলেন। খেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সমস্ত দিন ধরে লিখতে লাগলেন। মা মাঝে মাঝে ফলের রস বা শরবত তার টেবিলে রেখে আসতেন। যখনই এই প্রহসনের মাসিক কিস্তি পাঠাবার সময় হত, বাবা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে লেখায় ডুবে যেতেন। একবার এরকম একটা মাসিক কিস্তি লেখা সবেমাত্র শেষ হয়েছে, বাবা মাকে বললেন, 'আমার গল্পটা লেখা শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এখনি কলকাতায় যেতে হবে।' এই কথা শুনে মা কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। তিনি জানতেন, কোনো লেখা শেষ হলে সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সেটা যতক্ষণ না পড়ে শোনাচ্ছেন— বাবা স্বস্তি বোধ করতেন না। এই অভ্যাস তাঁর বরাবর থেকে গিয়েছিল। গল্পটার তখন নাম দিলেন—'চিরকুমার সভা'। পরে এটা পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে। এই নামটি বোধ হয়

বাবার বিশেষ পছন্দ হয় নি। উপন্যাসটি যখন নাটকে পরিবর্তিত হল তখন তার নাম 'চিরকুমার-সভা'ই রইল।

লেখার খাতা নিয়ে বাবা চলে গেলেন কলকাতায়। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম ও তার উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সেবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তেতলার ঘরে উঠতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে তাঁর আর স্বাধীনতা রইল না, মায়ের ব্যবস্থাই তাঁকে মেনে চলতে হত।

এই সময়ে যতদিন শিলাইদহে ছিলেন, অজস্র ধারায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ বাবা লিখে গেছেন। 'চিরকুমার সভা'র কথা উল্লেখ করেছি— তারই সমসাময়িক বলা যায়— কণিকা কল্পনা কথা কাহিনী প্রভৃতিতে প্রকাশিত কবিতা, উপন্যাসের মধ্যে চোখের বালি ও 'ভারতী'র জন্য বহু প্রবন্ধ। মাঝে মাঝে কলকাতায় যাতায়াত, কুষ্টিয়ায় আখের কলের কারখানা দেখা, জমিদারি সেরেস্তার কাজ পরিচালনা, প্রজাদের নালিশের সালিস-বিচার করা, অতিথিদের অভ্যর্থনা— এই-সব কাজের মধ্যেও বাবা অবিশ্রাম লিখে গেছেন।

বাবা জমিদারির কাজ দেখতে ভালোই বাসতেন। কুঠিবাড়িতে যতদিন থাকতেন প্রতিদিনই সকালবেলায় আমলারা খাতাপত্র নিয়ে তাঁর কাছে আসত। বাবা যে জমা-ওয়াশিল-বাকি প্রভৃতি জমিদারির জটিল হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতেন তা পরে যখন আমাকে জমিদারি দেখার ভার দিলেন তখন আমি জানতে পেরেছিলাম। তিনি নিজেই আমাকে জমিদারি সেরেস্তার হিসাব রাখার সমস্ত প্রণালী শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমলাদের কথায় চোখ বুজে কখনো কোনো চিঠি বা কাগজ সই করতেন না। বাবাকে সেজন্য কর্মচারীরা খুবই সমীহ করত। সকালবেলায় হিসাব দেখা হলে আর চিঠিপত্র সই করা হয়ে গেলে প্রজাদের দরবার বসত। বাবার কাছে প্রজাদের অবারিত দ্বার ছিল, কোনো কর্মচারী সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে সাহস করত না। প্রজারা বাবার কাছে সবসময় যে নালিশ করতে আসত তা নয়— তাঁর কাছে ঘরের কথা বলতে, তাদের সুখদুঃখের কথা জানাতেও আসত। হাতে একটা দরখাস্ত থাকত অবশ্য, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে সেটা উপলক্ষ মাত্র। 'ধর্মাবতার পিতা'র কাছে একটা আর্জি বা নালিশ না নিয়ে খালি হাতে আসে কী করে? সত্যিকার নালিশ থাকলে বাবাকেই জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের স্থান

অধিকার করতে হত। আমাদের জমিদারির মধ্যে কোনো বিবাদ নিয়ে প্রজারা আদালতে কথনো যেত না। বাবা প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মেটাবার একটা পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে বাসিন্দারা তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান মনোনীত করত। ঐ গ্রামের প্রধানরা আবার পরগনার পঞ্চপ্রধানকে মনোনীত করত। অল্পস্বল্প ঝগড়াঝাঁটি গ্রাম-প্রধানরাই মিটিয়ে দিত। মারামারি বা জমিজমা নিয়ে মকদ্দমা যেত পঞ্চপ্রধানের কাছে বিচারেব জন্য। শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। কর্মচারীদের বিচারের কোনো অধিকার ছিল না। বাবা এই ব্যবস্থা প্রচলন করার পবে তা বহুকাল ধরে চলেছিল— প্রজারাও খুশি হয়ে মেনে নিয়েছিল, সরকারি আদালতে এর চেয়ে সুবিচার পাবে তারা বিশ্বাস করত না। বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো পক্ষ আদালতে গিয়ে নালিশ করলে গ্রামবাসীরা তাকে সমাজচ্যুত করে শাস্তি দিত। এই বিচারপদ্ধতিতে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল তার আরো একটি কারণ— অযথা মামলা-মকদ্দমার খরচ থেকে তারা বেঁচে যেত।

বিচার-ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে আরো অনেক কথা মনে আসছে, যদিও সেগুলো কয়েক বছর পরের ঘটনা, আর তখন আমি বড়ো হয়ে বিদেশে গিয়েছি। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তখনকার দেশনেতারা কলকাতা এবং বড়ো বড়ো শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন— কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশি করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন, কেবল আন্দোলন করলেই হবে না, ভিত থেকে কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই সময় পাবনা কনফারেন্সে তাঁকে যখন ডাকা হল, এই কথাই তিনি দেশবাসীকে জানালেন তাঁর ভাষণে। কেউ যখন কিছু করলেন না তখন তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারেন সেই কাজে নেমে গেলেন। বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম— এই দুই পরগনা তাঁর হাতে ছিল— তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য একটা প্ল্যান করলেন। বিচারের ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। মহাজনের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করা, চাষের উন্নতি করা, ঘরে ঘরে ছোটো-খাটো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি গ্রামোন্নতির নানা দিকে চেষ্টা যাতে হয় তার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। বাইরে থেকে অজস্র টাকা ঢেলে কোনো কাজই করা যাবে না, গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি

করবে, এইটেই ছিল বাবার উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতন থেকে কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে পতিসরে নিয়ে এলেন। কাজ আরম্ভ করে দেখলেন পতিসরেই উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাবে— শিলাইদহের আশেপাশে প্রজাদের মধ্যে তেমন ঐক্যবন্ধন ছিল না। কালীমোহনবাবুকে শান্তিনিকেতনে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল বলে তাঁকে শীঘ্রই ফিরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা অনেকদিন পর্যন্ত পতিসরে গ্রামোন্নতির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

কালীগ্রাম পরগনাকে কাজের সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হল। পল্লীসংগঠনের কাজ একটি সাধারণ সভার হাতে ন্যস্ত করা হল। প্রজারা স্বেচ্ছায় একটা কর দিতে রাজি হল। খাজনা আদায়ের সময় প্রতি টাকায় এক আনা করে সকল প্রজাই দিত, সেই টাকা সাধারণ ফাণ্ডে জমা হত। এই উপায়ে ফাণ্ডের যা আয় হত সাধারণ সভা বাজেট করে স্থির করত সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে। একে একে প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হল, আর পতিসরে স্থাপিত হল একটি মাইনর ইস্কুল— পরে সেটা হাই স্কুলে পরিণত হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে পতিসরেই কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব হল। পরে তিন বিভাগে তিনজন ডাক্তার বসানো হয়েছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে থাকল, পানীয় জলের ব্যবস্থা হল। বয়নশিল্প শেখানোর জন্য শ্রীরামপুর থেকে একজন ভালো তাঁতিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রজাদের উৎসাহ যেমন বাড়ল, এই-সব কাজেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিছুদিন পরে বাবা দেখলেন, প্রজাদের সাধারণ সভা একটি কাজ করতে অসমর্থ— সে হচ্ছে মহাজনের ঋণ থেকে তাদের মুক্ত করা। ঋণমুক্ত না হলে তারা কোনো বিষয়েই উন্নতি করতে পারবে না। কৃষির বা শিল্পের জন্য যেটুকু মূলধন দরকার তা তাদের হাতে কখনো থাকবে না। এইজন্য বাবা নিজেই পতিসরে একটি ব্যাঙ্ক খুললেন। কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হল। পরে বাবা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন এক লাখের উপর সব টাকাটাই এই কৃষিব্যাঙ্কের কাজে দিলেন। ব্যাঙ্ক যা সুদ দিত বহু বছর ধরে সেটা শান্তিনিকেতন ইস্কুলের একটা প্রধান আয় ছিল। কৃষিব্যাঙ্ক হয়ে প্রজাদের খুব উপকার হল— কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনদের দেনা সম্পূর্ণ শোধ করে দিতে পেরেছিল। কালীগ্রাম এলাকা থেকে মহাজনরা তাদের ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিল।

পতিসরে বাবা পল্লীসংগঠনের যে পরীক্ষা করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার যে আশাতীত ফল পেলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের লোকের সেদিকে কোনো দৃষ্টি গেল না। ১৯০০ সালে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালে আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে আসি তখন কালীগ্রামের সাধারণ সভার কাজ পুরোদমে চলছে দেখলুম। কিন্তু সে সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে গ্রামবাসীদের কথা কি কেউ ভেবেছিল? পল্লীসংগঠন কি পোলিটিক্যাল প্রোগ্রামের অঙ্গীভূত হয়েছিল? বহুকাল পরে মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। পতিসরের গ্রামোন্নতির কাজের ফলাফল দেখে বাবা খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন; তাঁর মনে সন্দেহ রইল না যে, এই পথেই দেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সেখানকার অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জমিদারি পরিদর্শন করার জন্য বাবাকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হত। জমিদারিগুলি ছিল ছড়ানো। নদিয়া পাবনা রাজশাহি— বাংলার এই তিন জেলা ছাড়াও, উড়িষ্যার কটক জেলায় সেগুলি অবস্থিত ছিল। বাংলার যে তিনটে জমিদারি, তাদের পরস্পরের মধ্যে জলপথের যোগ ছিল। বাবা অধিকাংশ সময় শিলাইদহ থেকে বোটে করে সাহাজাদপুর ও পতিসরে যাতায়াত করতেন। পদ্মার ওপারে উত্তর বঙ্গে যেতে গেলে পাবনার পাশ দিয়ে ইছামতী নদীর ভিতর ঢুকতে হয় এবং তার পর অনেক ছোটো ছোটো নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগোতে হয় উত্তর দিকে। বাংলার এই খুদে নদীগুলির পথ যেন গোরুর গাড়ির পথের মতো, ক্রমাগতই এঁকে বেঁকে চলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। গ্রামের আনাচে-কানাচে লুকোচুরি খেলে হঠাৎ বেরিয়ে প'ড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কোনো বিলের বিস্তৃত জলে। এইরকম কত-না নদী বেয়ে বোট চলে ধীর মন্থর গতিতে। গ্রামের ধারে দেখা যায় ঘাটে মেয়েদের জটলা— কারো কাঁখে ঘড়া, কারো কোলে শিশু, কেউ তীরে বসে মাজছে পিতলের বাসন, আর সকলে মিলে হাসি ঠাট্টা গল্প চলছে অনর্গল। একদল ছেলে জলে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি করে, সাঁতার কাটে, জল ছিটোয়। নদীর দু-পারে কতরকম মাছ-ধরার খাঁচা, কতরকম জাল খাটানো। নদীর ওপারের খেতে সোনালি রঙের পাকা ধান, চাষিরা সেই ধান কাটতে ব্যস্ত। কাটা ধান কানায় কানায়

বোঝাই করে নৌকা নিয়ে আসে ঘরে। বাঁশের ঝাড় ঝুলে পড়েছে নদীর উপর— তারই একটা শুকনো ডগায় বসে আছে মাছরাঙা পাখি স্থির হয়ে— তার নিবিষ্ট দৃষ্টি রয়েছে জলের উপর মাছের অপেক্ষায়। এইরকম কত-না গ্রাম্য জীবনের দৃশ্য, যুগের পর যুগ যার কোনো পরিবর্তন নেই— নির্বিকার, শান্ত, সমাহিত অথচ শ্রমশীল— বাবা বোটে বসে দেখতে দেখতে চলতেন। জলপথ তাঁর এত ভালো লাগত যে কলকাতা থেকে কয়েকবার তিনি খাল দিয়ে বোটে করে বরাবর কটক পর্যন্ত গিয়েছিলেন। রেলগাড়ি হবার আগে জগন্নাথ দর্শনে যাত্রীদের পুরী যাবার এই ছিল উপায়।

শিলাইদহের কাছে কুষ্টিয়া শহর গোরাই নদীর ধারে। কুষ্টিয়া ব্যাবসাপ্রধান শহর। স্টেশনের কাছে আমাদের খানিকটা জমি ছিল, সেখানে একটা বাড়িও করা হয়েছিল। ব্যাবসা করার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র দেখে বলুদাদা আর স্বরেনদাদার লোভ হল সেখানে একটা ব্যাবসা খোলেন। বাবাকেও তার ভিতর টেনে নিলেন। Tagore & Co. নামে কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। প্রথমে পাটের গুদাম করা হল, গাঁট বাঁধার মেশিন এল, তাই দিয়ে গাঁট বেঁধে কলকাতায় পাট রপ্তানি করা হতে লাগল। লাভ হচ্ছে দেখে ব্যাবসা আরো বাড়াতে ইচ্ছে হল। তখন আখ মাড়াই করার কল সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন ইংরেজ কলকাতা থেকে কল তৈরি করিয়ে এনে কৃষকদের কাছে ভাড়া খাটাতে শুরু করল। কুষ্টিয়াতে তার এই ব্যাবসা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিল। কেবল ইংরেজই এই অর্থকরী ব্যাবসা করবে কেন, বাবার এবং দাদাদের ইচ্ছা হল তাঁরাও আখ-মাড়াই কলের কারবার করেন। নদিয়া ও আশেপাশের ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় আখের চাষ যথেষ্ট ছিল— কিন্তু আখ মাড়াই করার ভালো ব্যবস্থা ছিল না। মাড়াইয়ের লোহার কল আবিষ্কার হতে চাষিদের খুব সুবিধা হল। ঠাকুর কোম্পানির এই ব্যাবসা বেশ ভালোই চলত যদি-না ম্যানেজার বহু টাকা চুরি করে পলাতক হত। কারবার গুটিয়ে ফেলতে হল, বাবার ঘাড়ে শেষপর্যন্ত অনেক দেনা চাপল। বাবার এই প্রথম ও শেষ চেষ্টা ব্যাবসা করার।

ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে আমি একবার একলা শিলাইদহে গিয়েছিলুম। সেবারকার একটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে— ঘটনাটি বেশ গল্প লেখবার মতো। পুজোর পরেই বাবা শিলাইদহে গেলেন বোটে, নদীর উপর থাকবেন

বলে। কিন্তু তখনো নদীর জল তেমন নামে নি, বালির চর জাগে নি। শুকনো চর খুঁজে বের করার জন্য নদীর এপার ওপার ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে— এমন সময় ঝড়ের লক্ষণ দেখা গেল। বাবা মাঝিদের বললেন একটি দহের মধ্যে বোট নিয়ে রাখতে। কি ভাগ্যি সময়মতো দহের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, না হলে বিপদ ঘটত। দড়াদড়ি দিয়ে ভালো করে নৌকো বাঁধার পরেই প্রচণ্ড ঝড় এল। তিনদিন তিনরাত সাইক্লোনের ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছিল। আমরা যে-দহের মধ্যে ঢুকেছিলুম, দেখতে দেখতে চার দিক থেকে ছোটো বড়ো নানারকম নৌকা এসে তার মধ্যে আশ্রয় নিল। দহের মধ্যে ঢেউ আসতে পারে না— আমরা বেশ নিরাপদে আটঘাট বেঁধে সেখানে রইলুম। বোটের জানলা দিয়ে দেখতুম নদীর খরস্রোতে রাশি রাশি ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা নৌকার কাঠকুটো জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। বুঝতে পারলুম নদীর ধারের বহু গ্রামের সর্বনাশ হয়েছে, খোলা নদীতে যত নৌকা ছিল ডুবে গেছে। তৃতীয় দিনের বিকেলবেলায় ঝড়ের প্রকোপ কমে গেল, বাবা আমাকে নিয়ে বোটের ডেকের উপর এসে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাঝিকে ডেকে বললেন, 'দেখ্ তো, মাঝনদীর জলে কী যেন ভেসে যাচ্ছে? চুলের মতো মনে হচ্ছে, মেয়েমানুষের চুলের গোছাই হবে। যা, শীঘ্র জলিবোটটা নিয়ে যা।' তুফান দেখে মাঝি সাহস করে নামে না। বাবা তখন নিজেই যাবার উদ্যোগ করছেন— এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এসে বাবাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের বুড়ো গফুর বাবুর্চি ছোটো বোটটাতে লাফিয়ে পড়ল এবং উত্তম-মধ্যম গালাগালি দিতে দিতে মাঝিদের টেনে নামিয়ে বোট ভাসিয়ে দিল। আমরা শঙ্কিতভাবে দেখতে লাগলুম, বোটটা সময়মতো মজ্জমান স্ত্রীলোকটির কাছে পৌঁছতে পারে কিনা। মাঝিরা ডাক ছেড়ে ঘন ঘন দাঁড় ফেলছে ঢেউয়ের উপর— আছাড় খেতে খেতে বোট ছুটে চলেছে, তবু যেন তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। অন্ধকার হয়ে এল— আর-কিছু দেখা যায় না, কেবল গফুর মিঞার হাঁকডাক মাঝে মাঝে কানে আসে। অনেকক্ষণ পর বোট ফিরে এল, বাবুর্চির তখন কী উল্লাস— 'মিল গিয়া, বাবুজি, মিল গিয়া!' শোনা গেল, মেয়েটি কিছুতেই বোটে উঠতে চায় নি, চুল ধরে কোনোরকমে তাকে বোটে তোলা হয়েছিল। বাবা দেখলেন —একটি যুবতী স্ত্রীলোক, সুন্দর তার চেহারা, বোটের এক কোণে জড়সড়

হয়ে বসে আছে। অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে তার পরিচয় বের করতে পারলেন। শিলাইদহের কাছেই তার বাড়ি, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কিন্তু সাঁতার জানত বলে ডুবতে পারে নি।

বাবা তার শ্বশুরকে চিনতেন, তাকে ডেকে পাঠিয়ে বউকে নিয়ে যেতে বললেন। ছেলেকে শাসন করে দিতেও বললেন, যাতে এরকম ঘটনা আর না হয়। শুনতে পাই পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর ঝগড়া হয় নি—পরম সুখে তারা সংসার করেছে।

পদ্মা ও পদ্মাবোট

শিলাইদহ পদ্মা ও গোরাই নদীর মোহানায় অবস্থিত। শিলাইদহের সঙ্গে পদ্মাবোটের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বোটটির নামকরণ বাবাই করেছিলেন। পদ্মানদী তাঁর বড়ো প্রিয় ছিল, তাই নাম দিলেন পদ্মাবোট।

পদ্মাবোটের সঙ্গে আমাদের পরিবারেরও কম যোগ ছিল না, বাবার সঙ্গে তো বিশেষ। তাই এই বোট সম্বন্ধে কিছু না বললে অনেক কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বোটটির ইতিহাস আছে। প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এটা তৈরি করান। সম্ভবত ঢাকাতে তৈরি করানো হয়— কেননা এর গড়ন ছিল ঢাকাই বজরার মতো, তবে সাধারণ বজরা অপেক্ষা আয়তন অনেক বড়ো ছিল। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত, বাড়ির মতো আরামে বাস করা যেতে পারত। বারোটা দাঁড় লাগত একে চালাতে। বোটটা তখন থাকত কলকাতার গঙ্গায়। মহর্ষি এই বোটে গঙ্গা বয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যেতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে, তিনি যখন ১৮৪৬ সালে এই বোটে বারাণসী যাবার জন্য রওনা হয়েছেন তখন তাঁর কাছে খবর এল লণ্ডনে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। তিনি সেই সংবাদ পেয়ে বোট ঘুরিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। মহর্ষির ব্যবহার করা বন্ধ হলে বোটটা শিলাইদহে নিয়ে রাখা হল।

রেলগাড়ি চলবার আগে নৌকা করে সর্বত্র যাতায়াত প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে নদীনালা, খালবিলের তো অভাব নেই। জমিদার বা ব্যবসায়ী ধনীদের তখন নানাবিধ নৌকা না রাখলে চলত না। নিজেদের ব্যবহারের জন্য বজরা থাকত। বাংলার নদীতে গভীর জল সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই বজরাগুলি বেশ চওড়া হলেও তাদের খোলের তলাটা সমান চ্যাপ্টামতো, খুব অল্প জল ভেঙেও যাতে সহজে যেতে পারে। সাধারণত বজরাগুলিতে বেশ বড়ো বড়ো দুটো কামরা থাকে যাতে বাড়ির মতো টেবিল চেয়ার খাট প্রভৃতি আসবাব দিয়ে সাজিয়ে রাখা যায়। ঢাকাই মিস্ত্রিরা বজরা তৈরি করতে ওস্তাদ ছিল— সেইজন্য সেখান থেকেই বজরা তৈরি করানো রীতি ছিল। জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি চলত, কার কখানা সুন্দর বজরা আছে।
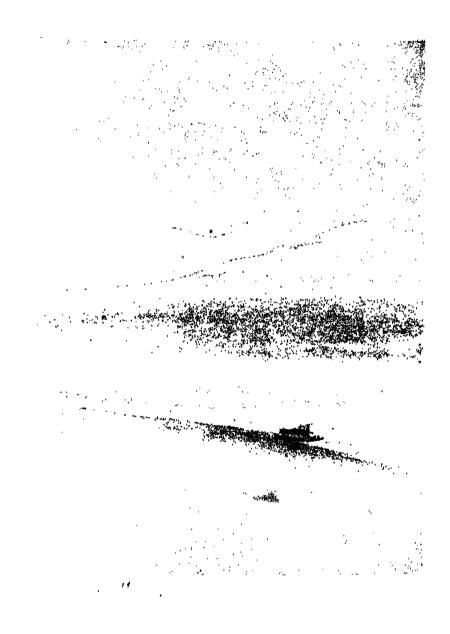
শুনেছি দিঘাপতিয়ার রাজার নাকি মার্বেল পাথরের মেঝে দেওয়া একটি প্রকাণ্ড বজরা ছিল সে আমলে। কলকাতার বড়োলোকদের মধ্যে আবার এইরকম রেষারেষি ছিল গাড়িঘোড়া নিয়ে। রেল হয়ে জলপথের ব্যবহার কমে গিয়ে নৌকার প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। আজকাল খুঁজে-পেতেও নদীতে একটা বজরা দেখতে পাওয়া যায় না।

পদ্মাবোটে বাবা থাকতে খুব ভালোবাসতেন। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন তাঁর প্রিয় পদ্মাবোটে। বাড়িতে বাস করার চেয়ে বোটে থাকতে তাঁর বেশি ভালো লাগত, তার কারণ সম্ভবত বোটে তিনি নির্জনতা পেতেন, ভাবতে এবং লিখতে এমন সুযোগ আর কোথাও পেতেন না। তা ছাড়া ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারতেন। পরিবেশের অহরহ পরিবর্তন তাঁর কল্পনা-প্রিয় মনকে খোরাক জোগাত। সম্পূর্ণ নির্জনতা যখন চাইতেন, শিলাইদহের কর্মচারীদের আদেশ দিতেন কেউ যেন তাঁর কাছে না আসে।

বোট নিয়ে অনেক সময় নিরুদ্দেশভাবে চলে যেতেন এমন নিভৃতে যেখানে কেউ আর সহজে কাছে পৌঁছতে না পারে। নিঃসঙ্গ নির্জনবাস তাঁর পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল।

খরস্রোতা পদ্মানদী একদিকে, অন্য দিকে সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালুরাশি, নদীর সীমানা ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে বনরাজিনীলা একেবারে পৃথিবীর বুকের উপর নত হয়ে এসেছে। একমাত্র সঙ্গী জলচর পাখির কলধ্বনি। অপরূপ শান্ত নিভৃত পরিবেশ।

পদ্মাবোটের দান রবীন্দ্রসাহিত্যে কম নয়, এ কথা তাঁর সাহিত্য-অনুরাগীরা মানবেন নিশ্চয়ই।

জীবনের প্রথমাংশ বাবা শিলাইদহের নির্জনতায় কাটিয়েছিলেন, তার পর শেষাংশে তাঁকে থাকতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে জনতার মধ্যে। শিলাইদহের শ্যামলতা ও শান্তিনিকেতনের ধূসরতা এই দুই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। শিলাইদহের পদ্মা, তার দিগন্তপ্রসারিত বালুচর, লীলাময়ী প্রকৃতির চিরনবীনতা —এরই মাঝখানটিতে কবি তাঁর সাধনার ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। অন্য দিকে কর্মজীবনের ক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতন ও কলকাতার লোকসমাজের মধ্যে। কিন্তু শেষবয়সে তাঁর মন কি টানত না সেই বাংলার অন্তঃপুরে, যেখানে 'মেঘস্তূপের নীচে পদ্মাতটের নীলবনরেখা দেখা যায়', যেখানে 'অর্ধনিমগ্ন

জনশূন্য বালুচর', দু-ধারে 'জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের খেত', 'প্রকৃতি যেখানে আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে যায়' ?

মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা আমাকে খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গে বোটে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সেইজন্য তিনি বোটে কিভাবে থাকতেন, সেখানে তাঁর সময় কী করে কাটত, আমার কিছুটা জানা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বোটে বেড়াতে বেড়াতে কয়েকবার বিপদের মধ্যেও পড়তে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ভারি একটা মজার ঘটনা মনে এল। প্রথম যেবার বোটে বাবার সঙ্গে ছিলুম, সেইবারই অথবা তার পরে সঠিক আমার মনে নেই। ঘটনাটি এই—

দিনের শেষে সন্ধ্যার মুখে বাবা ও আমি বোটের ডেকে দুটি আরাম-চেয়ারে বসে আছি। বাবার চেয়ার ডেকের ধারে ঘেঁসে জলের খুব কাছাকাছি পাতা। উনি যেমন চুপ করে বসে থাকলে পা নাচান তেমনি ধীরে ধীরে পা দুলিয়ে চলেছেন।

পদ্মার জলে সোনাগলা রঙ ঢেলে সূর্য অস্ত' গেছে— চার দিক নিস্তব্ধ সুন্দর।

জলে একটা ছোট্ট কিছু ফেলে দিলে যেমন শব্দ হয়, হঠাৎ তেমনি একটা শব্দ শুনতে পেলুম। বাবার দিকে চেয়ে দেখি ওঁর পা থেকে বহুপুরাতন অতিপ্রিয় কটকি চটির একটা পাটি জলে পড়ে গেছে। ঝপাং করে জলে আর-একটা শব্দ হল, চেয়ে দেখি, বাবা ডেকে নেই, জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন চটিটাকে তুলে আনতে। স্রোতের টানে চটি অনেকদূরে ভেসে গেছে— বাবা সাঁতার কেটে তাকে ধরবার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ বাদে জল থেকে উঠে এলেন— মুখে তৃপ্তির হাসি, হাতে চটির সেই পাটিটি। ডেকের উপর চটিটা রেখে বোটের ভিতরে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন।

ছেলেবেলার কথা মনে এলে এই ঘটনাটি মনে আসে। আর মনে আসে বাবার আত্মভোলা ভাব।

প্রথম যেবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেবার কুষ্টিয়ার নীচে গোরাই নদীতে বোটে গিয়ে উঠলুম। স্টেশনে নামতেই বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন একজন ইংরেজ। তাঁর একটি পা ছিল না। তিনিই স্টেশনমাস্টার, পরে

জানলুম। বহুকাল ধরে কুষ্টিয়া স্টেশনে তিনি ছিলেন— অতিশয় ভদ্র বলে সকলে তাঁকে খাতির করত। তাঁর একপায়ে হাঁটা দেখে ছেলেবেলায় আমার খুব ভয় করত মনে আছে।

কুষ্টিয়া শহরটি নদীর উঁচু পাড়ের উপর যেন ঝুলে আছে মনে হত। তীরবর্তী বাড়িগুলির অধিকাংশেরই ভগ্নাবস্থা। সারি সারি যেন কতকগুলি বাড়ির কঙ্কাল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু বসতবাড়ির এত মায়া, লোকে তারই মধ্যে মাথা গুঁজে বসবাস করছে।

স্টেশনকে রক্ষা করার জন্য নদীর পাড়ে ইঁট ফেলা— তার ভিতর দিয়ে সাবধানে চলে বোটে গিয়ে উঠতে হল। সবই আমার কাছে নতুন, নৌকায় কখনো চড়ি নি, ভয়ে ভয়ে বোটে পা দিলুম। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে ভয় ঘুচে গেল, এ যেন বাড়ির মতো মনে হল। রান্না তৈরি ছিল— ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল। খাওয়া হয়ে গেলে, বাবা তখনি লিখতে বসে গেলেন। আমি পাশের কামরায় বসে জানলা দিয়ে সকৌতুকে নদীতে নৌকা-চলাচল ও ঘাটে জনতার দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

বাবা এসেছিলেন 'ঠাকুর কোম্পানি'র কাজ দেখতে। কাজকর্ম দেখতে বাবার বেশি সময় লাগত না। বোটে ফিরে এসেই আবার লেখা নিয়ে পড়তেন।

সমস্ত দিন লেখবার পর, সন্ধে হতে বোটের ডেকে আরাম-চেয়ারে গিয়ে বসতেন। আমার সঙ্গে কী কথা বলতেন কী গল্প করতেন আমার মনে নেই। বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে নদীর দৃশ্য দেখতুম।

সূর্যাস্তে রঙিন আভা তখন পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ছিপছিপে জেলে-ডিঙিগুলি জাল নামিয়ে দিয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে, যেন তাদের কোনো কাজ নেই, কোনো তাড়া নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা ডিঙিতে জেলেরা ঝপাঝপ দাঁড় ফেলে উজিয়ে চলে যায়— দাঁড়ের তালে তালে ভাটিয়ালি গান গাইতে গাইতে।

ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, দূর থেকে দূরান্তরে ভাটিয়ালির সুর মিলিয়ে যায়। আকাশের গায়ে একটি-দুটি করে তারা জ্বলে ওঠে, যেন কেউ একে একে দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ওপারের মন্দির থেকে কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি জলের উপর দিয়ে ভেসে এপারে এসে লাগে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে আদ্যিকালের বুড়ো ফটিক খানসামা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, তার পাকা দাড়ি দুলিয়ে জানিয়ে দেয়— 'হুজুর, খাবার দিয়েছি টেবিলে।' কোনোরকমে ওর একঘেয়ে রান্না খেয়ে আমি শুতে যাই— বাবা আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন তাঁর বই ও লেখার খাতা নিয়ে।

একরাশ বই তাঁর নিত্যসহচর— যেখানেই যেতেন একটি ছোটোখাটো লাইব্রেরি সঙ্গে যেত। তার মধ্যে থাকত গ্যেটে, টুর্গেনিভ, বালজাক, মোপাসাঁ, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য, অমরকোষ ও কয়েকখানা সংস্কৃত বই। সাহিত্য ছাড়াও তিনি ভালোবাসতেন পড়তে জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি দুর্বোধ্য বিষয়ের মোটা মোটা বই।

বাবার যৌবনকালের সঙ্গে পদ্মাবোটের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই সময়কার অধিকাংশ কবিতা গল্প প্রবন্ধ এই বোটের ক্যাবিনে বসে লেখা। লোকজনের সংস্রব, সংসারের জটিলতা যখনই পীড়া দিয়েছে, তিনি পরম শান্তি পেয়েছেন পদ্মানদী ও পদ্মাবোটের নিরালায় এসে। এই বোটে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্যজীবনের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। পদ্মাবোট তাঁকে যেমন আরাম দিয়েছে, তিনিও তেমনি এই বোটকে ভালোবেসে তাঁর সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দিয়ে গেছেন।

তাঁর লেখার মধ্যে পাই 'এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা— এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই।··· যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি। ··· বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা— আমার যথার্থ বাহন। ···মনে হয়···যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই।'

বলুদাদার মৃত্যু মাকে খুব আঘাত দিয়েছিল। তার পর তিনি আর শিলাইদহে থাকতে চাইলেন না। শিলাইদহে দু-তিন বছর শিক্ষানবিশির পর আমাদের কলকাতায় চলে আসতে হল। তা ছাড়া দিদির বিয়ে দেবার জন্য মা ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। প্রিয়নাথ সেন, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎবাবুর সঙ্গে দিদির বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করেলেন। বিয়ে হয়ে গেল। শরৎবাবু তখন মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। স্বামীর সঙ্গে দিদি সেখানে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাবা দিদিকেই সবচেয়ে বেশি ভালো-বাসতেন— তাই দিদি চলে যাবার পর বাবা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আরও একটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা রয়েছে— মা তাঁকে সে কথা ভুলতে দিলেন না। কয়েক মাস পরেই ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার ছোটোবোন রানীর বিয়ে হয়ে গেল। সত্যেনবাবু পরে ডাক্তারি ত্যাগ করে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পর পর দুই বোনের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের অনেক দিন কলকাতায় থাকতে হয়েছিল বাবার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

শিলাইদহে থাকার সময় থেকেই বাবার মাথায় ঘুরছিল একটি আদর্শ বিদ্যালয় কোথাও প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের ভাইবোনদের পড়াতে গিয়ে, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন কি করে করা যায় সে বিষয়ে তাঁর মনে নানারকম কল্পনা ঘোরাফেরা করত। এগুলিকে আকার দিতে গেলে একটি বিদ্যালয় চাই। তিনি স্থির করলেন, তিনি যেরকম বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চান তার পক্ষে শান্তিনিকেতন উপযোগী স্থান। কলকাতায় এসে মহর্ষিদেবকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। মহর্ষি শুনে খুশি হলেন, বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতন আশ্রমেরই অঙ্গ হবার অনুমতি দিলেন। বিদ্যালয়টি খোলবার ব্যবস্থার জন্য আমাদের সকলকে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাবার উপক্রম করছেন এমন সময় একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হল। নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ— আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে

দলে হিমালয়ের পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষত তীর্থগুলি দেখে আসে। নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না; যখন যা মনে আসত তখন তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। বেলুড়-মঠের কয়েক-জন স্বামীজিকে ধরলেন হিমালয়-ভ্রমণের দল জোগাড় করতে। বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম দলটিকে নিয়ে সদানন্দস্বামী কেদার-বদরী রওনা হবেন, তখনি তাঁর ইচ্ছা হল আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আমাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, স্বামীজির সঙ্গে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করে এলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোর জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। গেরুয়া বসন, ঘাড়ে কম্বল, পায়ে ভারী মিলিটারি বুটজুতো— এই অদ্ভুত বেশে আমরা ট্রেনে চাপলুম ও দু-দিন বাদে কাঠগুদামে নামলুম। হরিদ্বারের পথ দিয়েই তীর্থযাত্রীরা সাধারণত কেদারনাথে যায়, কিন্তু সেই রাস্তায় খুব ভিড় হয় বলে স্বামীজি আলমোড়ার পথ দিয়ে যাবেন স্থির করেছিলেন।

আমাদের দলে পনেরো-ষোলোজন ছিলেন। স্বামীজি বাদে সকলেই তাঁরা অল্পবয়স্ক। দলের মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ। এতগুলি অপরিচিতের মধ্যে আমার প্রথমটা খুব অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বিশেষ করে কয়েকটি কলকাতার ব্যবসায়ী-ঘরের ছেলে ছিল যাদের কথাবার্তা একটুও মার্জিত নয়, এদের আমার ভালো লাগত না। সদানন্দস্বামী আমার মনোভাব সম্ভবত বুঝেছিলেন, তিনি তাই আমাকে তাঁর খুব কাছাকাছি টেনে নিলেন। এঁর অন্তরে যে এত স্নেহ বাইরে থেকে বোঝা যেত না। আমি এঁর ভক্ত হয়ে পড়লুম। একটি বালক-ভক্ত পেয়ে তিনিও খুশি হলেন। সহযাত্রীদের সঙ্গে ক্রমে আলাপ জমে উঠল। এঁদের মধ্যে অমূল্য মহারাজকে আমার খুব ভালো লাগত। আমার সঙ্গে খুব গল্প করতেন, স্নেহও করতেন খুব। এই অমূল্য মহারাজ পরে হন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শংকরানন্দ। মঠের আরো দু-একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে মহেন্দ্রবাবুর ছেলেকে মনে পড়ে।

কাঠগুদামে সকালবেলায় ট্রেন থেকে নেমেই হাঁটতে শুরু করা গেল। স্বামীজি বললেন, যেরকম করেই হোক সন্ধ্যার পূর্বে নৈনিতাল পৌঁছতেই হবে। পাহাড়ে ওঠা কারো অভ্যাস নেই, সেই ক-মাইল খাড়া চড়াই ভেঙে উঠতে সকলের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। চার দিকে পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য,

কিন্তু তা উপভোগ করার মতো কারো মনের অবস্থা তখন ছিল না। শরীর মন তখন চাইছে কখন নৈনিতালে পৌঁছে বিশ্রাম পাওয়া যাবে। বেলাশেষে সেখানে পৌঁছে হ্রদের ধারে স্বামীজির পরিচিত এক কুমায়ুনি ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা অতিথি হলুম। প্রচুর আতিথ্য ও পূর্ণ বিশ্রামে রাত্রি প্রভাত হল।

সকালবেলায় স্বামীজি আমাদের বললেন, 'তোমাদের পাহাড়ে চড়া অভ্যাস নেই— প্রথমদিকে পাঁচ-ছ মাইলের বেশি আর হাঁটাব না। অভ্যাস হলে ক্রমশ বেশি হাঁটাব। নৈনিতালে চড়াই ইউক্লিডের তৃতীয় সিদ্ধান্ত, তোমরা পাস করে গেছ, এখন আর ভয় নেই।'

কিন্তু কলকাতার শৌখিন কয়েকটি ছেলে তাতে আশ্বস্ত হল না, তারা দল বেঁধে সেইদিনই বাড়ি ফিরে গেল।

আমরা সকলেই তাতে খুশি হলুম, যদিচ আমাদের দলে তখন রইল মাত্র সাত-আটজন।

নৈনিতাল ছেড়ে ভওয়ালি নামতে কোনো কষ্ট হল না— কাছেই সোহহং স্বামী আশ্রম করেছেন, সেখানে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁকে দেখে মনে হল না এই শান্তপ্রকৃতির মানুষই সেই শ্যামাকান্ত— যিনি নির্ভয়ে বাঘের খাঁচায় নিরস্ত্র প্রবেশ করতেন, যাঁকে দেখে বাঘও ভয় পেত। বাংলাদেশে ইনি তো আমাদের সকলের আদর্শ ছিলেন— তাঁকে সন্ন্যাসীবেশে দেখে ভারি অদ্ভুত লাগল।

আহারাদির পর আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাঘের দু-একটা গল্প শোনালেন। তাঁর অভিজ্ঞতার সার কথা যা বুঝলুম— বাঘকে মানুষ যদি ভয় না করে, তা হলে বাঘই মানুষকে দেখে ভয় পায়। মনের এক কোনাতে যদি ভয় থাকে বাঘ তা ঠিক জানতে পারে।

আমরা যখন তাঁর আশ্রম ছেড়ে রামগড় যাবার রাস্তা ধরে চড়াই উঠতে লাগলুম সোহহং স্বামীজি আমাদের সঙ্গে অল্প খানিকটা গিয়ে বললেন, 'আমি কি আর এখন পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে পারি? এখান থেকেই বিদায় নিই।' ওঁর এই কথায় আচমকা মনের মধ্যে ধাক্কা লাগল— আমাদের বাংলাদেশের 'হিরো' অনেকখানি নেমে গিয়ে সুদূর নৈনিতালের অরণ্যপথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন।

রামগড়ে একটি মুসলমানের হোটেলে গিয়ে উঠলুম। ইনিও সদানন্দ স্বামীজির ভক্ত— আমাদের তাঁর অতিথি করে রেখে গুরুকে সম্মান দেখালেন। হোটেলের সংলগ্ন মস্তবড়ো ফলের বাগান। দুদিন ধরে বাগানের নানারকম বিলাতি ফল ও জ্যাম জেলি খাওয়া গেল। রামগড় এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়— চারি দিকে প্রচুর গাছপালা— মুগ্ধ করেছিল সেখানকার লতানো জংলি গোলাপ। ফুলগুলি শাদা রঙের, ছোটো ছোটো, একহারা পাপড়ি, কিন্তু অপূর্ব তার গন্ধ। একটি মাত্র গাছ কোথাও থাকলে, মাইলখানেক দূর থেকে ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যায়। অল্পবয়সে দেখা, তবু রামগড়ের সৌন্দর্যের স্মৃতি মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

বহু বছর পরে যখন সেখানকার একটি বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন খবরকাগজে দেখতে পেলুম, দ্বিধা না করে বাড়িটি কিনে নিলুম। যথাসময়ে আবার রামগড়ের কথা বলা যাবে।

রামগড় ছেড়ে দুদিনে বাইশ মাইল হেঁটে আলমোড়ায় পৌঁছানো গেল। আলমোড়ার শেষ চড়াইটুকু আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছিল মনে পড়ে। পাঁচ মাইল খাড়া চড়াই, সমানে উঠতে হয়। দুপুরে প্রচণ্ড রোদ, কোথাও একফোঁটা জল নেই। পাহাড়ে যে এত গরম হতে পারে সেই প্রথম অনুভব করলুম। আমাদের দুরবস্থা দেখে অমূল্য মহারাজ একটি গাছের ছায়ায় আমাদের বসিয়ে রেখে নিজে জল আনতে চলে গেলেন আলমোড়ায়। তিনি সেখান থেকে জল নিয়ে এসে আমাদের সেদিনের তৃষ্ণা নিবারণ না করলে আমরা কেউই আলমোড়ায় পৌঁছতে পারতুম না। কারো আর এক পা চলারও ক্ষমতা ছিল না, শরীর এতই ক্লান্ত।

আলমোড়াতেও স্বামীজির ভক্ত এক কুমায়ুনি ধনী পরিবার আমাদের আতিথ্যের ভার নিলেন। নামে যদিও সাহা, এঁরা কিন্তু ব্রাহ্মণ। কুমায়ুনে সকলেই ব্রাহ্মণ। আলমোড়া থেকে আমরা যে দশজন কুলি নিয়েছিলুম, দেখলুম তারা সকলেই পৈতাধারী ব্রাহ্মণ। আলমোড়াতে সাহা-পরিবারের খুবই সম্মান। এঁদের সঙ্গে অল্প কদিনের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। এঁদের আচারের মধ্যে লক্ষ্য করলুম, যদিও শীতপ্রধান দেশ বলে পায়জামা ও কোট সর্বদা পরে থাকতে হয় কিন্তু আহারে বসবার সময় সকলে ধুতি পরে আসনে খেতে বসেন।

নৈনিতাল ঘুরে আলমোড়া হেঁটে যেতে পাহাড় ওঠা-নামা আমাদের বেশ অভ্যাস হয়ে গেল। এইবার রীতিমতো তীর্থভ্রমণের আয়োজন স্বামীজি করতে লাগলেন। একটা ঘোড়া ও দশজন কুলি একমাসের জন্য নিযুক্ত করা গেল। একটা হালকা-রকমের তাবু আর কিছু রসদও সংগ্রহ করা হল। রাস্তায় যে সব চটি আছে যদিও সেখানে আশ্রয় মেলে, কিন্তু সেগুলি এত অপরিচ্ছন্ন যে, স্বামীজি সেখানে থাকা পছন্দ করতেন না। চটি থেকে একটু দূরে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

প্রথমে কেদারনাথ যাওয়া ঠিক হল। হিমালয়ের কত দুর্গম গিরিশৃঙ্গ, কত আখরোট খোবানি ডালিম -সমাকীর্ণ সমতল উপত্যকা, কত হেসে-খেলে বেঁকে-চুরে চলা ঝরনা পেরিয়ে আমরা সেই পথে চলতে থাকলুম। হিমালয়ের বিচিত্র সৌন্দর্য চোখের উপর ছবির ছাপ রেখে দিয়ে যেতে লাগল। দু-চোখ ডুবিয়ে দিয়ে এই শোভাসমুদ্রে প্রতিনিয়ত স্নান করে উঠছি, মন একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু কষ্টেরও যে অবধি নেই, লোহার-ফলা-লাগানো পাহাড়ি লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘর্মাক্ত দেহে এক-পা এক-পা করে পাহাড় ভেঙে চলেছি। রাস্তা আর ফুরোয় না। নামেই রাস্তা, বড়ো বড়ো পাথর ডিঙিয়ে যেতে হয়। জল পড়ে কোথাও ভেঙে গেছে, দু-চারখানা কাঠ ফেলা আছে, তারই উপর দিয়ে সন্তর্পণে ভাঙা জায়গাগুলি পার হতে হয়— পা পিছলে পড়লে একেবারে দু-এক হাজার ফুট নীচে নদীগর্ভে পড়তে হবে।

কদিন পরে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছনো গেল। এখানে মিলেছে স্বচ্ছতোয়া তন্বী মন্দাকিনী আর উদ্দাম আবিল অলকানন্দা। একটি কেদারনাথ থেকে নেমে এসেছে— অন্যটি বদরীনাথ থেকে। সংগমস্থলটির দৃশ্য অপূর্ব— দুর্গম পর্বত-শ্রেণীর অন্ধকার গর্ভের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মন্দাকিনী অলকানন্দাকে হঠাৎ দেখে যেন ভীত সন্ত্রস্ত। তার স্ফটিকসম নির্মল জল— যেন অলকানন্দার কর্দমময় জলের সঙ্গে মিশতে নিতান্ত আপত্তি। সংগমের অনেকদূর পর্যন্ত দুই জলধারা চলেছে নিজেদের বর্ণস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে ভিড়ে পড়তে হল। দলে দলে তারা চলেছে— তাদের কী নিষ্ঠা, কী ব্যাকুল আগ্রহ! কেউ-বা পাঞ্জাব-রাজস্থানের মরুভূমির ধুলোর দেশ থেকে এসেছে, কেউ-বা মালাবারের নারকেল-উদ্যান থেকে এসেছে, আর কেউ-বা এসেছে বাংলার সবুজ শ্যামল ধানখেতের দেশ

থেকে। দলে দলে তারা চলেছে। তার মধ্যে কেউ-বা নিতান্ত বালক, কেউ -বা সদ্য-বিবাহিত দম্পতি, সংসারত্যাগী বৃদ্ধ, কত-না জীর্ণ শীর্ণ বিধবা মহিলা, ছোটো বড়ো বুড়ো হরেক রকম চলেছে সেই দূরদুর্গম রাস্তা ধরে।

কত রঙের, কত রকমের তাদের বেশভূষা! রাজপুতের রঙিন ঘাগরা, পাঞ্জাবিদের মস্ত ফোলানো পাগড়ি, সাধুদের ছাইমাখা নগ্নদেহের উপর সামান্য একটুখানি পীতবাস, তারই মধ্যে বাঙালি মেয়েদের কোনোমতে জড়ানো একখানা শাদা শাড়ি। বিচিত্র দেশের বিচিত্র বেশে এই নরনারীর দল চলেছে হিমালয় পর্বত ডিঙিয়ে কেদার-দর্শনে। সকলেরই মুখে হাসি। নদীর দু-ধারে রম্য উপত্যকা পার হয়ে রাস্তা ক্রমশ উঠতে লাগল বনাকীর্ণ পাহাড় ভেদ করে। মন্দাকিনীর দুই তীর থেকেই প্রাচীরের মতো খাড়া উঠেছে গিরিমালা— তার গায়ে এখন অন্য গাছ আর দেখা যায় না, ঘন হয়ে ছেয়ে আছে কেবল রডোডেনড্রন আর দেবদারু। ঘুরে ঘুরে সরু রাস্তা কেবল উঠেই চলেছে। মন্দাকিনী তখন ঝকঝক করছে বহু নীচে, সরু একটি রজত রেখার মতো। পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে জলস্রোতের শব্দ ক্ষীণভাবে কানে আসছে —মনে হয় যেন পাহাড়ের পায়ে রুপোর কয়েকগাছা মল পরানো রয়েছে, আর তারই রিনিরিনি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আরো উপরে চলেছে যাত্রীদল। পথ আরো দুর্গম হয়ে আসে, বনের অন্ধকার আরো নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসে, শীতে কাঁপুনি ধরে।

পাহাড় ডিঙিয়ে আবার নদীর ধারে নেমে এসেছে সকলে। সন্ধ্যা হল। গাছতলায় মেয়েরা কাঠের আগুন ঘিরে বসে চাপাটি রুটি গড়ে। হাতের তালে তালে গান ধরে—

কেদারনাথ কি চরণ-কমলে
প্রাণ হামারি আটকে

তার পরদিন ভোর না হতেই তল্পিতল্পা নিয়ে আবার আর-এক পাহাড়ে উঠতে চলেছে যাত্রীরা। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে দু-হাত চওড়া একটুখানি পথ। পাথরের খোঁচায় পা ক্ষতবিক্ষত হয়, চলতে হাঁপ ধরে, ঘন ঘন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মুখে কথা নেই, জিভ শুকিয়ে কাঠ, তবু চলছে সার বেঁধে যাত্রীর মিছিল।

পিছনে একটি কাতর শব্দে চমকে উঠলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, একটি ক্লান্ত ক্লিষ্ট অতিবৃদ্ধ পথের ধারে বসে পায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পায়ে কাপড় জড়িয়ে কোনোরকমে এতদূর সে হেঁটে এসেছে, আর পারছে না। ঝরঝর করে পা বেয়ে রক্ত পড়ছে। তার কাছে ছেঁড়া কাপড় আর নেই। ওর দিকে করুণাদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে সে বলে উঠল, 'বাবুজি, আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাইবেন না! দুঃখকষ্ট তো আছেই, তাই বলে আমাকে কিছুই বাধা দিতে পারবে না। কেদারনাথজি আমাকে ডাকছেন, আমাকে কে বাধা দেবে, ঠেকিয়ে রাখবে কে? বলো ভাই— "জয় কেদারনাথ কি জয়!" '

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

বাবা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯০১ সালে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেও অনেকবার সেখানে গিয়েছি। একবারের কথা ভালো করেই মনে আছে। আমার বয়স তখন ন-বছর।

বলুদাদা সেই সময় ভাবছিলেন কি করে বাংলার ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা, বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজ ও পাঞ্জাবের আর্যসমাজ প্রভৃতির মিলন ঘটিয়ে একটি ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ গড়ে তোলা যায়। মহর্ষিকে এই বিষয়ে জানালে তিনি পরামর্শ দেন, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করতে হবে। স্থির হল আমার উপনয়ন উপলক্ষ করে সেখানে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে। মহর্ষির কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে বলুদাদা চলে গেলেন লাহোর বোম্বাই কাশী প্রভৃতি শহরে, একেশ্বরবাদী-সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে।

ইতিমধ্যে আমাকে উপনয়নের জন্য প্রস্তুত হতে হল। শিবধন বিদ্যার্ণব পণ্ডিতমহাশয়কে ডেকে মহর্ষি আদেশ দিলেন আমাকে উপনিষদের মন্ত্র শেখাতে। ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্রগুলি আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে, যাতে নিমন্ত্রিত বিদেশী পণ্ডিতদের সামনে বিশুদ্ধ উচ্চারণে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতে পারি। শুনে ছাত্র ও অধ্যাপক, দুজনেরই মাথায় বজ্রাঘাত! সময় খুব কম, উঠে-পড়ে লাগতে হল বৈদিক সংস্কৃত পড়তে।

তার পর একদিন শিক্ষার শেষে দুরুদুরু বুকে যেতে হল মহর্ষির কাছে পরীক্ষা দিতে। আবৃত্তি শুনে মহর্ষি খুশি হলেন। এই কঠিন পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হলুম, কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল পারিতোষিক হিসাবে একটা মোটা দক্ষিণা পেলেন কেবল পণ্ডিতমহাশয়।

শান্তিনিকেতনে ধুম পড়ে গেল। নানা দেশ থেকে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সমবেত হলেন। তাঁদের আতিথ্যের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হল প্রচুর পরিমাণে মাখন মিছরি পেস্তা বাদাম, আরো কত কি!

যথাসময়ে মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী হয়ে দেশবিদেশ থেকে সমবেত সুধী-মণ্ডলীর সমক্ষে আমার উপনয়ন-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হল। উপনয়নের

পরেই শিলাইদহ গিয়েছিলুম। যখন তিন বছর পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম তখন বাবা সেখানে ইস্কুল খোলবার আয়োজন করছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য শিলাইদহ থেকে জগদানন্দ রায় ও সেখানকার একজন হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তারি করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, ডাক্তারবাবুকে লাগিয়ে দিলেন ঘরবাড়ি তৈরি করা ও দেখা-শুনার কাজে।

বাগানের এককোণে ছোটো একটা একতলা বাড়ি ছিল, ইস্কুলের ব্যবহারের জন্য এই একটিমাত্র পাকাবাড়ি বাবা পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকে। বাবা তাঁর নিজের যত বইয়ের সংগ্রহ ছিল, কলকাতা থেকে সব আনিয়ে নিলেন এবং তাই দিয়ে ঐ বাড়ির মাঝের বড়ো ঘরটায় লাইব্রেরি স্থাপন করলেন। বাবার বই নিতান্ত কম ছিল না, সাহিত্য ছাড়াও বিজ্ঞান ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় বাছা বাছা প্রচুর বই ছিল। সেইজন্য গোড়া থেকেই বেশ উঁচুদরের ভালো একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ছাত্র নেই, ছাত্রাবাস নেই— বিদ্যালয়ের ভিতপত্তন হল এই লাইব্রেরি দিয়ে। এর পর ডাক্তারবাবুকে লাগিয়ে দিলেন একটি ছাত্রাবাস ও একটি রান্নাঘর তৈরি করতে। ছাত্রাবাসটি হল লাইব্রেরির পাশে— মাটির দেওয়ালের উপর লম্বা একটি চালাঘর, খড়ের বদলে টালির ছাউনি। এই ঘরের কিছুটা অংশ এখনো বর্তমান, আদিকুটির বা প্রাক্‌কুটির নামে পরিচিত। আমাদের সময় বাড়িটার কোনো নাম ছিল বলে মনে পড়ে না।

ছাত্র জোটানো বাবার এক সমস্যা হল। নূতন ধরনের এরকম অখ্যাত ইস্কুলে কে ছেলে পাঠাবে? বিশেষত, বোর্ডিং-স্কুলে ছেলে পাঠানো দেশের লোকেদের তখনো অভ্যাস হয় নি। বাবা কলকাতায় গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়কে ছাত্র সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জানালেন। তিনি তাঁর পরিচিত পরিবার থেকে চারটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। এইটুকু শুধু মনে পড়ে, তাদের মধ্যে দুজন কলকাতার ব্যবসায়ী নান-পরিবারের ছেলে। আমাকে ধরলে পাঁচজন হয়। এই পাঁচজন ছাত্র নিয়েই বিদ্যালয় আরম্ভ হল শতাব্দীর প্রথম বছরে।

ব্রহ্মবান্ধব আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন, অল্পবয়সের মধ্যেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা

তাঁর জীবনে ঘটেছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই কেশব সেনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নববিধান সমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে তার পর সিন্ধুদেশে যান। সেখানে রেবাচাঁদ নামে একটি সিন্ধি যুবক তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়। শিষ্যকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি রোমান-ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, কার্ডিনাল নিউম্যান-এর বই পড়ে তাঁর মত পরিবর্তন হয়। এই সময় 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' নাম নিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন নাম পরিবর্তন করলেন, সংসারী বেশভূষা ত্যাগ করে গৈরিক বসন পরতে আরম্ভ করলেন। যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখনো তিনি খ্রীস্টান ধর্ম বাহ্যত ত্যাগ করেন নি, কিন্তু সনাতনী হিন্দুধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর জন্মেছে। শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে গুরুকুল গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তিনি খুব উৎসাহ বোধ করলেন। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। একাধারে হিন্দুধর্মে নিষ্ঠা ও প্রকট ধরনের স্বাদেশিকতা তাঁর মধ্যে দেখা দিল। বাবার সঙ্গে ক্রমশ মতবিরোধ বাধতে লাগল। ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে 'সন্ধ্যা' কাগজ প্রকাশ করলেন। তিনি ক্যাথলিক থাকতে *Sophia* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাতে তিনি ইংরেজিতে যা লিখতেন তার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও পরিমার্জিত, তেমনি সংযত ও যুক্তিসিদ্ধ। 'সন্ধ্যা' কাগজের ভাষা একেবারে বিপরীত— অসংযত, উত্তেজক, তীব্র, ধারালো রকমের বাংলা-ভাষার এক অভিনব রূপ দিলেন। *Sophia*-র ব্রহ্মবান্ধবই যে 'সন্ধ্যা'র লেখক, বাহ্যত আত্মবিরোধী মনে হয়, কিন্তু তিনি বহুমুখী প্রতিভা -সম্পন্ন ছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় কোনো একটি ধর্মবিশ্বাসে বেশিদিন তিনি আস্থা রাখতে পারতেন না।

একদিন একটি পাঞ্জাবি পালোয়ান কি করে হঠাৎ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হল। কুস্তি শেখবার জন্য আমরা একটি আখড়া তৈরি করেছিলুম। সেই দেখে পালোয়ানটির মহা উৎসাহ, পোশাক ছেড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগল। তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, কারও সাহসে কুলোল না তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যায়।

সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি উপাধ্যায় মহাশয় কৌপীন পরে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তাল-ঠুকে পালোয়ানকে লড়াই করতে আহ্বান করলেন। বাঙালি সন্ন্যাসীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবি পালোয়ানকে হার মানতে হল। আমাদের তখন কী আনন্দ!

কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন অধ্যাপক এসে গেলেন। উপাধ্যায় মহাশয় রেবার্চাদ নামে একজন সিন্ধি ভদ্রলোককে ইংরেজি পড়াবার জন্য পাঠালেন। বাবা তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের খুড়তুতো ভাই সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে বাংলা পড়াবার জন্য আনলেন। জমিদারির কাজ ছাড়িয়ে হরিচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়কে পতিসর থেকে নিয়ে এলেন, সংস্কৃত অধ্যাপক করে। দ্বিতীয় বছরে আরো বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র ভর্তি হল। সেইসঙ্গে নূতন অধ্যাপকও ক-জন এলেন।

তৃতীয় বৎসরে এলেন সতীশচন্দ্র রায়। তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীর বন্ধু ছিলেন, তাঁর সঙ্গী হয়ে বাবার কাছে এসেছিলেন। তাঁর কথাবার্তা শুনে ও তাঁর কয়েকটা কবিতা পড়ে বাবা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথা বাবার কাছে শুনে তিনি কলেজের পড়া শেষ না করেই, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন; সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে অজিতকুমারও শান্তিনিকেতনে যোগ দেন।

বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বড়ো ছেলে সন্তোষ আমার সহপাঠী হয়ে ভর্তি হল। তখন আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছি। এতদিন হেডমাস্টার কেউ ছিলেন না; রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাইপো মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হলেন হেডমাস্টারের পদে। তার পর কাশী থেকে এলেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য।

ছাত্রসংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল আশ্রমের তত্ত্বাবধানের কাজও বেড়ে গেল। অথচ তার জন্য ভিন্ন কোনো লোক ছিলেন না, হেডমাস্টার-মহাশয়কেই সবরকম কাজ করতে হত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক জামাতা কুঞ্জলাল ঘোষ এলেন ম্যানেজার হয়ে। পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আনিয়ে নিলেন ভূপেন্দ্র সান্যাল মহাশয়কে। পরে এক সময় অবনদাদা পাঠালেন আর্ট স্কুল থেকে সন্তোষ মিত্রকে ড্রয়িং শেখাতে। দেখতে

দেখতে মাস্টারমহাশয়দের দিয়েই আশ্রম ভরে গেল।

মনে হতে পারে, মুষ্টিমেয় ছাত্রদের জন্য এতগুলি অধ্যাপকের কী প্রয়োজন ছিল? কিন্তু বাবা মনে করতেন ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা বেশি হলে ঠিকমতো পড়ানো যায় না, অধ্যাপকদেরও ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না। তিনি আশা করতেন ক্লাসেতে এমন পড়ানো হবে যাতে কোনো ছাত্রকে আর ঘরে গিয়ে পড়া না করতে হয়। যতদিন বাবা নিজে বিদ্যালয় পরিচালনা করেছিলেন, কোনো ক্লাসে আট-দশজনের বেশি ছাত্র নিতে দিতেন না। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতো গুণীকে ইস্কুলমাস্টার করে নিয়ে এলেন কেন, সে প্রশ্নও উঠতে পারে। বাবার মতে সবচেয়ে কঠিন শিশুদেরই শিক্ষা দেওয়া। যথেষ্ট উপযুক্ত লোকের হাতে তাদের মানুষ করা উচিত। সেইজন্য সর্বদাই তিনি ভালো লোকের সন্ধান করতেন এবং যাঁদের নিযুক্ত করতেন তাঁদের ওঁর আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষক তৈরি করে তোলবার চেষ্টা করতেন। যাঁরা সে আদর্শ বুঝতে চেষ্টা করতেন না বা বিরোধী হতেন, তাঁরা বাধ্য হয়ে চলে যেতেন। রেবাচাঁদ মাস্টারমশাই নিতান্ত সাধুপ্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজি খুব ভালো পড়াতে পারতেন, কিন্তু কড়া নিয়ম পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, ক্রিকেট খেলার নিয়ম তিনি সর্বত্র সব কাজে পালন করাতে চাইতেন। বাবা ঐরকম কঠোরতা পছন্দ করতেন না। কিছুদিন পরে রেবাচাঁদ আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়ে পরবর্তী কালে একটি ইস্কুল করেন। তিনি অণিমানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

আদিকুটিরে আমরা মাত্র পঁচিশ-তিরিশজন ছাত্র ছিলুম। আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা অত্যন্ত শাদাসিধে ছিল। ছাত্রদের জন্য তখন অভিভাবকদের কিছুই খরচ ছিল না, বেতন তো নেওয়া হতই না— সব ব্যয়ই বাবা বহন করতেন। আমাদের সম্পত্তির মধ্যে খানকয়েক কাপড় ও দুটি কম্বল। গৈরিক রঙের আলখাল্লা সর্বদাই পরে থাকতে হত, তাতে আমরা খুশি ছিলুম— আলখাল্লার নীচে যেমন ছেঁড়া বা নোংরা পোশাক থাক-না কেন, বাইরে থেকে ধরতে পারা যেত না। আদিকুটিরের লম্বা ঘরটিতেও আসবাবের কোনো বালাই ছিল না, ঘেঁষাঘেষি কয়েকখানা তক্তপোশ ও প্রত্যেকের জন্য একটি করে দেয়াল-আলনা। ভোর চারটের সময় ভূপেনবাবু সকলের ঘুম ভাঙিয়ে ভুবনডাঙার বাঁধে নিয়ে যেতেন স্নান করাতে।

শীতকালে বাঁধের ঠাণ্ডা জলে ডুব দিতে দিতে মাস্টারমশায়ের উপর কী রাগই না হত। স্নানে যাবার আগেই ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে জিনিসপত্র যার যার জায়গায় গুছিয়ে রেখে যেতুম। ফিরে এসে গাছতলায় আসন পেতে উপাসনায় বসতে হত। ঘণ্টা পড়লে, একত্র হয়ে 'পিতা নোহসি' মন্ত্রপাঠ করে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে ছুটতুম। ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই ছিল না, ছোলা-ভিজে, মুড়ি-গুড়— এই ছিল জলখাবারের সামগ্রী। তার থেকে আবার বাটিতে সাজিয়ে নিয়ে প্রথমে মাস্টারমশাইদের ঘরে ঘরে পরিবেশন করে এসে তবে নিজেরা খেতুম। বুধবার দিন এই একঘেয়ে জলখাবারের ইতরবিশেষ হত, সেদিন থাকত লুচি ও চিনি। এইটুকুতেই আমরা যথেষ্ট আনন্দ পেতুম।

ইস্কুলের বোর্ডিঙে আমি থাকব— মায়ের সেটা ভালো লাগত না। বিশেষ-ভাবে তাঁর খারাপ লাগত ইস্কুলের রান্নাঘরের বামুনদের বিশ্রী রান্না আমাকে খেতে হচ্ছে মনে করে। কিন্তু বাবার বিশেষ ইচ্ছে আমি অন্যান্য ছেলেদের মতো বোর্ডিঙে থাকি, তাই তিনি কোনো আপত্তি কখনো প্রকাশ করেন নি। বুধবার ছুটির দিন মা মনের আক্ষেপ মেটাতে চেষ্টা করতেন। বাড়িতে তিনি সেদিন নিজে রান্না করতেন— আমার সঙ্গে বোর্ডিঙের সব ছেলেরাই খেতে আসত। এই নিয়মিত খাওয়াতে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি হত না— বেশি ভালো লাগত যখন দল বেঁধে অসময়ে এসে মায়ের ভাঁড়ার-ঘর লুট করে নিতে যেতুম। তিনি পরে জানতে পেলেও আমাদের কিছু বলতেন না।

সকালবেলায় পড়ার ক্লাস শেষ হয়ে যেত, বিকেলবেলায় ড্রয়িং, গান-বাজনা, হাতের কাজ এইসব শিখতে হত। সবচেয়ে ভালো লাগত যখন জগদানন্দবাবু বিজ্ঞান পড়াতেন। আগরতলার কলেজ উঠে যাবার পর ত্রিপুরার মহারাজা কতকগুলি ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম বাবাকে বিদ্যালয়ের জন্য দিয়েছিলেন। আদিকুটিরের একটি ছোটো ঘরে সেগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। গল্পচ্ছলে সরস করে বিজ্ঞানের কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল জগদানন্দবাবুর। তার পর যখন যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরীক্ষা দেখাতেন তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতুম, আমাদের কৌতূহল যতই অবান্তর হোক-না, তিনি বিরক্ত হতেন না; হাসিমুখে সব প্রশ্নের জবাব দিতেন। হুগলিতে এক ভদ্রলোক নিজের হাতে টেলিস্কোপ

তৈরি করেছেন শুনে বাবা তাঁর কাছ থেকে একটি তিন ইঞ্চি টেলিস্কোপ তিন শো টাকা দিয়ে কিনে জগদানন্দবাবুকে দিলেন। এটি তাঁর খেলার জিনিস হল। রাত হলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বসে থাকতেন, কোনো গ্রহনক্ষত্র দেখতে পেলেই আমাদের ডেকে তা দেখাতেন।

আশ্রমে তখন আমিষ আহার চলত না, নিরামিষ খেতে হত। রান্নাবাড়ি চালানোয় ছাত্রদের যথেষ্ট হাত ছিল। প্রতি সপ্তাহে দুজন করে ম্যানেজার আমরা নির্বাচন করতুম। তারাই হাটের দিন হাটে গিয়ে বাজার নিয়ে আসত, কী রান্না হবে ঠাকুরদের জানিয়ে দিত, ঘর পরিচ্ছন্ন রাখায় সাহায্য করত ও ছাত্রদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে ঠিক করে দিত। আমাদের নিয়ম ছিল খাবার সময় কেউ চেঁচিয়ে কথা বলতে পারবে না, কেউ রান্নার নিন্দে করতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজের থালা-বাটি ছিল, খাওয়ার পরে ধুয়ে মেজে সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে যেতে হত।

বিকেলবেলায় খেলাধুলা। খেলার মাঠে যাবার জন্য কাউকে ডাক দিতে হত না। ফুটবল খেলতে সবচেয়ে কম খরচ, তাই অন্য কোনো খেলার সরঞ্জাম ছিল না। ফুটবল খেলতেই আমাদের নেশা জন্মে গিয়েছিল। একবার নাটোরের মহারাজা আশ্রমে বেড়াতে এসে নানারকম খেলার প্রচুর সরঞ্জাম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফুটবল কেউ ছাড়তে চাইল না। কয়েকজন ভালো খেলোয়াড়ও তৈরি হল। আমাদের তখন গর্বের বিষয় ছিল আশেপাশের কোনো দলের কাছে ফুটবল খেলে হারি নি। দীনেশ সেন মহাশয়ের ছেলে অরুণ, জগদানন্দবাবুর ভাইপো ধীরানন্দ, চন্দননগরের গৌরগোপাল, পরে সূর্য চক্রবর্তী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বীরেন সেন প্রভৃতি আমাদের দলে ওস্তাদ খেলোয়াড় ছিল। বড়ো হয়ে এদের মধ্যে অনেকেই মোহনবাগান, ঈস্ট বেঙ্গল, ঈ. বি. রেলওয়ে প্রভৃতি দলে খেলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। মাস্টারমশায়দের মধ্যেও অনেকে আমাদের সঙ্গে খেলতেন।

মুখ-হাত ধুয়ে উপাসনার পর লাইব্রেরির বারান্দায় আমরা একত্র হতুম। বাবা যখন উপস্থিত থাকতেন— কখনো গান, কখনো গল্প, কখনো খেলাধুলা করে ছাত্রদের বিনোদন করতেন। নাক চোখ কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের চর্চা হয় এইরকম কতকগুলি খেলা আমাদের শিখিয়েছিলেন। খেলাটাই আমাদের

এত ভালো লাগত, তার সঙ্গে যে sense training হয়ে যাচ্ছে আমরা জানতেই পারতুম না। তখনও অভিনয়ের চলন হয় নি।

আদি ব্রাহ্মসমাজে বুধবার দিন উপাসনা হত। রবিবার খ্রীস্টানদের Sabbath বলে ছুটি থাকে। মহর্ষি পছন্দ করতেন না ভারতবর্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরাও বিদেশী ছুটি পালন করি। তাই আদিসমাজে তিনি বুধবার উপাসনার দিন ঠিক করে দিয়েছিলেন। মহর্ষির ইচ্ছানুসারে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে বুধবারে ছুটি দেওয়া হত। সেইদিন সবাগ্রে মন্দিরে উপাসনা। ঘণ্টা বাজবার পূর্বেই আমরা স্নান করে তসরের ধুতি ও চাদর পরে প্রস্তুত হয়ে থাকতুম— তার পর লাইন করে মন্দিরে যেতুম। বাবা অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতেই এসে মন্দিরের বাইরে বসে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতেন। মাঠ পেরিয়ে পূর্বদিগন্তে সূর্যালোকের ঈষৎ রঙিন ছটা যেই আকাশকে উজ্জ্বল করে তুলত, বাবা আসন ছেড়ে উঠে মন্দিরের প্রভাতী ঘণ্টা নিজেই বাজাতে থাকতেন।

বাবা সবদাই চেষ্টা করতেন ছাত্ররা শিশু অবস্থা থেকেই যাতে আত্মনির্ভর হতে শেখে। ছাত্রদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মধারা তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করত। বিদ্যালয়ের চালনাক্ষেত্রেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন করেছিলেন। কর্তৃত্বের ভার ছিল অধ্যাপকদের হাতে— বৎসরান্তে তাঁরা একটি সমিতি নির্বাচন করতেন এবং এই সমিতি একজন সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন করতেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই প্রথাতেই বিদ্যালয়ের কাজ চলেছিল এবং বলতেই হবে বেশ সুচারুরূপেই চলেছিল। ছাত্রদের মধ্যেও একটি সমিতি ছিল— নিয়ম-কানুন তারাই প্রস্তুত করত ও একজন নায়ক বা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করত। কোনো ছাত্র অন্যায় বা নিয়মভঙ্গ করলে, ছাত্রদের মনোনীত বিচারসভার কাছে তাকে পাঠানো হত। বিচারসভা যথোপযোগী শাস্তির বিধান দিত। ছাত্ররা তাদের সভা-সমিতির প্রতিবেদন সযত্নে লিখে রাখত। এই উপায়ে স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা পাবার সুযোগ ছেলেবেলা থেকেই তারা পেত।

বাবা প্রায়ই ক্লাস নিতেন। তিনি ছোটোদের পড়াতে ভালোবাসতেন। তিনি যেভাবে পড়াতেন তাতে তাদের মনে হত না যে তারা ক্লাসে পড়ছে— পড়তে যথেষ্ট আনন্দ পেত। মাস্টারমশায়রা বাবার কাছ থেকে তাঁর পড়াবার

প্রণালী শিখতে চেষ্টা করতেন। আশ্রমে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় যে-কোনো একটা ক্লাসে গিয়ে বাবা পড়াতে আরম্ভ করে দিতেন। সেই ক্লাসের অধ্যাপক তাতে খুশি হতেন, মনে করতেন কী করে পড়ালে ভালো হয় তা শেখাবার মস্ত সুযোগ তিনি পেলেন।

বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে বাবার কোনোদিনই উৎসাহের অভাব ঘটে নি, কিন্তু প্রথম কয়েক বছর তাঁকে তাঁর স্বভাবের বিপরীত নানা কাজ নিয়ে পরিশ্রম করতে হয়েছিল, খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় তাঁকে নিজে দেখতে হত। পড়াশুনা খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ— সবের মধ্যে তাঁর আত্মিক যোগ সকলে অনুভব করত। যে বিষয় কেউ জানতে পারত না সে হচ্ছে বিদ্যালয়ের জন্য তাঁর নিরন্তর অর্থচিন্তা।

মাস্টারমশায়দের থাকার জন্য পৃথক বাসা ছিল না, তাঁরা ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সঙ্গেই থাকতেন। এইজন্য আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁরা মেশামেশি করতেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যেত। আমরা তাঁদের ভয়ও করতুম ভালোও বাসতুম। জগদানন্দবাবুকে আমরা সবচেয়ে ভয় করতুম। তবু তাঁর উপর অত্যাচার করতেও ছাড়তুম না। একবার দোলের দিন রঙ-খেলা শেষ হলেও আমাদের আশ মিটল না, আর কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় নজরে পড়ল মাস্টারমশায় পরিষ্কার কাপড় পরে স্নান সেরে একটা খাটের উপর বারান্দায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। কথাবার্তা নেই, আমরা কয়েকজন বড়ো ছেলে খাটসুদ্ধ তুলে নিয়ে হরিবোল দিতে দিতে একেবারে বাঁধের জলে নিয়ে ফেললুম। তিনি উঠে বসে উত্তম-মধ্যম ধমক দিতে লাগলেন, আমরা সেটা তেমন খেয়াল করলুম না, তাঁর ঠোঁটের এককোণে একটুখানি হাসির রেখা দেখে মনে হল আমাদের এই ছেলে-মানুষিতে তিনিও যেন মজা অনুভব করছেন। শেষে আমরা তাঁকে সেই অবস্থায় রেখে ফিরে যাচ্ছি দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ওটি হবে না, যেমন করে এনেছিস ঠিক তেমনি করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, খাট তোল বলছি!'

আমরা আবার খাটখানা কাঁধে করে তাঁকে আশ্রমে যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।

ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে এমনি সৌহার্দ্য ছিল—এই ধরনের নির্দোষ পরিহাসে তাঁরা বিরক্তি বোধ করতেন না।

ভালো ছাত্র আমাদের অদৃষ্টে বড়ো জুটত না তখনকার দিনে। অনেক বছর পর্যন্ত সাধারণের ধারণা ছিল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় যেন একটা রিফর্মেটরি ইস্কুল। অভিভাবকরা সেখানে দুরন্ত ছেলেদেরই পাঠাতেন। কিন্তু তখন আশ্রমের এমন আবহাওয়া ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই নিতান্ত বেয়াড়া ছেলেরাও সহজে ঢিট হয়ে আসত। নতুন কেউ ভর্তি হলেই সকলে মিলে চেষ্টা করা যেত তাকে আশ্রমের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য। সহজে যাদের বাগ মানাতে পারা যেত না তাদের জন্য আমাদের প্রায়ই অভিনব উপায় আবিষ্কার করতে হ'ত।

কত-না বিচিত্র প্রকৃতির ছাত্র এসে তখন জুটত আশ্রমে। আমাদের ব্যবহারের জন্য এক বোতল পি. এম. বাগচির কালি থাকত ঘরে। একটি ছেলের কথা মনে পড়ে, সে লেখাপড়ার প্রতি বিতৃষ্ণ। লিখতে যাতে না হয়, সে একদিন বোতলের সব কালি কোন্ সময় ঢক্‌ঢক করে খেয়ে, খালি বোতলটি তাকের উপর রেখে দিল।

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভের দিকে কয়েক বছর সন্তোষ ও আমি যখন বোর্ডিঙে ছিলুম— তখন ছাত্রসংখ্যা পঁচিশ-তিরিশের বেশি ছিল না। মাস্টারমহাশয়দের মধ্যে দু-একজনই কেবল সপরিবারে থাকার জন্য পৃথক বাসা পেয়েছিলেন। অন্যরা সকলেই ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে থাকতেন, একত্রে খেতেন। ছাত্রাবাসে ছাত্র ও শিক্ষক মিলে যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার।

বিদ্যালয়ের সংগতি ছিল সামান্য— ঘরবাড়ি সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে আতিশয্য বা ঐশ্বর্য মোটেই ছিল না, অত্যন্ত দীনভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন চলত, এমন-কি, যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ছিল বিপুল আনন্দ। ক্লাসের পড়াকে আমরা ভয় করতুম না, তার ভিতরেও আমরা আনন্দ পেতুম। গান-বাজনা অভিনয় গল্প এবং পড়ানোর অভিনব প্রণালীর ভিতর দিয়ে বাবা যে আনন্দপ্রবাহ আশ্রমে বইয়ে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমরা মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম, সে প্রভাবকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারত না। আশ্রমের জীবনধারার আবহাওয়ায় আনন্দই ছিল মূলমন্ত্র। শিক্ষা কেবল পড়াশুনার মধ্যে দিয়ে নয়, মনকে সরস করে জাগিয়ে তোলা, শিক্ষার এই যে ব্যাপক আদর্শ বাবা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার পরিপূর্ণ রূপ এই সময়ে যেমন ফুটে উঠেছিল, পরে সম্ভবত

আর হয় নি। তার একমাত্র কারণ বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর স্পর্শ ছিল, তিনি নিজেকে তখন সম্পূর্ণভাবে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের গড়া এই শিক্ষায়তনে।

ইস্কুলটি যেমন গড়ে উঠতে লাগল, তিনি নিজেকেও সেইসঙ্গে গড়ে তুলতে লাগলেন। নানান বিষয়ে পরীক্ষা চলতে থাকত। কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলে, বিনা দ্বিধায় তাকে বর্জন করতেন। সারাজীবনই তিনি পরীক্ষা করে সত্য সন্ধান করেছেন বলা যায়। শান্তিনিকেতন ছিল একটি বড়োরকম পরীক্ষাকেন্দ্র। বাবা নানা বিষয়ে নূতন প্রণালী খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছেন দেখে অধ্যাপকরাও উৎসাহিত হতেন। সবরকম কাজে উৎসাহ, নতুন কোনো কল্পনা এলে তাকে কাজে পরিণত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া— শান্তিনিকেতনের তখন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আনন্দ ও নব নব উদ্যমের অনুকূল আবহাওয়া, তারই মধ্যে মানুষ হয়েছে ছাত্ররা। নানান পরিবেশ থেকে বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে আসত শান্তিনিকেতনে— কিন্তু যাবার সময় সকলেই একটা বিশেষ ছাপ নিয়ে যেত। দেশের হাতে এইটেই শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট দান।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের একটি ছুটি

১৯০৩ সালে এনট্রান্স পাস করা হয়ে গেছে। কলকাতার কলেজে আমাকে পড়তে দিতে বাবার ইচ্ছা ছিল না। তাই রয়ে গেছি শান্তিনিকেতন আশ্রমেই। মোহিতচন্দ্র সেনের কাছে পড়ছি মিল্‌টন ও শেক্‌স্‌পীয়র, জগদানন্দবাবুর কাছে বিজ্ঞান ও অঙ্ক, আর বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পড়াচ্ছেন পালি ও সংস্কৃত।

ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারে মৃত্যু হানা দিয়ে গেছে। ১৯০২ সালে মাকে হারিয়েছি। শান্তিনিকেতনে আমাদের সংকুচিত সংসার চালাতে লাগলেন মায়ের পাতানো পিসি রাজলক্ষ্মী দিদিমা। বাবা থাকতেন 'দেহলী'তে, তারই সংলগ্ন কয়েকটি চালাঘরে রাজলক্ষ্মী দিদিমার আদর ও যত্নে আমরা কটি ভাইবোন মানুষ হতে থাকলুম।

গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল। সহপাঠীরা সবাই বাড়ি চলে গেছে। ছেলেদের কলরব হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে আশ্রম নিস্তব্ধ, নিঝুম। আমার ভাইপো দিনেন্দ্রনাথ, বন্ধু সন্তোষ মজুমদার আর আমি কেবল পড়ে আছি সেই ভাঙা হাটে। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটির দীর্ঘ অবসর কী করে কাটাব ভাবছি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দারুণ গরমে নিঃসঙ্গ দিনগুলির কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আশ্রমের নির্জনতা আর পীড়া দিল না, সঙ্গীদের অভাব আর কষ্টকর বোধ হল না। হট্টগোলের মধ্যে যে-সব ঘটনা তুচ্ছ বলে অবহেলা করেছি, যে-সব জিনিস নজর দিয়ে দেখবার অবকাশ পাই নি এতদিন, এখন সেগুলির প্রকাশ দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল, আরো ভালো করে দেখবার জন্য, ভালো করে বোঝবার জন্য আগ্রহ হল।

প্রতিদিন প্রত্যূষে ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙেছে, পুবের মাঠের শেষে তালের শ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে তখন আকাশে সবে একটু রঙ ধরেছে। রাত্রির অন্ধকার অপসারিত করে সূর্যোদয় প্রত্যহ যে আশা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে তা কি তখন আমরা গ্রহণ করেছি? ভোরবেলার যে মাধুর্য, যে শান্তি তা কি মনের মধ্যে অনুভব করেছি? লোকের কোলাহলের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমরা দেখেও দেখি না।

এখন আর ঘণ্টা বাজে না, কিন্তু ভোর হবার আগেই উঠে পড়ি, পাছে অরুণোদয়ের নিত্যনতুন রঙের খেলা একটা কোনো দিন দেখতে না পাই। দিনের প্রহরগুলি এখন ধীরগতিতে চলে, কিন্তু শ্রান্তিকর লাগে না। প্রতি মুহূর্তেই আশ্রমের কোনো নতুন অজানা রূপ নজরে পড়ে, সেখানকার গাছ-পালা পশুপক্ষী নতুন কোনো রহস্যের আস্বাদ দিয়ে যায়। আমার সহপাঠীরা চলে গেছে, কিন্তু আমবাগান শালবীথি শালিখ পাখি কাঠবিড়াল— অনেক সহচর আমাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের নিয়ে আমার দিন কেটে যায়, রাত্রে মাঠে গিয়ে পড়ে থাকি কীটপতঙ্গের ডাক শুনতে।

দুপুরের পর একদিন লাইব্রেরির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বৈশাখের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। উত্তপ্ত মাটি থেকে গরম হাওয়া কাঁপতে কাঁপতে উপর দিকে উঠছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মাঝে মাঝে ঘূর্ণি এসে মাঠের জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ধূ ধূ করছে মাঠ, কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, কেবল ধানের খেতে কয়েকটি নির্জীব ভেড়া সবুজ ঘাসের বৃথা সন্ধানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রীষ্মের এই রুদ্রমূর্তি একদৃষ্টে দেখছি, এমন সময় একজোড়া হেঁড়েল নিঃসংকোচে আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়ে একটি মেষশাবককে পিঠের উপর তুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান করল। তখন অনুভব করলুম প্রকৃতি কেবল মধুময় নয়। মনে পড়ল রঘুপতির কথা— 'এ জগৎ হত্যাশালা…হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে'।

এই ছুটিটা আমার কাছে খুব স্মরণীয়— বিশেষ একটি কারণে। এই দুমাস ধরে সতীশচন্দ্র রায়কে খুব কাছাকাছি পেয়েছিলাম। বয়সের পার্থক্যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতায় কোনো বাধা হয় নি। তিনি আমাকে সমবয়সীর মতোই টেনে নিয়েছিলেন। কিছুকাল পরেই বসন্ত রোগে সতীশবাবুর মৃত্যু হয়। অল্প সময়ের জন্য তাঁকে পেয়েছিলাম— কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তারই মধ্যে যা পেয়েছিলাম, ভোলবার মতো নয়। সতীশচন্দ্র যে কেবল কবি ছিলেন তা নয়, অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। মাত্র একুশ বছর তাঁর বয়স, কিন্তু ঐ অল্পবয়সেই বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অধিকার হয়েছিল। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ব্রাউনিং ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। তিনি ভর্জিল, দান্তে, গ্যেটে, শেক্স্‌পীয়র বা কালিদাস থেকে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। আমার পিতার সাহিত্য আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। সতীশ

রায় ছিলেন উদারচেতা, ভেদাভেদজ্ঞান তাঁর ছিল না। তার কাছে আমি কেবল বয়সে নয়, বিদ্যাবুদ্ধিতে নিতান্ত অর্বাচীন হলেও, তিনি আমার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন, তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিতেন। দিনের বেলায় লাইব্রেরির এক কোণের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি আমাকে ও সন্তোষকে পড়াতেন কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়র। তাঁর পড়াবার এমন ধরন ছিল, কঠিন সাহিত্য পড়ছি বলেই মনে হত না। সতীশ-বাবুর মতো শিক্ষক বিরল। গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে রাত্রে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত মাঠে বেড়াতে বেরিয়ে কত রাত কেটে যেত শুয়ে শুয়ে সতীশবাবুর কণ্ঠে বাংলা-কাব্য শুনতে শুনতে। একে একে গ্রহমণ্ডলী ম্লান হয়ে পশ্চিমের মাঠের শেষ সীমান্তে অন্তর্হিত হচ্ছে, সতীশ রায়ের উৎসাহের তবু বিরাম নেই, শ্রান্তি নেই, কবিতার পর কবিতা অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমারও চোখে ঘুম নেই, মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি। তিনি এমনি আত্মহারা হয়ে, ভাবে মাতোয়ারা হয়ে আবৃত্তি করতেন যে, কবিতার অন্তরের রহস্য আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেত, রচনা যতই কঠিন হোক-না কেন তার মর্মার্থ বুঝতে কষ্ট হত না। স্রষ্টা কবি যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখেছিলেন সতীশবাবু যেন সেই ভাবকেই আমার কাছে মূর্তিমান করে তুলতেন। এই সময়ে তাঁর কাছে কত-না কবিতা শুনেছি; কাব্যরসে তিনি আমার মন প্লাবিত করে দিয়েছিলেন।

একটা দিনের কথা কখনো ভুলব না। সেদিন তাঁর কণ্ঠে যে আবৃত্তি শুনেছিলুম তাতে চিরদিনের জন্য তিনি আশ মিটিয়ে দিয়েছেন, আর কোনো কণ্ঠে সে কবিতা শুনতে আর ইচ্ছা করবে বলে মনে হয় না। সেদিন চৈত্র-সংক্রান্তি। সমস্ত দিন অসহ্য গরম গেছে। দুপুরে ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে আমরা কয়েকজন একটু আরাম পাবার বৃথা চেষ্টা করছি। বদ্ধ ঘরে আর থাকতে না পেরে যখন বাইরে বেরিয়ে এলুম, তখন দেখি পশ্চিমে মেঘের ঘনঘটা, কালবৈশাখী ঝড়ের বিরাট আয়োজন চলছে। আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝড়ের অপেক্ষা করতে লাগলুম। রোদে-পোড়া গাছপালা, তৃষার্ত তৃণহীন বিস্তৃত মাঠ, তারাও যেন উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে আসন্ন কোনো প্রাকৃতিক বিপ্লবের জন্য। চার দিক থমথমে হয়ে রয়েছে। আকাশের ঈশানকোণে কেবল বিপুল উদ্যোগের লক্ষণ। একটুখানি মেঘের টুকরো, দেখতে দেখতে ফেঁপে

উঠে ঘন নীলবর্ণ দৈত্যের মতো ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসতে লাগল যেন পৃথিবীকে গ্রাস করতে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখছি তার সেই ভয়ংকর মূর্তি ও দ্রুত গতি, এমন সময় কানে এল সতীশ রায়ের উচ্চকণ্ঠে—

ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা-বন্ধ-হারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া—
হানি দীর্ঘধারা।

কয়েকটা লাইন পড়তে-না-পড়তে ঘন ঘন মেঘ-গর্জনের সঙ্গে ঝড় এসে দিল অন্ধকার করে চার দিক, তার ঝাপটায় নুয়ে পড়ল যত ছিল গাছপালা। যেমন ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে লাগল, মেঘের ডাক ছাড়িয়ে উঠতে লাগল সতীশ রায়ের গলা। ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে চলল তাঁর আবৃত্তি। সে কী গলা, কী সে ভঙ্গি! ভাবে মাতোয়ারা হয়ে কী অদ্ভুত কবিতাপাঠ! যেন কথার ফোয়ারার উৎস উছলে পড়ছে মুখ দিয়ে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, চোখ দিয়ে জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। আবৃত্তি শুনব, না তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকব? 'বর্ষশেষে'র কথা, ছন্দ, ভাব, তার সঙ্গে প্রকৃতির উদ্দাম ঝঞ্ঝাবাত ও সতীশ রায় মিশে যেন এক হয়ে গেছে।

আবৃত্তি যেই শেষ হল, বিদ্যুতের চমকানি ও বাজ-পড়ার প্রচণ্ড এক ডাকে মুহূর্তের জন্য আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, পরমুহূর্তেই দেখি সতীশ রায় আর নেই, ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁকে কোথাও আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক অনুসন্ধানের পর দূরে এক গাছতলা থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল।

সতীশচন্দ্র ও দিনেন্দ্রনাথের সমাবেশে ছুটির দিনগুলি সাহিত্য ও সংগীত-রসে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। আর কোনো আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন ছিল না; সাহিত্যপাঠ, গান ও নানা বিষয়ে আলোচনা গল্পগুজবে পরম আনন্দে সময় কেটে যেত। মুখে মুখে ছড়া বানানো একটা খেলা ছিল। হঠাৎ একজন মিল করে দু-লাইন বললেই একে একে সকলকে ছড়াটা সম্পূর্ণ করতে হত। তার একটা ছড়া সংগ্রহ করেছি, তবে কে কোন্ অংশ রচনা করেছিলেন তা এখন বলতে পারব না—

এসরাজ শোনো আজ, সুমধুর তান,
মধুর সংগীতে তার ভরে যাক প্রাণ।
এসরাজ কহিল, আজ কান করি খাড়া,
এ গরমে গান কি রে, ওরে লক্ষ্মীছাড়া।
তবে যদি শালী বলি মলি দাও কান—
গান বাহিরিতে পারে দুই-চারিখান।

দলের মধ্যে সকলেই রসগ্রাহী, কেবল একটি পাকা-দাড়ি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাকেচক্রে আমাদের এই লক্ষ্মীছাড়াদের দলে থেকে গিয়েছিলেন— তাঁর সর্বদাই আশঙ্কা হত ছেলেছোকরারা নীতিবিরুদ্ধ কিছু না করে। তিনি মনে করতেন সতীশবাবুই ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। তাঁকে রাগাবার জন্য যখনই তাঁকে লাইব্রেরির কাছে আসতে দেখতেন সতীশবাবু অমনি কালিদাস বা শেক্স্পীয়র থেকে বাছা-বাছা রসাত্মক অংশ চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করতেন। ভদ্রলোক সেই শুনে কানে আঙুল দিয়ে দাড়ি নাড়তে-নাড়তে লাইব্রেরি ছেড়ে পলায়ন করতেন। আমাদের হাসি পেত।

ছুটির কয়েকটা দিনের মধ্যে সতীশ রায় আমাদের কতখানি-না সাহিত্য-রসের খোরাক দিয়েছিলেন, কতখানি-না মনকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, মনে করলে অভিভূত হতে হয়। অল্প বয়সের এই একটি কবি ও ভাবুক স্বল্প দিনের সংস্পর্শে আমাকে চিরজীবন তাঁর কাছে ঋণী করে দিয়ে গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে আর একটি প্রতিভা নিয়ে বাংলাদেশ গব করতে পারত, কিন্তু কয়েক মাস বাদেই শীতের সময় বাইশ বছর বয়সে সতীশ রায়ের অকালমৃত্যু হল। আমাদের আকাশে হঠাৎ নিভে গেল একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এইসময় দু-চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে, দিনেন্দ্রনাথের গান শুনে, সতীশ রায়ের কাব্য-আলোচনায় যোগ দিয়ে তাঁর এত ভালো লাগল, তিনি কিছুকাল থেকে গেলেন। তাঁকে আমরা বৈজ্ঞানিক বলেই জানতুম, কবিতা লেখেন তা জানতুম না। তবে তাঁর কবিমনের পরিচয় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। ল্যাবরেটরিতে কয়েকটা ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি রয়েছে দেখে সুরেনবাবুর উৎসাহ হল আমাদের রসায়ন-বিজ্ঞান শেখাতে। মৌলিক পদার্থের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে দেবদেবীদের সঙ্গে তুলনা করে কেউ হত চতুর্ভুজ,

কেউ হত দশানন, তাদের মধ্যে কে কাকে ভালোবাসে, কে কাকে দেখতে পারে না আমাদের মনে রাখতে বলতেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সহজে গল্পচ্ছলে রসায়ন-বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র আমাদের মনে এমন গেঁথে দিয়েছিলেন যে, পরে যখন কলেজে রসায়ন শিখতে গেলুম, রাসায়নিক সংকেত যতই কঠিন হোক, বুঝতে বা কষে ফেলতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

সুরেন মৈত্র মহাশয় তখনো কবিতা লিখতে বোধ হয় আরম্ভ করেন নি, অন্তত নিজের রচনা আমাদের তখনো পড়ে শোনান নি। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই গান শোনাতে ভালোবাসতেন। দিনেন্দ্রনাথের কাছে তিনি বাবার অনেক গান শিখে নিয়েছিলেন।

বাবা এই গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। তিনি আমার বোন রানীকে নিয়ে তার অসুখ সারাবার চেষ্টায় প্রথমে হাজারিবাগ পরে আলমোড়ায় গিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের দুমাস অনেকের কাছেই ভয়াবহ। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে আশ্রমের গুটিকতক গাছের আশ্রয়ে থেকে আমরা কয়েকজন সেবার কিন্তু প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছি। শালের শুকনো পাতা পড়ে আশ্রমের মাটি ঢেকে গেছে, বাইরে মাঠের ঘাস পুড়ে মাটির রঙের সঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও লাল কাঁকর বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত ডাঙাটাই যেন পুড়ে লাল হয়ে গেছে। আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে লাল ধুলো উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিকাল হলে কালবৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্য, সে কী ভয়ংকর, সে কী আশ্চর্য সুন্দর! শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মকালের এই দারুণ রুদ্রমূর্তির ভয়ংকর সৌন্দর্য মুগ্ধ না করে যায় না। তার পর যখন গাছপালা ঘাস-পাতা সব যেন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন একদিন হঠাৎ আসে বর্ষা। এক মুহূর্তে প্রকৃতির উপর জাদুকর যেন বুলিয়ে দিয়ে যায় তার সবুজ রঙের তুলির স্পর্শ। গাছের পাতায় ধরে কাচা রঙ, মাঠের উপর যেন বিছানো হয় সবুজ কার্পেট, পাখিরা গান গেয়ে ওঠে। যা ছিল ধূসর মরুভূমি, হয়ে ওঠে শ্যামলসুন্দর একটি বাগান।

ছুটি ফুরোতে ছাত্রেরা এসে পড়েছে। তাদের কলরবে আশ্রম মুখরিত। কিন্তু এবার তাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে আর যোগদান করতে পারলুম না। ক্লাসে গিয়ে আবার বসলুম বিষণ্ণ মনে।

একটি মধ্যনিদাঘ রাতের স্বপ্ন

এনট্রান্স পাস করবার পরেও আমি শান্তিনিকেতনে থেকে গেলাম সে কথা পূর্বে বলেছি। ততদিনে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে বাড়তে গুটি-পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। আমার কাজ হল সর্দার পোড়োর মতো এইসব ছাত্রদের তত্ত্ব-তদারক করা। ওরই ফাঁকে ফাঁকে মাস্টারমশায়দের কাছ থেকে কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করে নিতাম।

তখন বারাণসী থেকে বিধুশেখর ভট্টাচার্য সদ্য এসেছেন। সংস্কৃত ও পালি শেখানোর জন্য এঁর চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক কেউ তখন ছিলেন না। সংস্কৃত যে কথ্যভাষা হিসাবে অচল— এ যেন তিনি মানতে চাইতেন না। কেবল পাণিনির ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়ে, কালিদাস ভর্তৃহরি প্রভৃতি দিক্‌পালদের দুরূহ কাব্যাংশ অন্বয় করিয়ে ক্ষান্ত হবেন এমন পাত্র তিনি ছিলেন না। সংস্কৃত কথোপকথনে আমরা বেশ দক্ষ হয়ে উঠি— এদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

সংস্কৃতের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অদৃষ্টগুণে আমি মোহিতচন্দ্র সেনের মতো একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম। শেক্‌স্‌পীয়রের *A Midsummer Night's Dream* নাটক পড়বার পর মোহিতবাবুর ইচ্ছা হল আমরা এই নাটক অভিনয় করি। শেক্‌স্‌পীয়রের মতো নাট্যকারের ইংরেজি নাটক মঞ্চস্থ করি— সেরকম যোগ্যতা কিংবা কুশলতা আমাদের কারোই ছিল না, কিন্তু দুঃসাহসে ভর করে আমরা তো তদ্দণ্ডেই উঠে-পড়ে লাগলাম। এই অভিনয়-ব্যাপার থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না— এরকম স্থির হল। আমাদের গণিত-শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে Wall-এর পার্ট দেওয়া হল— কারণ এই পার্টে কথা বলার পাট নেই বললেই চলে।

In this same interlude it doth befall that I,··· এইটুকু বলেই জগদানন্দবাবু মঞ্চে অন্য যে-সব অভিনেতা ছিলেন তাঁদের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইলেন, যদি তাঁদের কেউ সেই পরের অংশটুকু ধরিয়ে দেন। বেশ একটু সময় কেটে যাবার পর শেষ দিকের কটি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—

And thus have I, wall, my
part discharged so···

এই কথাটুকু ঊর্ধ্বশ্বাসে বলে যেই-না তিনি দ্রুত প্রস্থান করেছেন— দর্শক-শ্রোতার দল উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ল।

এই প্রথম অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়ে জগদানন্দবাবুর দুর্দশা হয়েছিল চরম। কিন্তু বাবামশায় কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। এর পরেও জগদানন্দ-বাবুকে অভিনয়ে নামতে হয়েছিল। পরে আশ্রমের দল যখন কলকাতায় গিয়ে অভিনয় করতে শুরু করে, বাবার নাটকে অভিনয় করার মতো একজন কুশলী নটরূপে তার প্রচুর সুনাম হয়। বিশেষত শারদোৎসব অভিনয়ে কৃপণ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তিনি যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা সত্যই অনন্য ও অনবদ্য। মনে হতে ওই লক্ষেশ্বরের ভূমিকাটুকু যেন জগদানন্দবাবুর জন্যই বিশেষভাবে লিখিত।

দুঃখের আঘাত

আমি তখন শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছি। বয়স মাত্র তেরো হয়েছে। দিদি ও বাবীর সবে বিয়ে হয়ে গেছে। এই সময় আমাদের পরিবারে মৃত্যু ছায়া ফেলল। আমার ব্যক্তিগত জীবনে সেই প্রথম শোক।

শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্য পৃথক বাড়ি তখন ছিল না, আমরা থাকতুম আশ্রমের অতিথিশালার দোতলায়। রান্নাবাড়ি ছিল দূরে। মা রান্না করতে ভালোবাসতেন, তাই দোতলার বারান্দার এক কোণে তিনি উনুন পেতে নিয়েছিলেন। ছুটির দিন নিজের হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন। আমরা জানতুম, জালের আলমারিতে যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সবদাই মজুত থাকত— সেই অক্ষয় ভাণ্ডারে সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্ম্য করতে ত্রুটি করতুম না। বাবার ফরমাশমতো নানারকম নতুন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরি করতে হত। সাধারণ গজার একটি নতুন সংস্করণ একবার তৈরি হল, তার নাম দেওয়া হল 'পরিবন্ধ'। এটা খেতে ভালো, দেখতেও ভালো। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই এটা বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাবা যখন মাকে মানকচুর জিলিপি করতে বললেন, মা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তৈরি করে দেখেন এটাও উৎরে গেল। সাধারণ জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ভালো হল। বাবার এইরকম নিত্য নতুন ফরমাশ চলত, মা-ও উৎসাহের সঙ্গে সেইমতো করতে চেষ্টা করতেন।

কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয় নি। অস্থায়ীভাবে অতিথিশালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল, সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক, তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে

হয় নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে-শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না, আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, যতই তা কঠিন হোক-না কেন, তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এইজন্য ভর্ৎসনা করতেন, বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, আর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁকে, বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল। যখন নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া— আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি— কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে— এইসব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে। একসময়ে নজরে পড়ল জনশূন্য মাঠের মাঝে ভাঙা-পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর— তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভালো লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম। তার পর কত বছর গেছে, প্রতিবারই

বোলপুর-কলকাতা যাতায়াতের সময় সেই পদ্মপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই— পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে আর ফোটে না।

কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা— প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন-কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয় নি।

মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম ; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম। একমাস ধরে তিনি অহোরাত্র মার সেবা করেছেন, নার্স রাখতে দেন নি, শ্রান্তিতে শরীর মন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা-ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।'

এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বাবা বিদ্যালয়ের কাজে আরো যেন মন ঢেলে দিলেন। কাজের ফাঁকে নিভৃতে বসে শোকদগ্ধ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করলেন গুটিকতক কবিতায়— যা বই আকারে পরে বেরিয়েছিল 'স্মরণ' নাম দিয়ে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে বাবার পক্ষে অতিথিশালায় থাকা কষ্টকর হল। তিনি আশ্রমের বাইরে খানিকটা জমি নিয়ে সেখানে কয়েকটি খোড়ো-ঘর তৈরি করালেন। আমরা সেখানে উঠে গেলুম। এই ঘরগুলিকে আশ্রমের লোকেরা 'নতুন বাড়ি' নাম দিল। পরে বাবা নিজের জন্য একটি ছোটো পাকা-ঘর এরই পাশে প্রস্তুত করালেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'দেহলী'। মায়ের গ্রাম-সম্পর্কে পিসিমা— রাজলক্ষ্মী দেবী— আমাদের ভাঙা সংসার চালাতে লাগলেন।

মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই আমার ছোটোবোন রানী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে ; মা থাকতেই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার ভগ্নীপতি সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন বিলাতে। ডাক্তারি পড়বার জন্য বাবা তাঁকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। রানীর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ভার বাবাকে সম্পূর্ণ নিতে হল। ডাক্তাররা ক্ষয়রোগ বলে সন্দেহ করলেন এবং পরামর্শ দিলেন বিলম্ব না করে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় রানীকে নিয়ে যেতে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তখন সবে গড়ে উঠছে, বিদ্যালয় ছেড়ে বেশি দিনের জন্য অনুপস্থিত থাকা বাবার পক্ষে খুব কঠিন সমস্যা হল। বিদ্যালয়ের পরিচালনার সুব্যবস্থা করতে পারলেন না, তার আগেই রানীকে নিয়ে হাজারিবাগে যেতে হল। সঙ্গে গেলেন রাজলক্ষ্মী দিদিমা, আমার মামা ও বোন মীরা। ছোটো ভাই শমীকে নিয়ে আমি রয়ে গেলুম আশ্রমে।

হাজারিবাগে রানীর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা গেল না। তাকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া বাবা স্থির করলেন। আলমোড়াতে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু আলমোড়ায় যাবার পথ দুর্গম, ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে কাঠগুদাম থেকে ষাট-সত্তর মাইল যেতে হত। অনেক বাধা বিপদ কাটিয়ে বাবা

রানীকে নিয়ে আলমোড়ার পাহাড়ে কোনোমতে পৌচেছিলেন। রানীর জন্য একটিমাত্র ডাণ্ডি পাওয়া গিয়েছিল। বাবা নিজে কাঠগুদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত চড়াই-উৎরাইয়ের রাস্তা ভেঙে বরাবর পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। রানীকে দেখাশুনার জন্য পরে আমার মামা ও রাজলক্ষ্মী দিদিমাকে আনিয়ে নিয়েছিলেন।

মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় তখন বাবার কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় বাবা মোহিতবাবুকে আলমোড়ায় আসতে নিমন্ত্রণ করেন। মোহিতবাবু সেখানে গেলেন। কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা তো হলই, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধেও অনেক কথাবার্তা হল। বিদ্যালয় যে আদর্শে বাবা গড়ে তুলতে চান তার প্রতি মোহিতবাবুর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যথেষ্ট উৎসাহ আছে, বাবা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নেবার জন্য মোহিতবাবুকে অনুরোধ করলেন। তিনি খুশি হয়ে রাজি হলেন এবং আলমোড়া থেকে ফিরে গিয়েই যত শীঘ্র সম্ভব এই কাজের ভার গ্রহণ করবেন, বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাবার একটা মস্ত দুশ্চিন্তা দূর হল। বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিরুদ্‌বেগ হলেন, উদ্‌বেগ রয়ে গেল রানীর জন্য। পাহাড়ে গিয়েও তার স্বাস্থ্যের উন্নতির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, বরং আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ল।

রানীর রোগ ধরা পড়ার আগেই আমি কলকাতায় গিয়ে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে আসি। পরীক্ষার ফল বের হতে বেশ দেরি হয়। সেই দু-তিন মাস চুপচাপ আশ্রমে থাকতে হবে মনে করে ভালো লাগছিল না। শিলাইদহের দিকে মন ছুটেছিল। মা-বাবার সঙ্গে সেই যে আমরা সব কটি ভাইবোন একত্রে আনন্দে দিন কাটিয়েছি সেই-সব ছেলেবেলাকার সুখস্মৃতি মনে পড়তে লাগল— বিরাট পদ্মানদী, দুধারে তার বালুরাশি, বুনো হাঁসের কলধ্বনি, 'পদ্মা বোট' ও তার তপসি মাঝি, গোলাপ-বাগান-ঘেরা কুঠিবাড়ি, তার চার দিকে সরষে-খেতের সোনালি রঙ। অনেকদিন যাই নি, সেখানে যাবার জন্য বড্ড ইচ্ছে করতে লাগল। বাবাকে সে কথা জানাতে সাহসে কুলোল না। সুরেনদাদাকে ধরলুম। তিনি বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, আমি ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলুম বাবা বলছেন, 'সুরেন, আমার হাতে যে টাকা নেই, রথীর

রেল-টিকিট কিনে দেব কী করে?' শুনে আমার খুবই লজ্জা ও কষ্ট বোধ হল, মনে হল এ প্রস্তাব না করলেই হত। মন দৃঢ় করে আশ্রমেই থাকার জন্য প্রস্তুত হলুম। গ্রীষ্মের ছুটি হতে সবাই চলে গেল, আমি সেখানে থেকে গেলুম। আমার কাছে রইল শমী।

একদিন বাবার টেবিলের উপর চামড়ায় বাঁধানো সুন্দর খাতা একখানা রাখা রয়েছে দেখলুম। খুলে দেখি, বিবিদিদিকে লেখা বাবার চিঠির নকল। খাতা ভর্তি করে বিবিদিদি নিজের হাতে সব চিঠি নকল করে রেখেছেন। পড়বার খুব কৌতূহল হল। আহারাদি করে দুপুরবেলায় খাতাটি নিয়ে বেরোলুম কোনো নির্জন জায়গার সন্ধানে। মন্দিরের পাশে একসময় একটি পুকুর খোঁড়ার বৃথা চেষ্টা হয়েছিল। তারই রাশীকৃত তোলা মাটি দিয়ে একদিকে বেশ বড়ো বড়ো তিনটি ঢিবি তৈরি হয়েছিল। আমরা সেগুলিকে পাহাড়ই বলতুম। মাঝের পাহাড়টিতে মস্তবড়ো একটা বটগাছ ছিল। তারই তলায় ছিল একটি গুহা, সামনে শ্বেতপাথরের ছোটো একটি তোরণ। জায়গাটি খুব নির্জন দেখে একটা ডেক-চেয়ার নিয়ে এসে তাতে আরামে বসে বাবার লেখা চিঠিগুলি পড়তে লাগলুম। তখন বৈশাখ মাস। দুপুরবেলায় সেখানে যখন গিয়ে বসতুম ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, সামনের খোলা মাঠের উপর কাঁপতে কাঁপতে গরম হাওয়া আকাশে উঠছে, জনপ্রাণী কোথাও নেই, কেবল কখনো কখনো দু-একটা গোরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে গ্রামের পথে। পশ্চিমের আম-বাগানে একটি কোকিল নিরন্তর ডেকে চলেছে। আমি পড়ে যেতে লাগলুম চিঠিগুলি। চিঠিগুলির অধিকাংশই শিলাইদহ বা পতিসর থেকে লেখা। প্রতি চিঠিতেই সেই অঞ্চলের বর্ণনা—

'দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধূ ধূ করছে; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছু··· পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের হাটে থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহু দূরে পাবনার পারের তরুশ্রেণী ঘননীল রেখার মতো দেখা যায়— কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, আর মাঝখানে এই রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে শাদা।'

'জলে চর ভেসে গেছে— মানুষপ্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর

দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম; পাল তুলে দিলে। দু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীলমেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জনশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী চমৎকার সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না।'

'এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী-সুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।'

পাতার পর পাতা আমার সেই অতিপরিচিত শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরের প্রাকৃতিক বর্ণনা। পড়তে পড়তে ভুলে গেলুম আমি রোদে-পোড়া বীরভূমের লালমাটির ডাঙায় এক গাছতলায় বসে আছি— মনে হল যেন চোখের সামনে দেখছি সেই ভরা নদীর ধারে বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবী শিলাইদহের সেই ঘাট, সেই নৌকো, সেই নারকেল ও আমের বাগান, পরপারের সেই তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা। সেখানে যেতে পারি নি বলে মনের মধ্যে যে আক্ষেপ সঞ্চিত হয়েছিল সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে। রোজ দুপুরবেলায় খাতাটি নিয়ে বটের ছায়ায় বসে চিঠি-গুলি উল্‌টে-পাল্‌টে আমার স্মৃতিচারণ চলতে লাগল।

এইরকম স্বপ্নের মধ্যে একেবারে ডুবে আছি, এমন সময় নিদারুণ সংবাদ এল— সত্যদাদা টেলিগ্রাম করেছেন রানীর মৃত্যু হয়েছে। আলমোড়ায় তার স্বাস্থ্যের উন্নতি না দেখে, বাবা তাকে আবার কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তাররা বলেছিল এই রোগে রোদ লাগানো ভালো, তাই কলকাতায় এসে 'বিচিত্রা' বাড়ির ছাদে বাবা রানীর জন্য চার দিকে কাচ-দেওয়া একটি ঘর প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিলেন। সবই ব্যর্থ হল, রোগ ঠেকানো গেল

না, মায়ের মৃত্যুর ঠিক নয় মাস পর রানী চলে গেল। শুনেছি, যাবার আগে সে বলেছিল— 'সব অন্ধকার হয়ে আসছে, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। বাবা তুমি 'পিতা নোহসি' মন্ত্র পড়ে শোনাও।'

মহর্ষি পার্ক স্ট্রীটে তিনকোনিয়া তলাও-এর (এখন যার অ্যালেন গার্ডেন নাম হয়েছে) কাছে একটা ভাড়াটে দোতলা বাড়িতে থাকতেন। আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে সেখানে গিয়ে বাস করছিলেন। জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা জুড়ে যে বৃহৎ ঠাকুর-পরিবার শহরের একটি অংশ অধিকার করে রেখেছিল— আমাদের বাড়ি ছিল তার কেন্দ্রস্থলে। সেখানে বাস করলে আত্মীয়তা ও সামাজিকতার দাবি তাঁকে ক্লিষ্ট করত, তাই আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে পার্ক স্ট্রীটের অপেক্ষাকৃত নির্জনে তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন; সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ না করেও সংসারের জটিলতা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হত।

পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির মালিক ছিলেন একজন ইহুদি। অনেক বছর ধরে সদ্‌ব্যবহারের পর হঠাৎ তিনি মহর্ষির সঙ্গে অসদ্‌ব্যবহার করলেন। তাঁর কোনো কথায় মহর্ষি বিরক্ত হয়ে তখনি সেই বাড়ি ছেড়ে দেবেন স্থির করলেন। জোড়াসাঁকোয় খবর এল। চার দিকে হৈচৈ পড়ে গেল। তেতলায় যে ঘরগুলিতে আমরা থাকতুম, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেলুম। মহর্ষির জন্য সেই ঘরগুলি সংস্কার করে, নতুন করে সাজানো হল। সব যখন প্রস্তুত, মহর্ষিকে কী করে আনা হবে পরামর্শ চলতে লাগল। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ধরলেন তাঁর জুড়ি-গাড়িতে তিনি তাঁকে নিয়ে আসবেন। মহর্ষি বহু বছর পরে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ফিরে আসছেন— সে কী ঘটা! মহারাজার গাড়িতে মহর্ষি বসে, পিছনে সারবন্দি গাড়ির মিছিল। বরকে বিয়েবাড়িতে সমারোহ করে যেমন অভ্যর্থনা করা হয়, সেইরকম মহর্ষিকে দেউড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর পুনরাগমন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেন নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।

এই সময় শশী হেস নামে একজন আর্টিস্ট বিলাত থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন। বহু বছর ধরে প্যারিসে আর্টের চর্চা করে ফরাসি স্ত্রী সঙ্গে করে

এনে বালিগঞ্জে বাসা বাঁধলেন। কিন্তু ছবি এঁকে, আমাদের দেশে পেট ভরে না। লোকটি অত্যন্ত সরল ও সহৃদয়, ছবিও আঁকেন ভালো দেখে, বাবা মেজজ্যাঠামহাশয় প্রভৃতি আমাদের বাড়ির অনেকেই, তিনি যাতে ছবির অর্ডার পান তার সাহায্য করতে লাগলেন। মহর্ষি জোড়াসাঁকোয় এলে সকলে ঠিক করলেন হেমকে দিয়ে তাঁর একটি প্রমাণ সাইজ তৈলচিত্র করাতে হবে। হেম রোজ আসতে লাগলেন ছবি আঁকতে। অবনদাদাও এসে সেখানে বসতেন। মহর্ষির অভ্যাস ছিল সকালবেলায় তেতলার পশ্চিম বারান্দায় একটি আরাম-চেয়ারে বসে থাকা। তিনি বাঁ দিকে একটু হেলে যেভাবে বসে থাকতেন, হেম ঠিক তারই একটি প্রতিকৃতি আঁকলেন। ছবিটি খুব ভালো হল, মহর্ষির শান্ত সমাহিত ভাব চমৎকার তাতে ফুটে উঠেছিল। তাঁর যত ছবি আছে, হেমের আঁকা এই ছবি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ছবিখানা এখন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

মহর্ষির দৃষ্টিশক্তি তখন ক্ষীণ হয়েছে, কানেও ভালো শুনতে পান না। আমরা প্রত্যহই তাঁকে প্রণাম করতে যেতুম। তাঁকে উচ্চকণ্ঠে নাম না বলে দিলে, তিনি কাউকে চিনতে পারতেন না। এই অবস্থাতেও বহু লোক তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসত। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাঁদের মহর্ষির কাছে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর মারফতেই যেটুকু সম্ভব কথাবার্তা হত।

১৯০৫ সালের পৌষ মাস। বাবা তখন শিলাইদহে। মহর্ষি অসুস্থ শুনে তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে এলেন। আত্মীয়রা যে যেখানে ছিলেন সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পড়লেন। অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা চলতে থাকল। মহর্ষিকে সেবা করা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রেষারেষি ও পরে মন-কষাকষিও চলেছিল। মহর্ষির শারীরিক যন্ত্রণা কোনোকিছুতেই কমল না। সাহেব ডাক্তার এসে অপারেশন করে গেলেন। তাতেও উপকার হল না। রুগ্ণ অবস্থাতেও অসহ্য যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে মহর্ষি প্রত্যহ দক্ষিণের বারান্দায় উঠে গিয়ে তাঁর চিরাভ্যস্ত উপাসনার পর অনেকক্ষণ ধ্যানে বসে থাকতেন। ৬ই মাঘ সকালবেলায় তিনি আর উঠতে পারলেন না, ঘরেই বিছানায় শুয়ে রইলেন। বাবা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' —শুনতে শুনতে দুপুরবেলায় তিনি শেষবারের মতো চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর

মুখে ফুটে উঠেছিল একটি পরম আনন্দ ও পরম শান্তি— তিনি বিশ্বপিতার কোলে আশ্রয় পেয়ে যেন অসীম তৃপ্তি পেলেন।

মহর্ষির মৃত্যুর কয়েকদিন পরে বাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। মহর্ষির আশীর্বাদ নিয়ে, তাঁর কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— সেই বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে তিনি এখন সব মন ঢেলে দিলেন। ছেলেবেলা থেকেই বাবা মহর্ষির অপরিসীম স্নেহ পেয়েছিলেন। বাবা যখন নিতান্ত বালক, মহর্ষি তাঁকে নিয়ে লম্বা সফরে বেরিয়েছিলেন— কলকাতা থেকে বোলপুর হয়ে একেবারে ডালহৌসি পাহাড়। মহর্ষির কাছেই তাঁর প্রথম শিক্ষা। তাঁর কাছ থেকেই ধর্মদীক্ষা পেয়েছিলেন।

মহর্ষির মৃত্যু বাবাকে নিদারুণ আঘাত হানল। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল না শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়া। মহর্ষিরই ঈপ্সিত কাজ মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যালয়ের কাজ দেখতে লাগলেন।

এই সময় বাবা থাকতেন দেহলীতে। তার সংলগ্ন 'নতুন বাড়ি'তে মীরা, শমী ও আমি তিন ভাইবোন রাজলক্ষ্মী দিদিমার স্নেহ ও যত্নের মধ্যে থেকে পড়াশুনা করতে লাগলুম। এইভাবে একবছর যেতে না যেতেই বাবা স্থির করলেন, আমাকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবেন। সহপাঠী সন্তোষ মজুমদার আমার সঙ্গে যাবে। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা দুজনে রওনা হলুম।

আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ কৃষি-কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে লাগলুম। শান্তিনিকেতন ছেড়ে সম্পূর্ণ পৃথক এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লুম। দেশের সঙ্গে, বাড়ির সঙ্গে একমাত্র যোগ সপ্তাহ অন্তর ডাকের চিঠি। ডাকের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতুম। দিদিমার চিঠিতে থাকত 'নতুন বাড়ি'র ঘরসংসারের খুঁটিনাটি কথা। সেদিনকার মতো কলেজের লেকচার, ল্যাবরেটরির কাজ ভুলে যেতুম— মনে হত দিদিমার পিছনে পিছনে নতুন বাড়ির এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়িয়ে ঘরকন্নার কাজে আমিও তাঁকে সাহায্য করছি। ভাই শমীর চিঠিতে আশ্রমের খবর পেতুম। তার বন্ধুরা কে কী করছে, তার নিজের পড়াশুনা কেমন চলছে— এ ছাড়া কখন কোন্ গাছে কী

ফুল ফুটছে, জ্যোৎস্নারাতে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে, ছাত্রদের সভায় সে কোন্ কবিতা আবৃত্তি করেছে ইত্যাদি নানারকম খবর বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে আমাকে লিখত।

হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো একদিন বাবার কাছ থেকে এক চিঠি এল শমী আর নেই! আমার বয়স মাত্র সত্তেরো, বাড়ি থেকে বহুদূরে বিদেশে রয়েছি —এই সাংঘাতিক খবর পেয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল বাবার কাছে। তাঁর কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলুম। শমী যে নেই, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারলুম না। আমেরিকা রওনা হবার আগে সে ছুটির সময় আমার কাছ-ছাড়া হত না, দুপুরে শুয়ে কতরকমের কথা, কতরকমের গল্প হত দুজনায়। সে যেন বুঝেছিল আর দেখা হবে না। অত অল্প বয়সেই তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার রসগ্রাহী মনের পরিচয় পেয়ে আমি মাঝে মাঝে চমকে উঠতুম। বড়ো হলে সে যে কবি হবে, বাবার প্রতিভা তার মধ্যেই প্রকাশ পাবে, আমার সন্দেহ ছিল না।

অন্তরে যতই আঘাত পান— বাইরে তা কখনো বাবা প্রকাশ করতেন না। শমীর মৃত্যুর সময় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন কী শান্তভাবে বাবা তাঁর এই ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট সংবরণ করেছিলেন। এই বিষয়ে মহর্ষির মতোই তাঁর আত্মসংযম ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে যারা প্রিয় তাদের একে একে হারালেন। তাঁর জীবনব্যাপী সুতীব্র দুঃখতাপের মধ্যেও তিনি বিধাতার মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখতে পেরেছিলেন, সংসারের নানান অভিঘাতেও নিজেকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেন নি।

পর পর এই তিনটি মৃত্যুতেও বাবার দুঃখের অবসান হয় নি। শমীর মৃত্যুর পর কয়েকবছর গেল যখন আমাদের সংসার সুখদুঃখের মধ্যে একরকম চলেছিল —মৃত্যু যে তখনো আশেপাশে উঁকি মারছে তা জানতে পারা যায় নি। যেখানে আশঙ্কার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সেখান থেকেই এল আঘাত। আমার দিদি থাকতেন তখন কলকাতায়; কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় থাকার পর বোঝা গেল তাঁর ক্ষয়রোগ হয়েছে। ১৯১৮-র মে মাসে তাঁর মৃত্যু হল। এই নিদারুণ আঘাতও বাবা নীরবে সহ্য করেছিলেন।

দিদি আমাদের সকলের বড়ো ছিলেন। তবে আমরা দুজন পিঠাপিঠি ছিলুম বলে আমি তাঁকে সমবয়সী মনে করতুম এবং তাঁর ডাকনাম, 'বেলা' বলেই ডাকতুম। তাঁর যখন বিয়ে হল, মা আমাকে ধমকে দিলেন— 'এখন কখখনো নাম ধরে ডাকবি নে, 'দিদি' বলবি।' যদিও তখন থেকে দিদি বলতে লাগলুম, আমাদের দুজনের কারো সেটা পছন্দ হত না— যেন প্রীতির অন্তরঙ্গতার মধ্যে কেমন বাধা দিত। আমি বাবা-মার আড়ালে দিদিকে দেখলেই ডাকতুম— 'বেলা'। দিদিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করে জবাব দিত— তার পরেই দুজনে হেসে ফেলতুম।

আর-সব ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাবা দিদিকে বেশি ভালোবাসতেন। আমরা সেটা খুবই জানতুম, কিন্তু তার জন্যে কোনোদিন ঈর্ষা বোধ করি নি; কেননা আমরাও সকলে দিদিকে অত্যন্ত ভালোবাসতুম এবং মানতুম! দিদির বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তা মানতে আমাদের লজ্জাবোধ হত না। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সেইজন্য বাড়ির সকলের কাছ থেকে প্রচুর আদর পেতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন। শিলাইদহে আমাদের যখন পড়াশুনা আরম্ভ হল, দিদি আমাদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যেতে লাগলেন। বাবা তাঁকে নিজে পৃথক করে পড়াতে শুরু করলেন। তখন থেকেই বুঝেছিলেন দিদির লেখবার বেশ ক্ষমতা আছে। বাবা তাকে উৎসাহ দেওয়াতে পরে তিনি কয়েকটা গল্প লিখেছিলেন।

দিদিকে সকলে ভালোবাসত আরও একটি কারণে। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত স্নেহশীল। তাঁর এই সরল স্নেহময় স্বভাব সম্বন্ধে ছেলেবেলাকার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বাবা একসময় বিবিদিদিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'কালকে বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল— ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতালার ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলুম। বেলা ছোটো বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, 'বাবা, একজন ভারী গরিব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নীচের বাংলায় বসে ছিল, তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে!' বার বার করে বলতে লাগল, 'বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু

কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না, তার শীত করে। সে তো কিচ্ছু দোষ করে নি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বললে। বললে, সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু বললে না! অমনি চলে গেল!'— আমার এমনি মিষ্টি লাগল! বেলিটার বাস্তবিক ভারী দয়া। কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে— এই অনর্থক নিষ্ঠুরতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল! শুনে আমার মনটা ভারী আর্দ্র হয়েছিল। বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে।'

আমার ভগ্নীপতি, কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন। বিয়ের পর বাবা দিদিকে নিয়ে স্বামীগৃহে পৌঁছে দিয়ে এলেন। জামাইয়ের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হতে বাবার তাঁকে খুব ভালো লাগল। তিনি মাকে লিখলেন, 'এমন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না।' এমন জামাইয়ের কাছে মেয়েকে রেখে এসে বাবা নিশ্চিন্ত হলেন, দিদি যে তাঁর স্বামীর সংসারে সুখী হবেন তাঁর মনে সংশয় রইল না। কিন্তু মন কি মানে? শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তাঁর কেবলই 'বেলার শৈশবস্মৃতি' মনে পড়তে লাগল— 'তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কিরকম দৌরাত্ম্য করত— সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কিরকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত— কিরকম লোভী অথচ ভালোমানুষ ছিল— আমি ওকে নিজে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম— দার্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম— যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেইসব কথা বার বার মনে উদয় হয়।'

মজঃফরপুরে শরৎবাবুর প্র্যাক্‌টিস ভালোই জমেছিল। অমন বুদ্ধিমান ছেলের কলকাতার হাইকোর্টে এলে আরো উন্নতি হবে মনে করে বাবা তাঁকে ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন। হয়তো বা মনে মনে ইচ্ছা ছিল দিদি কলকাতায় কাছাকাছি থাকলে তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হতে পারবে। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কলকাতায় এসে শরৎবাবু যখন প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন, বাবা দিদিদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শরৎবাবুর হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস যখন জমে উঠল, তাঁরা ডিহি-শ্রীরামপুর

রোডের এক বাড়িতে উঠে গেলেন। সেখানে যাবার কিছুদিন পরে দিদির রোগ দেখা দিল। বাবা তখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় এসে রইলেন। প্রত্যহ দিদির কাছে যান, তাঁর সঙ্গে সারা দুপুর গল্প করেন, নতুন গল্পের প্লট তাঁকে বলে দেন, লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি বই দেখে বদলে বদলে ওষুধ দেন। দিদির জন্য তাঁর মন সর্বদাই অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে যখন কাজে বসেন বা অভ্যাগত পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর মনের অবস্থা কাউকে বুঝতে দেন না। তখন 'বিচিত্রা ক্লাব' ও 'সবুজ পত্র'র যুগ চলেছে। বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যহই লোকসমাগম হয়— সাহিত্য-আলোচনা, গান-বাজনা কত কি অহরহ লেগেই আছে। প্রমথ চৌধুরীর বালিগঞ্জের বাড়িতে 'সবুজ পত্র'র বৈঠক বসেছে। বাবা সবতাতেই যোগ দেন, কোনো বিষয়েই তাঁর উৎসাহের কমতি কেউ লক্ষ্য করে না।

দিদির অসুখ ক্রমশ বাড়তে লাগল। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি কোনো চিকিৎসাতেই কিছু উপকার হল না।

এই সময়ে বাবাকে শান্তিনিকেতনে কোনো কাজে যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে একদিন আমাকে লিখলেন—

'কাল থেকে কলকাতায় যাবার জন্যে মনটা দ্বিধা করচে। কিন্তু আজকাল আমার হৃদয় ভারি দুর্বল আছে। জানি বেলার যাবার সময় হয়েচে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবন-মৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখানে থেকে বেলার জন্যে যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করচি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।'

কিন্তু কলকাতায় না এসেও পারলেন না। শেষদিন পর্যন্ত রোজ দুপুরে দিদির কাছে যেতে লাগলেন। সেদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ— যখন ডিহি-শ্রীরামপুর রোডের বাড়ি পৌছলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যা হবার তা হয়ে গেছে, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় 'বিচিত্রা'র বৈঠক ছিল। বাবা সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্পসল্প যেমন করেন সেদিনও তাই করলেন। তাঁর কথাবার্তা থেকে একজনও কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে না যে, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, মনের কী অবস্থা নিয়ে বাবা তাঁদের সঙ্গে সদালাপ করছেন!

নীতু ছিল আমার বোন মীরার একটিমাত্র ছেলে। সে জার্মানিতে ছাপার কাজ শিখতে যায়। ১৯৩২ সালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর বাবা মীরাকে যে চিঠি লেখেন তার কতক অংশ নীচে উদ্‌ধৃত করছি। পড়লে বোঝা যাবে তিনি দুঃখ, কষ্ট, সকল রকমের আঘাত কী ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন এবং কী ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতেন।

মীরাকে লিখছেন—

'এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে— এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্ব-ব্যাপী কালের হাত কাজ করচে। আর সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি— শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।— নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব।··· যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ

ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়— যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।’

স্বদেশী আন্দোলন

বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই দেশের দুরবস্থার কথা ভেবে বাঙালির মন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, প্রতিকারের উপায় উদ্‌ভাবন করতে না পেরে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ গুমরে উঠছিল। ১৯০৫ সালে সেটা ব্যাপকভাবে পোলিটিক্যাল আন্দোলনে পরিণত হল। দেখতে দেখতে দেশময় তার আগুন ছড়িয়ে গেল।

স্বদেশপ্রীতি আমাদের বাড়িতে নতুন নয়। আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর যদিও ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট রাখতেন, তাদের বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই ভোজ খাওয়াতেন, বিলাতে ধনী পরিবারদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর ভারতবর্ষীয় বেশ কখনো ছাড়েন নি বা ভারতীয় চালচলনের পরিবর্তন করেন নি। দ্বারকানাথই ভারতবর্ষে প্রথম দেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশী জাহাজ কোম্পানি করে বিদেশের সঙ্গে কারবার করেন। এমন-কি তার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে হটিয়ে দিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইজারা নিয়ে, দেশী শাসন-বিধান প্রচলন করেন।

মহর্ষির আমলেও কোনো বিদেশী ভাব, আচার-অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে নি। যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রভাব বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে দ্রুত বিস্তারলাভ করতে লাগল, রামমোহন রায়ের অনুবর্তী হয়ে মহর্ষি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আমার জ্যাঠামহাশয়রা সকলেই দেশভক্ত ছিলেন। নানান অনুষ্ঠানের দ্বারা বাংলার সাহিত্য, সংগীত, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বাদেশিকতায় লোককে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার দিনে ভারতীয় আই. সি. এস.-রা উগ্ররকমের সাহেব বনে যেতেন। মেজজ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী ছিলেন, তবু তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানা মোটেই ছিল না। তিনিই প্রথম ভারতের জাতীয় সংগীত লেখেন— "মিলে সবে ভারত-সন্তান"। এই গানটি হিন্দুমেলায় প্রথম গীত হয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

বাবার জীবনস্মৃতিতে তাঁর বালক অবস্থায় আমাদের পরিবারে কী রকম স্বাদেশিকতার হাওয়া বইত তার বর্ণনা আছে। দেশলাই তৈরি করে স্বদেশী শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল, স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে নতুন-জ্যাঠামহাশয় কী রকম ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন তারও কথা লিখেছেন। স্বদেশপ্রেম আমাদের বাড়ির সকলের মধ্যেই মজ্জাগত ছিল। তাই বাংলায় যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তার সাড়া পড়তে বাধা পায় নি, সকলেই এই আন্দোলনে পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হত তা হলে জ্যাঠামহাশয়রা বা বাবা তত উৎসাহ পেতেন কি না সন্দেহ। বাঙালির অন্তরে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছিল, দেশসেবার যে একান্ত ইচ্ছা দেখা গিয়েছিল, তার মধ্যে ভাবপ্রধান আদর্শের যথেষ্ট লক্ষণ ছিল বলেই তাদের আকৃষ্ট করেছিল— দেশের লোকের সঙ্গে এই আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পেরেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শান্তিনিকেতনে পৌঁছতে দেরি হয় নি। অন্যান্য ছাত্রেরা নিতান্ত বালক, সন্তোষচন্দ্র ও আমি তার মধ্যে বড়ো। আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলুম। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে প্রত্যহ ভোরবেলায় গ্রামে চলে যেতে লাগলেন উষাকীর্তন করতে। বাবা তখন স্বদেশী গান তৈরি করছেন। এক-একটি গান বাঁধা হয় দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী বাবার কাছ থেকে সেগুলি শিখে নিয়ে, দেশময় ছড়িয়ে যাবার আগেই, শান্তিনিকেতনের চার দিকের গ্রামে সেগুলি প্রথম পরিবেশন করে আসেন। আমরা দুজনেও তাদের পেছু পেছু যেতুম। গানগুলির বাউল সুর বীরভূমের গ্রামবাসীরা সহজেই ধরে নিত। তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত, মিছিল ক্রমশই বড়ো হতে লাগল। ভিক্ষের ঝুলি থাকত সঙ্গে। শূন্য হাতে আমাদের ফিরতে হত না।

ঠিক এই সময় একটি ঘটনাতে আমাদের উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। রুশ-জাপানের যুদ্ধের খবর আমরা তখন আগ্রহের সঙ্গে কাগজে পড়ছি আর বড়ো ম্যাপের উপর পিন দিয়ে তার গতিবিধি চিহ্নিত করে রাখছি। একদিন খবর এল জাপানিরা পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশের নৌবলের যত যুদ্ধজাহাজ ছিল সব বন্দী করেছে। তার পরেই জানতে পারলুম, যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, রুশ সম্পূর্ণ হার স্বীকার করে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করেছে। সেদিন আমাদের কী আনন্দ,

কী উচ্ছ্বাস ! এশিয়ার একটি নবজাগ্রত ক্ষুদ্র দেশ ইয়োরোপের প্রবল রুশদেশের দম্ভ এমনভাবে চূর্ণ করে দিল, সে কি কম কথা ! জাপানের জয় পূর্ব-মহাদেশেরই জয় মনে করে আমাদের বুক ফুলে উঠল। সেদিন আর ইস্কুল হল না। সমস্ত-দিন ধরে আমরা কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলুম। খেলার মাঠের মাঝখানে সেগুলি স্তূপীকৃত হল। আর বানানো হল শ-খানেক মশাল। সন্ধ্যা হতে, কাঠে আগুন ধরিয়ে bonfire জ্বালিয়ে, হাতে মশাল নিয়ে আগুনের চার দিকে আমাদের তাণ্ডবনৃত্য আর ঘন ঘন 'বান্জাই' ধ্বনিতে শান্তিনিকেতন মুখরিত হয়ে উঠল। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক ছুটে এল এই জয়োৎসবে যোগ দিতে।

যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করার ফলে আমাদের দেশের লোকের মন বেশ নাড়া খেল। নিজেদের অধীনতার অপমান আমাদের পীড়া দিতে লাগল। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঠিক এই থেকে না হলেও, জাপানের কাছে রুশের পরাজয় আমাদের মনে স্বাধীনতা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘটনাক্রমে এই সময় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই হোরি সান নামে একটি যুবক সেখানে বাস করতে এলেন। তিনি নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন, শান্তিনিকেতনে এলেন সংস্কৃত ও পালি অধ্যয়ন করতে। তাঁর শান্তশিষ্ট বিনম্র স্বভাব আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত আশ্রমে কয়েকমাস মাত্র বাস করার পর পাঞ্জাবে বেড়াতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে জাপানিদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

তার পর ওকাকুরার সাহায্যে বাবা জাপান থেকে আনালেন একজন জুজুৎসু-শিক্ষক। তাঁর নাম সানো সান। তাঁর কাছে সন্তোষচন্দ্র ও আমি জুজুৎসু শিখতে লাগলুম। সানো সান খুব যত্ন করে আমাদের শেখালেন। আমরাও আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শাগরেদি করলুম। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই যদি করতে হয় তবে জুজুৎসু কাজে লাগবে বলে আমাদের ধারণা ছিল।

তখন গ্র্যাণ্ড কর্ড -এর রেললাইন তৈরি হচ্ছে। সন্তোষচন্দ্রের পিতা শ্রীশচন্দ্র

মজুমদার মহাশয় ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কলেক্টর হিসাবে রেল-কোম্পানির জন্ত জমি দখল করছেন। গিরিডিতে তাঁর হেড আপিস। ইস্কুলের ছুটি হতে তাঁর বারগাণ্ডার বাড়িতে আমরা গিয়ে রইলুম।

গিরিডি নিতান্ত ব্যবসায়ীদের শহর। বাংলাদেশ থেকে আমরা গেছি। সেখানে স্বদেশী আন্দোলনের কোনো চিহ্ন না দেখে নিরাশ বোধ করতে লাগলুম। বারগাণ্ডায় যে কয়জন বাঙালি আছেন তাঁদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য সন্তোষ ও আমি কোমর বেঁধে লাগলুম। সৌভাগ্যবশত দুজনকে পেলুম যাঁদের উৎসাহ দেবার কোনো প্রয়োজন হল না, তাঁরাই বরং আমাদের দেশের কাজে মাতিয়ে তুললেন। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই গিরিডিতে একটি দল গড়ে তুলতে পারলুম। স্বদেশী গান গাইতে গাইতে রোজ সকালে দল বেঁধে শহর প্রদক্ষিণ করে আসতুম। বিকালবেলায় যেতুম বাজারে যেখানে কাপড়ের দোকান। কতকটা অনুনয় করে, বেশির ভাগ ভয় দেখিয়ে বিলাতি কাপড় দোকান থেকে টেনে বের করে রাস্তার উপর আগুন লাগিয়ে দিতুম। মারোয়াড়ি দোকানদাররা স্বদেশীর কী বোঝে, কয়েকদিন বাদে আমাদের দেখলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে লাগল।

এই করে গিরিডি শহরে 'বয়কটে'র উত্তেজনা সঞ্চার করার চেষ্টা করছি এমন সময় সেখানে এলেন পি. মিত্র মহাশয়। কার কাছ থেকে কী খবর পেলেন জানি না, তিনি আমাদের দুজনকে একদিন ডেকে পাঠালেন ডাক-বাংলোতে দেখা করতে। আমরা তাঁর সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতুম না। পরে শুনলুম তিনি কলকাতার হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, কিন্তু আইন-ব্যাবসা তাঁকে আবদ্ধ করে রাখে নি, তিনি বাংলার বিপ্লবপন্থীদের একজন নেতা ও 'অনুশীলন সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক। প্রথমদিনই তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম তিনি উগ্ররকমের ইংরেজ-বিদ্বেষী। ইংরেজ জাত, ইংরেজের সভ্যতা, ভারতে ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে এমন তীব্র সমালোচনা আগে কখনো শুনি নি। যখন ইংরেজদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতেন তাঁর মুখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোত। মিত্র মহাশয় আমাদের বোঝালেন, কেবল ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় পোড়ালে দেশ স্বাধীন হবে না, ইংরেজদের এখান থেকে তাড়াতে হবে, তার জন্ত আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার। তখন 'অনুশীলন সমিতি'র

কথা পাড়লেন— একদল ছেলে স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে কেমন নিজেদের তৈরি করছে। আমাদের দুজনকে সমিতিতে যোগ দিতে হবে জানিয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেলেন।

তার কয়েকদিন বাদে আমরাও কলকাতায় গেলুম। তখন সেখানে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলছে। দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমরা একটি বৈতালিক দল গঠন করে রোজ সকালে স্বদেশী গান গেয়ে ন্যাশন্যাল ফণ্ডের জন্য টাকা তুলতে লেগে গেলুম। বড়ো ভালো লাগত যখন রাস্তার পানওয়ালা বা ফিরিওয়ালারা আমাদের ঝুলিতে পয়সা ফেলে দিত। একদিন মুক্তারাম বাবুর গলি দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছি, একটা বাড়ি থেকে একজন বালক ছুটে এসে আমাদের বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। পুরোনো আমলের বনিয়াদি বাড়ি, ভিতরে মস্তবড়ো উঠান, সেখানে দাঁড়িয়ে গান ধরতেই একটি প্রৌঢ়া, বাড়ির গিন্নি বলে মনে হল, আমাদের দেখে বললেন— 'আহা, বাছারা, কাদের ছেলেরা তোমরা, কেমন মা তোমাদের, এই রোদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে? কচি কচি মুখগুলি যে শুকিয়ে গেছে। এই মা-র ঘরে একটু শরবত খেয়ে যাও, কেমন?' বলে তিনি চলে গেলেন অন্দর-মহলে।

ফিরে এলেন প্রচুর ফল, মিষ্টি, শরবত নিয়ে। আমরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলুম। আমাদের চলে আসার সময় ছলছল চোখে বললেন— 'বাবারা, এবার ঘরে ফিরে যাও।' সংকোচে আমরা টাকা চাইতে পারলুম না। বাড়ি এসে আপসোস করছিলুম টাকা আনা হয় নি বলে, কিন্তু ঝুলি খুলে দেখি তার ভিতর কখানা দশটাকার নোট। বাংলাদেশে পথের বাঁকে বাঁকে মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন, এঁদের স্নেহ এড়িয়ে পথ চলা যায় না, এঁরা না থাকলে লক্ষ্মীছাড়াদের ঝুলি ভরে না, প্রখর রোদে শুকিয়ে-যাওয়া মুখে তৃষ্ণার জল মেলে না। সেদিনকার অপ্রত্যাশিত স্নেহ ও দান পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে গেল, আমাদের সেই অজানা অচেনা মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালুম।

পি. মিত্র মহাশয়কে কথা দিয়েছিলুম 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে পরিচিত হব। কলকাতায় এসে প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে যেতে আরম্ভ করলুম। সুকিয়া স্ট্রীটের পিছনে তাঁদের আখড়া ছিল। আমাদের উপর হুকুম হল, সেখানে

যারা কসরৎ করতে আসে তাদের জুজুৎসু শেখাতে হবে। আমাদের যতটুকু শেখা হয়েছিল সানো সানের কাছে, আমরা অনেককে শিখিয়ে দিলুম। জুজুৎসু ভালোই শিখেছিলুম। কিন্তু দুঃখ থেকে গেছে কখনো ব্যবহার করার সুযোগ পেলুম না। কবে কোন্ ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া হয় অপেক্ষা করে থাকতুম। মারামারি হলে কী কী প্যাঁচে তাকে জব্দ করব মুখস্থ করে রাখতুম।

একবার বর্ধমান স্টেশনে সেই সুযোগ পাওয়া গেছে মনে করে খুব আনন্দ হল। ভোর রাতে ট্রেন বদল করতে হয়েছিল, একটা কামরার দরজায় ধাক্কা দিতে একটি শ্বেতাঙ্গ দরজা খুলেই আমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে এলেন ; আমি তাকে উলটে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি এমন সময় তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করে আমাকে ঘরের মধ্যে তুলে নিলেন। চোর মনে করে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। সেই যাত্রায় জুজুৎসু আর কাজে লাগল না, পরেও কখনো ব্যবহার করতে হয় নি।

'অনুশীলন সমিতি'র আখড়াতে রোজ যাচ্ছি, কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে, এমন সময় একদিন ডাক পড়ল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে আরো চারজন যুবককে ডাকা হয়েছিল। একটি ঘর বন্ধ করে আমাদের বলা হয় 'অনুশীলন সমিতি'র কাজ করতে গেলে শপথ নিতে হবে। শপথ নেওয়া আমাদের ভালো লাগল না, সন্তোষ আর আমি ভেবে দেখবার সময় চাইলুম। অন্য চারজন তখনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। পরে জানতে পেরেছিলুম এই চারজনকে আসাম-সীমান্তের জঙ্গলে কোনো বিশেষ কাজে পাঠানো হয়। তারা আর ফিরে আসে নি।

ছুটি ফুরিয়ে যেতে আমাদের শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে হল। সেখানে গিয়ে পড়াশুনার চাপে 'অনুশীলন সমিতি'র কথা ভুলে গেলুম।

যদিও ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলাদেশে খুব জাঁকিয়ে দেখা দিল, তার ভিত গড়া শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কংগ্রেস বাইরে থেকে কখনো কাতর অনুনয় করে কখনো চোখ রাঙিয়ে স্বায়ত্তশাসন ভিক্ষা করেছে, বক্তৃতামঞ্চ থেকে গভর্নমেণ্টকে উচ্চকণ্ঠে ইংরেজেরই ভাষায় জুজুর ভয় দেখিয়েছে— কিন্তু দেশের লোকের মনে দেশপ্রীতি বা দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করার তেমন কোনো চেষ্টা করে নি। জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ

এমন জেগে উঠেছিল যাঁদের প্রেরণায়, আশ্চর্যের বিষয়, রাষ্ট্রনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই তেমন সম্পর্ক ছিল না। বক্তৃতামঞ্চে হাততালি পাবার বাসনা তাঁদের ছিল না। কবিতা, গান, গল্প-লেখা, ধর্মোপদেশ, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাঁরা মানুষের মনে দেশপ্রীতি সঞ্চার করেছিলেন, তাদের দেশসেবার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এঁদের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই যে দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁরা দুজনেই বিদেশী— কাকুজো ওকাকুরা ও মার্গারেট নোব্‌ল্‌, ভগিনী নিবেদিতা নামে যিনি সুপরিচিত।

ওকাকুরা শিল্পরসিক ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আঘাতে জাপানিরা তাদের আর্টের নিজস্ব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে দেখে তিনি টোকিওতে একটি আর্ট-স্কুল স্থাপন করেন। জাপানের পক্ষে এটা মস্তবড়ো একটা ঘটনা। টাইকান, হিসিদা, কাতসুতা প্রভৃতি বর্তমান শতাব্দীর বিখ্যাত আর্টিস্টরা এই ইস্কুল থেকেই তৈরি হয়েছিলেন। তার পর ওকাকুরা কেন, কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এলেন এবং আর সব জায়গা ছেড়ে বাংলায় কলকাতা শহরেই বা বাস করতে থাকলেন— এর গূঢ়ার্থ কিছু নিশ্চয়ই আছে। তিনি হাই কোর্টের কাছে টেম্পল চেম্বার্সে প্রথম ঘর নিয়েছিলেন। সুরেনদাদার সঙ্গে আলাপ হলে তাদের স্টোর রোডের বাড়িতে উঠে আসেন। বাংলার গুণীমহলে মেলামেশা করার সেখানে সুবিধা হল। সুরেনদাদা এ বিষয়ে তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। দুজনে খুব বন্ধুত্ব হল। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু ও আমার দাদা গগনেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হল। ওকাকুরার কথাবার্তা ও চিন্তাধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ক্রমশ আসতে লাগল দলে দলে যুবকরা। কয়েক মাসের মধ্যে এদের মনে এমন কিছু আদর্শের বীজ তিনি বুনে দিয়েছিলেন যা অঙ্কুরিত হয়ে পরে বাংলাদেশে বিপ্লব এনে দিল। বাংলার নবজাগরণ ঘটিয়ে তোলবার কাজে ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতার কাছে আমরা কতখানি যে ঋণী তা অনুমান করা কঠিন। তার কারণ হচ্ছে এঁরা আলাপ-আলোচনার সাহায্যেই লোকের বুদ্ধিকে মনকে হৃদয়কে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকতেই ভগিনী নিবেদিতার সাহায্যে ওকাকুরা লিখলেন *Ideals of the East*। বইটা অদ্ভুত রকমের ভালো লেগেছিল সকলের। মনে পড়ে তার প্রথম লাইন— 'Asia is one. The

Himalayas divide only to accentuate two mighty civilization…'— পড়ে আমাদের গায়ে কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

ওকাকুরা এসেছিলেন আমাদের দেশে একটি সন্ধিক্ষণে। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কেবলমাত্র শুরু হয়েছে। তিনি ঠিক সেই সময়ে এসে তাঁর কথাবার্তা ও লেখার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য সভ্যতার মহনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিলেন। তিনি অহংকার করে বলে গেলেন ইয়োরোপকে এখনো এশিয়ার কাছে সভ্যতা শিখতে আসতে হবে। তিনি আমাদের নিজেকে চিনতে শেখালেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিদেশী হয়েও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় আচার-বিচার, ভাবধারা, ধর্ম— সব বিষয়ের প্রতিই তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। ভারত যে অধীন হয়ে থাকবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবে ছিল অসম্ভব কর্মপ্রবণতা। যা ভাবতেন তখনি তা কাজে পরিণত না করলে তাঁর স্বস্তি ছিল না। বেলুড়-মঠে বহু লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করা, তাদের মনে স্বাধীনতাকামনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল।

আমাদের দেশে বর্তমান শতাব্দীর সূচনা হল স্বাধীনতার উষাস্বপ্নে। রুশের সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের জয় আমাদের মনে প্রথম এনে দিল আত্মবিশ্বাস। ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতা— এই দুই বিদেশীর উদ্দীপক আলাপ-আলোচনায় আমাদের প্রাণে সাহস এনে দিল। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ স্বদেশীয় কয়েকজন মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা উদ্‌বুদ্ধ হলুম খাটি দেশাত্মবোধে। যে উত্তেজনার আগুন আমাদের বুকের মধ্যে দীর্ঘকাল চাপা ছিল, ১৯০৫ সালে সেটা যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল এবং ক্রমশ দেশপ্রেমের সে আগুন ছড়িয়ে গেল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

কোনো দেশ বা জাতির জীবনে এ রকম উদ্দীপনা এবং দেশের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা কচিৎ আসে। সেই সময়টাতে দেশপ্রেমের আবেগ ও উত্তেজনায় প্রতিদিন দেশোদ্ধারের অভিনব পরিকল্পনা উদয় হচ্ছে নেতাদের মাথায়। সেই-সব কল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য তরুণ স্বেচ্ছাব্রতীরাও এগিয়ে আসত দলে দলে। আমার মনে আছে কোনো কোনো

দিন বাবা ও গগনদাদার সঙ্গে গুপ্ত বৈঠকের উদ্দেশ্যে, সময়ে-অসময়ে আসা-যাওয়া করতেন বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেমচন্দ্র বসু মল্লিক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। কত যে জল্পনা-কল্পনা, কত কানাঘুষো তখন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকত, ভাবতেও অদ্ভুত মনে হয়।

বক্তৃতা, লেখা, সর্বোপরি স্বদেশী গানের মধ্যে দিয়ে বাবা যে এই দেশব্যাপী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী এই উৎসাহকে দেশগঠনের অভিমুখে চালনা করা। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারে এক জনসভায় বাবা 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল— কীভাবে আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে দেশকে আবার নতুন ছাঁদে গড়ে তোলা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গিরিডির একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। শীতকালের সকালবেলা একদিন আমরা শালবনের মধ্যে দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি, শিশিরভেজা ঘাসের উপর ভোরের আলো তির্যকভাবে পড়ে ঝলমল করছে। মনের খুশিতে বাবা গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছেন— হঠাৎ কী খেয়াল হল জানি না, গান থামিয়ে আপন মনে কী যেন ভাবতে লাগলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন যে দেশের আসল সমস্যা হল স্বদেশী শিক্ষার সমস্যা। অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা যতীন বসু ছিলেন আমাদের সঙ্গে— তাঁর দিকে তাকিয়ে বাবা বলতে লাগলেন : দেশের তরুণদের যে-শিক্ষার প্রয়োজন সে-শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারবে না। বাড়িতে ফিরে আসার পরেও খাবার টেবিলে বসে ওই একই বিষয়ে কথা চলতে লাগল। বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন যে, দেশের শিক্ষাসমস্যার একমাত্র প্রতিকার হল স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল, তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হতে তিনি আর থাকতে পারলেন না— সেইদিনই গিরিডি ছেড়ে চলে গেলেন কলকাতা, উদ্দেশ্য— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে এই সময়ে দেশে যে আন্দোলন চলছিল তার নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করা। তাঁরা সাগ্রহে বাবার সঙ্গে একমত হলেন এবং হপ্তাকয়েক বাদে 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর জন্ম হল। কাউন্সিল যে শিক্ষায়তনের সূচনা করবেন তার নিয়মতন্ত্র কেমন হবে,

পাঠক্রম কী হবে— ইত্যাদির খসড়া বাবা নিজেই তৈরি করে দেবেন বললেন। এইভাবে গোড়াপত্তন হল আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। কাউন্সিলের দু-চারটে অধিবেশনে যোগদান করে বাবা কিন্তু বুঝলেন, উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ চাইছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। তফাতের মধ্যে এই, এঁরা হয়তো টেকনোলজির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা যে বিদেশী রীতিপদ্ধতি আমদানি করেছেন, সে সব ভেঙেচুরে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী অথচ আধুনিক কালের উপযোগী একটি অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন— তেমন সৎসাহস এঁদের নেই। যখন বুঝলেন তাঁর পরিকল্পিত স্বদেশী শিক্ষার ব্যবস্থা এঁদের দ্বারা সম্ভবপর হবে না, বাবা কাউন্সিলের সংস্রব একপ্রকার বর্জন করলেন।

সে যাই হোক, বাংলার সেই অগ্নিযুগে বাবা যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একেবারে পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গানে, কবিতায়, অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় তিনি কার্জনের ভেদনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। একদিকে যেমন দেশের লোককে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, অন্য দিকে আবার বারবার বলেছেন ভাই যেন ভাইকে ছেড়ে না থাকে, আত্মমর্যাদায় আস্থা রেখে তারা যেন পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশে তিনি রাখিবন্ধন-উৎসবকে একটি নূতন তাৎপর্য দিলেন। বিপদ-আপদ থেকে ভাইকে রক্ষা করা ছাড়াও, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ঐক্যবন্ধনের যেন প্রতীক হল রাখি। রাখিবন্ধনের দিন এক বিরাট শোভাযাত্রার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন; সহস্র লোকের সঙ্গে কলকাতা শহরময় তাঁর সদ্যোরচিত গান গেয়ে গেয়ে বেড়ালেন—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান…

আর গাইলেন—

বাংলার ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান।

সেদিন ভাবপ্রবণ বাঙালির মনে দেশপ্রেমের যে অভিব্যক্তি দেখেছি, তার তুলনা বিরল।

এরপর স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ যখন সন্ত্রাসবাদের চোরাগলির দিকে পা

বাড়াল, বাবা বুঝলেন তাঁর পথ স্বতন্ত্র। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে একেবারে অসহযোগের যুগ অবধি বাবাকে দেখেছি, তিনি বারবার দেশ গড়বার উপর জোর দিয়েছেন, ভাঙবার দিকে নয়। আর পাঁচজন লোক তাঁকে ভুল বুঝেছে, নিন্দা করেছে, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের পথ ছাড়েন নি। আসলে তাঁর সৃষ্টিশীল মন নিছক ধ্বংসাত্মক প্রমত্ততায় সায় দিতে পারে নি।

১৯২১ সালে সারা দেশ যখন অসহযোগের উত্তেজনায় আচ্ছন্ন, অ্যান্‌ড্রুজকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার একটি বিশেষ ঘটনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—

'মনে পড়ে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় একদিন একদল তরুণ ছাত্র আমাদের বিচিত্রা বাড়ির দোতলায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি যদি তাদের বলি স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে, তা হলে আমার আদেশ তারা নির্বিচারে মেনে নেবে। এ বিষয়ে আমার প্রবল আপত্তির কথা বলতেই তরুণের দল রাগ করে বেরিয়ে গেল, বোঝা গেল মাতৃভূমির প্রতি আমার সত্যকার দরদ আছে কি না, সে বিষয়ে তাদের ঘোরতর সন্দেহ। অথচ এই-সব সাময়িক মোহ ও উত্তেজনার বহুকাল আগে, আমিই একদিন গাঁটের কড়ি খরচ করে হাজার টাকা ব্যয়ে এক স্বদেশী-ভাণ্ডার খুলে আর-পাঁচজনার উপহাসাস্পদ হয়েছিলাম। তখন আমার দেউলে অবস্থা, পকেটে পাঁচটি টাকারও সংস্থান ছিল কি না সংশয়ের বিষয়। তখন যে আমি তরুণ ছাত্রদলকে বিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলতে পারি নি, তার কারণ এই যে নিছক শূন্যতার নৈরাজ্যে আমার আস্থা নেই— তা সে নিতান্ত সাময়িক মুষ্টিযোগ হোক-না কেন। একটা নৈর্ব্যক্তিক নীতিকে আমি জলজ্যান্ত বাস্তবের আসনে বসতে দিতে চাই নে। এই-সব ছাত্রদের আমি দেখেছি রক্তমাংসের জীবরূপে, অশরীরী ছায়ারূপে নয়।'

এই কারণে বাবা অসহযোগকে 'রাজনৈতিক বৈরাগ্য' বলে অভিহিত করেছেন এবং ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেন নি। উদ্ধৃত চিঠির একজায়গায় তিনি অ্যান্‌ড্রুজকে লিখেছিলেন: 'আমাদের দেশের ছাত্রেরা তাদের স্বার্থ বলি দিচ্ছে কোন্ বেদির সামনে? বিদ্যামন্দিরে নয়— অবিদ্যার মন্দিরে।'

এর এক বছর আগে (১৯২০) লেখা একটি চিঠিতে তাঁর স্পষ্টোক্তি উল্লেখ-
-যোগ্য—

'শুনেছি দেশের লোক অসহযোগ নিয়ে বিস্তর মাতামাতি করছে। আমার ভয় হয় এই আন্দোলনও পাছে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। উচিত ছিল এই ভাবাবেগের অবসরে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশসেবার জন্য সরকারনিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

এই কাজে সত্যকার নেতৃত্ব করতে পারেন মহাত্মা গান্ধী। সবাইকে তিনি ডাক দিন এই দেশসেবার কাজে। দেশকে নূতন করে গড়ে তোলবার জন্য সবাইকে বলুন নিজ নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিতে। যদি তিনি দেশসেবা ও দেশানুরাগের ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে সহযোগের জন্য আমায় ডাক দেন, আমি তাঁর অধীনে থেকে তাঁর আদেশমত কাজ করতে রাজি আছি। ঘরে ঘরে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে পৌরুষের দম্ভ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।'

অ্যানড্রুজকে লেখা আর-একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ চিঠি বাবা লিখেছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯২১-এর জানুয়ারি মাসে—

'স্বদেশ ও স্বরাজের কথা বলতে গেলেই অধিকাংশ দেশবাসীর মনে প্রচুর উত্তাপের সঞ্চার হয়, তার কারণ স্বাজাত্যের এমন একটা অভিমান আছে যা রাগ করে অন্যকে পৃথক রাখে। আমি যে এরকম রাগ বা অভিমান হতে সম্পূর্ণ মুক্ত— এ-সব কথা বলতে চাই নে। তবে কি না আমার কবি-প্রকৃতি স্বদেশ ও স্বরাজকে সবসময় মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিতে চায় না। আমার তো ধারণা এ-সব কথার উপর আমরা বড়ো বেশি গুরুত্ব দিই। বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত আমি আমার স্বদেশী লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলতে রাজি। তার পর একটা জায়গায় আমার আলাদা পথ বেছে নিতেই হয়। আমার সমস্ত মন বিদ্রোহ করে বলতে থাকে: নিছক দেশভক্ত কিংবা নীতিবাগীশ মানুষের কাছে গোটা মানুষকে বলি দেওয়া পাপ। মনুষ্যত্ব আমার কাছে বিচিত্র, বিরাট ও বহুমুখী।'

ভারতের জাতীয়ধর্মে যে সৃষ্টিশীলতা, যে আদর্শ নিহিত, বরাবর বাবার দৃষ্টি ছিল সেই দিকে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ভারত মহামানবের মিলনতীর্থ। তাঁর সেই ধারণা থেকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল বিশ্বভারতী। তাই দেখি ১৯২১-এ যখন

বাবা ইয়োরোপ থেকে ফিরলেন, যদিও তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে পুরোমাত্রায়, বাবা এসে নিজেকে মগ্ন করে দিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিবিধ ও বিচিত্র কাজে। শেষবার যখন বাবার সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎ হয় (১৯৪০), গান্ধীজি বলেছিলেন বিশ্বভারতী 'আন্তজাতিক' বলেই ভারতের অন্যতম 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান।

মাঝখানে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে গেল। এখন মূল কাহিনীতে ফেরা যাক।

স্বদেশী আন্দোলনের রাস্তা থেকে বাবা যেন অনিবার্যভাবে সরে এলেন। রাজনীতির আখড়া থেকে নিজেকে এমন নীরবে সরিয়ে নিলেন, লোকে জানতেও পারল না। কেবল 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতায় তাঁর তখনকার মনোভাবের একটা ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়। রাজনীতি থেকে তো অবসর নিলেন, কিন্তু তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার কোনো হ্রাস হল না। যে-সব গঠনমূলক কাজের পরিণতি ঘটেছিল শ্রীনিকেতনে, অনেক বছর পরে, তার সূচনা এই সময়ে। নিজেদের জমিদারিতে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। কিছু কর্মীকে আপন পরিকল্পনামতো গ্রাম সংগঠনের কাজ করার জন্য পতিসর শিলাইদহ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল গ্রামের আর্থিক জীবনের মেরুদণ্ড কৃষির উন্নতি না করতে পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এইজন্য তিনি স্থির করলেন, বিদেশে গিয়ে সন্তোষ ও আমি যদি ভালো করে কৃষি- ও পশুপালন-বিদ্যা আয়ত্ত করে আসি তা হলে ফিরে এসে আমরা তাঁর দেশের কাজে সহায় হতে পারব।

একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। বাবা জানতে পেলেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাঙালি ছাত্র পাঠাবার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি শিক্ষার্থীর দল কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। সন্তোষ ও আমাকে বলে দিলেন এই দলের সঙ্গে যোগ দিতে। আমাদের গন্তব্য হবে আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষি- ও পশুপালন-বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ষোলোটি প্রাণী জাপানগামী একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর বিদেশ যাচ্ছি, সম্বলের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দেওয়া জাপানি মালবাহী জাহাজের অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের একখানা টিকিট এবং এক গুচ্ছ পরিচয়পত্র। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের রণক্ষেত্র থেকে সদ্য-ছাড়া-পাওয়া এই তরুণের দল উদ্দীপনায় ভরপুর। সম্বল তাদের অল্প, কিন্তু তাদের বেপরোয়া উৎসাহ ঠেকাবে কে? অর্থসংগতি তাদের ছিল না বললেই হয়, না ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি আর বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান। অথচ এদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে বিদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করে এরা স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য নূতন করে গড়ে তুলবে। কালে এই দলের কেউ কেউ বড়ো বড়ো শিল্প-বাণিজ্য গড়েও তুলেছিল। শান্তিনিকেতনে যে-সব ছেলেদের সঙ্গে একত্র থেকেছি, পড়াশুনা করেছি, তাদের থেকে এরা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু এদের সঙ্গে সন্তোষ ও আমি বেশ মিশ খেয়ে গেলাম। অবশ্য তখন আমাদের বয়স ছিল আঠারো, আমরাও ছিলাম তরুণ বাঙালি।

মালয় ও চীনের বন্দরে বন্দরে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে আমাদের জাহাজ মাস পাঁচেক পরে জাপানে এসে পৌঁছল। তখন জাপান সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার অন্ত নেই। প্রত্যেক জাপানি আমাদের চোখে এসিয়ার বীরসন্তান। যুদ্ধে রুশকে হারিয়ে দিয়ে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে, পশ্চিমের রণশক্তি অপরাজেয় নয়। আমরা যখন জাপানে পৌঁছলাম তখন সেখানে বিজয়-উৎসবের পালা চলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে শান্তিনিকেতনে আমরা এই উৎসব

পালন করে এসেছি— তার স্মৃতি তখনো আমাদের মনে জ্বলজ্বল করছে। জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় যে যুগান্তকারী ঘটনা, আমাদের মনে সে ধারণা তখনো স্পষ্ট। সুতরাং টোকিও শহরের এই উৎসবে আমরা পরম উৎসাহে যোগ দিলাম। প্রত্যেক পার্কে, প্রত্যেক স্কোয়ারে, স্তরে স্তরে সাজানো শত্রুপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কামান বন্দুক গুলিগোলা। ঘুরে ঘুরে এই-সব দেখি আর জাপান সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব আমাদের উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল যখন দেখলাম আমরা ট্রামে-বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাপানিরা—বিশেষত বয়স্কের দল ও মহিলারা— সসম্ভ্রমে আমাদের জন্য আসন খালি করে দেয়। আমরা যে জাপানের ধর্মগুরু বুদ্ধদেবের দেশের লোক ? রণজয়ী জাপানের বিজয়গর্বের দিনেও, ধর্মের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার ভাব দেখে আমার বার বার কাকুজো ওকাকুরার কথা মনে হল : 'এসিয়া এক ও অবিভাজ্য।'

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগ ভাবলেন, ঘর ছেড়ে অনেকটা দূর আসা গেছে, জাপানেই ছেদ টানা যাক। শান্তিনিকেতনের আমরা দুজনই কেবল যাব আমেরিকায়। জাপানে অবস্থিত আমেরিকান কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করার পর, আমরা প্রশান্ত মহাসাগরগামী এক জাহাজের ডেক্-প্যাসেঞ্জার রূপে রওনা দিলাম। খুব অল্পসংখ্যক এসিয়াবাসীকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে নামতে দেবার আইন তখন বলবৎ ছিল। আমেরিকার ডাক্তার বেচারির কাজ ছিল স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকদের কোনো একটা অজুহাতে বাতিল করা। আমার চোখ খারাপ এই অজুহাত দেখানো হল। আমি তো হতাশ হয়ে একজন জাপানি বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ নিতে গেলাম। আমার কাছে সব কথা শুনে ভদ্রলোক খুব এক চোট হাসলেন ; বললেন, চিকিৎসার কোনো দরকার নেই, তিনি এমন একটা কৌশল শিখিয়ে দেবেন যাতে আমেরিকান ডাক্তারের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। ব্যাপারটা আর-কিছু নয়— কতকটা অঙ্কের খেলা। জাপানি ডাক্তারের পরামর্শ এই যে, আমাকে রোজ হাজার হাজার যাত্রীর সঙ্গে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য আমেরিকান ডাক্তারের কাছে হাজিরা দিতে হবে। এত লোকের মধ্যে মুখ চিনে রাখা শক্ত— সুতরাং কপাল যদি ভালো থাকে তো কোনো একদিন শতকরা দশজন লোকের সঙ্গে আমিও হয়তো পরীক্ষায় উতরে

যেতে পারি। হলও তাই, তিন দিনের দিন সাব্যস্ত হল, আমার স্বাস্থ্য ভালোই।

তৃতীয় শ্রেণীর ডেক্-প্যাসেঞ্জার হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া— সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটি নাতিপ্রশস্ত ক্যাবিনে মেঝে থেকে ছাদ অবধি পাঁচটি তাক শোবার বেঞ্চি— সেই খোঁয়াড়ের মধ্যে আমরা ছিলাম আটাশ জন যাত্রী। খাওয়া শোওয়া বসা সব একই জায়গায়। খাওয়া ছিল জঘন্য রকমের। ক্যাবিন যেমন নোংরা তেমনি ঘিঞ্জি। সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল সহযাত্রী আমেরিকান স্ত্রী-পুরুষদের (এই ক্যাবিনে সকলের জন্য ছিল ঢালা ব্যবস্থা) আচরণ। এদের মধ্যে অধিকাংশই ওদেশের নিম্নস্তরের লোক। সহযাত্রীদের মধ্যে কিছু জাপানি ছিল। একদিন খাবার টেবিলে একজন জাপানি ভুল করে এক আমেরিকানের জায়গায় বসে পড়েছিল। বেঁটে-খাটো নিরীহ জাপানিটির উপর সেই প্রকাণ্ড আমেরিকানটির সে কী তম্বি— এই মারে তো সেই মারে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে শেষ পর্যন্ত একটা ছোরা বের করে শাসাতে লাগল। জাপানিটি যখন বিনা বাক্যব্যয়ে আসন ছেড়ে উঠে চলে গেল— আমাদের ভারি খারাপ লেগেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এল তার স্বদেশবাসীদের একটি দল সঙ্গে ক'রে। বলল, ইয়াঙ্কিরা দলে ভারী ছিল বলে সে তখন কিছু বলে নি। এবার দু-দল সংখ্যায় সমান সমান, এখন যদি ইয়াঙ্কিরা মারামারি করতে চায় তো জাপান প্রস্তুত। ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল, এসিয়ার সম্মান অক্ষুণ্ণ রইল।

প্রথম দর্শনে আমেরিকা

জাহাজে চড়ার দ্বিতীয় দিনে আমরা একটু হাওয়া খাবার জন্য আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছোট্ট একফালি ডেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি উপরতলায় একদল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী অপরিসীম অবজ্ঞায় নীচতলার জীব-গুলিকে নিরীক্ষণ করছে। তাদের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাব ছিল যা আমাদের দুজনের কাছে অসহ্য মনে হল। আমরা তৎক্ষণাৎ ডেক্ ছেড়ে আমাদের অন্ধকূপে ফিরে এলাম। তার পর যে-কটা দিন জাহাজে ছিলাম পারতপক্ষে ডেক্ মাড়াই নি। সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে ছিল অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত বাবার 'কাব্য-গ্রন্থ'। যতদিনে জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়ল, ততদিনে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। হনোলুলুতে কবে যে জাহাজ লেগেছিল সে আমরা বলতে গেলে টেরই পাই নি। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে তখন মড়ক লেগেছে বলে কোনো যাত্রীকে নামতে দেওয়া হয় নি।

এর বেশ কিছুদিন পর, সহযাত্রীদের ভাবগতিক দেখে আঁচ পেলাম আমরা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে গেছি। সন্ধ্যাবেলা আমরা বাঁধাছাঁদা শেষ করে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে। পরদিন সকালবেলা জাহাজ সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে ভিড়বে— এই কথা মনে করতেই আমাদের চোখের ঘুম কোথায় যেন পালাল। রাত থাকতে আমরা চুপচাপ আমাদের সেই ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। জাহাজের মুখ যেদিকে আমাদের চোখও সেই দিগ্‌বলয়ের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। ভোর হল; প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সেদিন যে অরুণ আলোর দীপ্তি দেখেছিলাম— তেমনটি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দেখা গেল জাহাজের প্রত্যেকটি অফিসার চোখে দূরবিন লাগিয়ে একদৃষ্টে তীরের দিকে তাকিয়ে আছেন। চার দিকের আবহাওয়ায় একটা থম্‌থমে স্তব্ধতা। অফিসারদের মধ্যে চাপা গলায় কী-সব আলাপ-আলোচনা চলল কিছুক্ষণ ধরে। আবার কিছুক্ষণ মাথা নাড়াচাড়া, ঘন ঘন দূরবিন দিয়ে দেখা, আবার সব চুপচাপ। তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের যাত্রী আমরা অনেকে

দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলাম। একটা যেন হ্যাঁচকা টানে জাহাজের মুখ ঘুরে গেল। তীরের সমান্তরালে ভেসে যেতে যেতে আমরা এবার বুঝতে পারলাম প্রকৃত রহস্যটা কী। পুবের আকাশ ভোরের আলোয় অরুণ; সেই আলোতে দেখা গেল অভ্রংলিহ প্রাসাদশ্রেণীর দগ্ধাবশেষ ত্-চারটে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। জেটির যে জায়গায় এসে জাহাজ থামল তার নাম 'গোল্ডেন গেট'। এককালে এই তোরণদ্বার ছিল ঐশ্বর্যময়ী সানফ্রান্সিস্‌কো নগরীর স্বর্ণসিংহদ্বার। আজ মনে হল এই তোবণ যেন নরকের প্রবেশদ্বাব— চতুর্দিকে ধ্বংসস্তূপ, অর্ধদগ্ধ শবদেহেব আবর্জনা। যা কিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি, সে সমস্ত যেন বেঁকেচুরে তুবড়ে গেছে। নোংরা রাস্তায় ত্-চারটে বুভুক্ষু প্রাণী মোহাচ্ছন্নের মতো নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে সানফ্রান্সিস্‌কোব ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হল— দেখে শুনে সকল যাত্রীর যেন হৃৎকম্প হতে লাগল। তখনকার দিনে বেতার ছিল না বলে এই তুর্ঘটনার বিষয়ে আগের থেকে কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারি নি। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটল। সুদূর ভারতের তুটি তরুণ, সম্বল তাদের একখানি পরিচয়পত্র— বার্কলে শহরে কাকে যেন উদ্দেশ করে লেখা। তারা তখন জানেও না যে পূর্বরাত্রের ভূমিকম্পে বার্কলে শহরও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

শহরের ভগ্নাবশেষ থেকে শরণার্থীর দল তখন হাজারে হাজারে শহর ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় পালাতে শুরু করেছে। রেল কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে ব্যস্ত, কাজে কাজেই জাহাজের কাপ্তেন আমাদের সকলকে তিনদিনের মতো জাহাজেই থাকতে দিলেন। তার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একনাগাড়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা তুটিতে শিকাগো-গামী এক ট্রেনে তুটি আসন পেলাম। শুনেছিলাম 'ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ভালো কৃষিশিক্ষার কলেজ আছে। শিকাগো ইলিনয় জেলায় অবস্থিত বলে গোড়ায় আমার ধারণা হয়েছিল শিকাগো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুব বেশি দূর হবে না।

সে যাই হোক, ট্রেন তো চলতে শুরু করল। আমাদের কামরার উপরের বার্থে একজন মহিলা ছিলেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি গুরুতর চোট পান। সেই রাত্রেই তিনি মারা গেলেন, তাঁর মৃতদেহ মাঝের একটি স্টেশনে নামিয়ে

নেওয়া হল। রাত কাবার হল, আমাদের ট্রেন চলেছে পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করে। হঠাৎ আরম্ভ হল তুষারের ঝড়— তিন ফুট বরফ জমল রেলরাস্তায়, ইঞ্জিন আর এগোতে পারে না। যাত্রীদের অনেকে রেলকামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, বরফের বল বানিয়ে খেলাধুলা করতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা বাদে ইঞ্জিন-চালক সিটি বাজিয়ে সবাইকে ফিরে আসার জন্য সংকেত জানাল। বরফভাঙা ইঞ্জিন এসে রেললাইন সাফ করে দিতে লেগেছে।

শিকাগো পৌঁছে ইলিনয়ের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান নিয়ে আমরা সেখানকার ওয়াই. এম. সি. এ.-র সেক্রেটারির নামে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ জানালাম তিনি যেন স্টেশনে উপস্থিত থেকে দুজন ভারতীয় ছাত্রকে তাঁর ছাত্রাবাসে নিয়ে যান। মাথায় যে এমন একটা সুবুদ্ধি খেলল— এ নিয়ে সন্তোষ ও আমি পরস্পরের পিঠ চাপড়ালাম। ভাবখানা এই যে গন্তব্য জায়গায় নিশ্চয় ওয়াই. এম. সি. এ. থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান যদি থাকে তো তার সেক্রেটারিও একজন থাকবেন। শ্যাম্পেন শহরে রেলগাড়ি থেকে নেমে দেখি স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এমন কেউ উপস্থিত নেই যাকে ওয়াই. এম. সি. এ.-র সঙ্গে যুক্ত বলে কল্পনা করা যায়। কিছুদিন বাদে সেক্রেটারির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ পরিচয় হল, তিনি বললেন যে টেলিগ্রাম ঠিকই তাঁর হাতে এসে পৌঁচেছিল, কিন্তু তাতে লেখা ছিল 'ইণ্ডিয়ান' নয় 'ইণ্ডিয়ানা' থেকে দুজন ছাত্র যাচ্ছে। টেলিগ্রাফ অপিসের মেয়েটি ভেবেছিল 'ইণ্ডিয়া' বলে কোনো দেশের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং 'ইণ্ডিয়া'র জায়গায় সংশোধন করে সে লিখেছিল 'ইণ্ডিয়ানা'। আর যেহেতু 'ইণ্ডিয়ানা' প্রতিবেশী স্টেট, সেখানকার দুজন ছাত্রকে স্টেশনে গিয়ে ছাত্রাবাসে ডেকে আনা সেক্রেটারির কাছে অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল।

কস্‌মোপোলিটান ক্লাব

১৯০৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রে বহির্জগৎ সম্বন্ধে খুব বেশি মাথাব্যথা ছিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়— তাও আবার অধিকাংশ ফিলিপাইন ও মেক্সিকো থেকে। তাদের সম্বন্ধে আমেরিকান সহপাঠীদের হয় অত্যধিক কৌতূহল, নয়তো নিছক উদাসীন ভাব। এতে বিদেশী ছাত্র-মাত্রেই খুব বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত।

আমি গুটিকতক বিদেশী ছাত্রকে একত্র করে 'কস্‌মোপোলিটান ক্লাব' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করি। সুখের বিষয় গোড়া থেকেই এ কাজে কয়েকজন অধ্যাপকের সহায়তা পাই, তা না হলে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম একটা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য হত। এই কাজে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন ডক্টর আর্থার আর. সীমুর— ইনি ছিলেন লাতিন গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর চেষ্টায় ও যত্নে ক্লাব চমৎকার দাঁড়িয়ে গেল। তিনি সত্যিই জাতিনির্বিশেষে সকল বিদেশী ছাত্রের অকৃত্রিম বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। নেভেডা স্ট্রীটে তাঁর বাসস্থান আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হত। আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে তিন বছর ছাত্ররূপে ছিলাম, সে সময় মিসেস সীমুর-এর মাতৃসুলভ মমতা আমার স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই স্নেহমমতা আমার পক্ষে তখন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তা না হলে ওই তিন বছরের প্রবাস দুর্বহ হয়ে উঠত। আহারাদির পর আমি তাঁর সঙ্গে থালা গেলাস পরিষ্কার করবার ফাঁকে ফাঁকে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। তিনি আমার নানা প্রশ্নের জবাব দিতেন হাসিমুখে। কখনো কখনো সাবধান করে দিতেন যে কাচের জিনিস কিংবা চিনেমাটির বাসনপত্র ঠুনকো— অসাবধান হলে ভেঙে যেতে পারে। অবসর সময়ে আমি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ তাঁকে পড়ে শোনাতাম, তিনিও তাঁর রচিত কবিতা পাঠ করে আমায় আনন্দ দিতেন। বছর কয়েক বাদে বাবা যখন আর্বানায় এসে কয়েক মাস ছিলেন এবং আমি ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা করছি, সেই সময় প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা বাবা সীমুরদের বাড়ি যেতেন এবং

সদ্যোলিখিত 'সাধনা' বইয়ের প্রবন্ধগুলি তাঁদের পড়ে শোনাতেন। ইলিনয় ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সীমুরদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচে গেছে এমন নয়। এখনো মিসেস সীমুর-এর সঙ্গে আমার পত্র-বিনিময় হয়ে থাকে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা অম্লান আছে— তাঁর সৌহার্দ্য আমার জীবনের এক পরম সম্পদ।

'কস্‌মোপোলিটান ক্লাব'-এর প্রসঙ্গে মিসেস সীমুর-এর অনেক বৎসর পরের (৮ জুলাই ১৯২৬) একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য—

'১৯০৯ সালের শেষ বাৎসরিক ভোজসভায় কস্‌মোপোলিটান ক্লাব-এর একজন তরুণ ভারতীয় সদস্য জর্মন ভাষায় পুনর্দর্শনায় (Auf Wiedersehen) বলে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল— তার কথা কি তোমার মনে আছে? মিঃ সীমুরের নথিপত্রে অনেক সব চিঠিপত্র অনুষ্ঠানসূচি ইত্যাদি পাওয়া গেছে— যা থেকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কস্‌মোপোলিটান ক্লাব-এর গোড়াকার ইতিহাস বিষয়ে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। এই-সব কাগজ-পত্রের মধ্যে সেই ভোজসভার একটি অনুষ্ঠানসূচি পাওয়া গেল। ক্লাব সম্বন্ধে তোমার উৎসাহ, যাতে ক্লাব ভালোভাবে চলে— তার জন্য তোমার অক্লান্ত উদ্যম— এই সমস্ত কথা আমার মনে পড়ে। তোমার নিশ্চয় মনে আছে ক্লাবের নিজস্ব ঘর তৈরি করা ও ক্লাবের আদর্শ উচ্চ মানে রাখবার জন্য কী রকম বেগ পেতে হয়েছিল। তবে তুমি হয়তো জান না তুমি চলে যাবার পর ক্লাব বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে সদস্যেরা কী বেগটাই না পেয়েছেন।'

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। বছরখানেকের মধ্যে কস্‌মোপোলিটান ক্লাবের সদস্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হই।

যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের একটা আগ্রহ দেখা দিল। এই ক্লাবগুলির মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্য আমি একটি সমিতি গঠনের সংকল্প করি। পরে এই সমিতির নাম হয় অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্লাবস। আমেরিকা ছেড়ে চলে আসার সময় আমরা ইয়োরোপের অনুরূপ এক প্রতিষ্ঠান— Corda Fraters-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। বর্তমানকালে এরকম কস্‌মোপোলিটান ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ক্লাব অধিকাংশ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। আমার বন্ধু লেনার্ড এল্‌ম্‌হুর্স্ট যখন কর্নেলে ছাত্র, সে সময় তিনি মিসেস ডরোথি স্ট্রেটের (পরে এল্‌ম্‌হুর্স্ট) কাছ থেকে তাঁর স্বর্গত স্বামীর স্মরণে এইরকম একটি ক্লাবঘর প্রতিষ্ঠাকল্পে একটা মোটা রকমের অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে এই ক্লাব-বাড়ির নাম চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি যে সময় আমেরিকায় ছিলাম তখনকার দিনে আমাদের ইলিনয়ের ছাত্রসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী ছিল বলতে হবে। চিত্তের প্রসার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাবিচরণের যে স্বাধীনতা, ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষত্ব— সে-সব ছিল না বললেই হয়। আমাদের কাছে তো খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল যখন দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনারি তথা ধর্মপ্রচারকদের অবাধ গতিবিধি। এঁদের মধ্যে একজন নামকরা প্রচারক ছিলেন বিলি সান্‌ডে। মঞ্চে বক্তৃতা দেবার সময়, দর্শক ও শ্রোতাদের হৃদয় জয় করবার নানারকম কলাকৌশল তাঁর জানা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র উপস্থিত রয়েছে এরকম একটি সভায় একদিন তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমি একেবারে হতভম্ব। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক পত্র *Illini*-তে আমার একটি চিঠি ছাপা হয়। আমি যথাসাধ্য নরম ভাষায় অ-খ্রীষ্টীয়দের প্রতি বিলি সান্‌ডের বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলাম। মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। চার দিক থেকে আমার সে চিঠি নিয়ে তুমুল সোরগোল। রকমসকম দেখে আমার মনে হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এহেন সময়ে *Illini*-পত্রে আমার সমর্থনে বেশ জোরালো ভাষায় সম্পাদকীয় মন্তব্য বেরল। পরে জেনেছিলাম আমার সহাধ্যায়ীদের তিরস্কার করে এই নিবন্ধ লিখেছিলেন অপেক্ষাকৃত উঁচু ক্লাসের একজন ছাত্র। তাঁর নাম কার্ল ভান ডোরেন্—*Illini*র একজন সহ-সম্পাদক। অপ্রত্যাশিতভাবে অচেনা অজানা লোকের কাছ থেকে এরকম সমর্থন পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। অনেক দিন পরে সমালোচকরূপে কার্ল ভান ডোরেন্ আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে প্রখ্যাত হয়েছেন জেনে আমার ভারি আনন্দ হয়।

স্বদেশ অভিমুখে

১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফেরবার পথে আমি বেশ কয়েকটা মাস ইয়োরোপে কাটিয়ে আসি। লণ্ডনে থাকতে ক্লেমেণ্টস্ ইন্ নামক হোটেলের একটি ফ্ল্যাটে দেশবরেণ্য নেতা স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েক দিন একসঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যতদূর স্মরণ হয় তিনি একটি সংবাদপত্র-সম্মিলনে তাঁর 'বেঙ্গলি' কাগজের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে সেবার এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং ভারতীয় সমস্যার বিষয়ে ইংলণ্ডের লোকেদের মনে একটা ধারণা জন্মাবার জন্য সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার কাজে। সবরকম রাজনীতিক দলের—বিশেষত লিবারল পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সবদা দেখাসাক্ষাৎ ঘটত। স্যর হেনরি কটন্ -এর ছেলে এইচ্. ই. এ. কটন্ সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন ও তাঁর সেক্রেটারি হয়ে কাজকর্ম করে দিতেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে 'রিভিউ অব রিভিউজ' কাগজের স্বনামধন্য সম্পাদক ডব্লিউ. টি. স্টেডকে। ঔপনিবেশিক শক্তিরূপে ইংলণ্ড যে যুগে দুর্বল অসহায় দেশগুলিকে সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত করেছে, সে যুগেও যে ইংলণ্ডে স্টেডের মতো উদার মানবপ্রেমিকের উদ্‌ভব সম্ভবপর হয়েছিল এ খুব আশ্চর্যের কথা বলতে হবে। অনেকদিন পরে তাঁরই মতন আর-একজন ইংরেজ আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন—তিনি এইচ ডব্লিউ. নেভিন্‌সন্।

স্বরেন্দ্রনাথ যেখানেই বক্তৃতা দিতেন ঘনঘন করতালিধ্বনিতে হলঘর মুখরিত হতে থাকত। ন্যাশন্যাল লিবারল ক্লাব থেকে ওয়েস্টমিনস্টার হোটেলে তাঁকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করা হয়। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে স্বাগত-ভাষণের উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে কয়েকজন উপস্থিত ইংরেজ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করেছিলেন যে বার্কের পর ইংলণ্ডে এমন ওজস্বিনী ভাষায় এত সুন্দর বক্তৃতা আর শোনা যায় নি। বাগ্মিতা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, তবু তিনি বেশ যত্নসহকারে বক্তৃতার বিষয়ে পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে

যেতেন। প্রায়ই শুনতাম পাশের ঘরে পরদিনের বক্তৃতার বিষয়ে তিনি বেশ গলা ছেড়ে মহড়া দিচ্ছেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা তিনি খুব ভালোবাসতেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডাম্‌বেল ভাঁজা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। অতঃপর প্রচুর আহার্যসহকারে প্রাতরাশ সারতেন। কোনো কোনো দিন এমন হত যে তিনজনের ব্রেক্‌ফাস্ট তিনি একাই শেষ করে দিতেন। ফলে আমার বন্ধু কেদারনাথ দাশগুপ্ত (তিনিও স্বেচ্ছায় সুরেন্দ্রনাথের দেখাশুনার ভার নিয়েছিলেন) ও আমি প্রায়ই নিকটবর্তী এ. বি. সি. রেস্তোরাঁয় গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতাম।

অনেক বছর বাদে ১৯১৭ সালে কলকাতায় আবার একবার আমি সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসি। সে সাক্ষাতের স্মৃতি সুখকর নয়। সে বছর কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবে। দেশের লোকেব ইচ্ছা জাতীয় আন্দোলনের জন্য অ্যানি বেসাণ্ট এত ত্যাগস্বীকার করেছেন, এবার তাঁকেই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করা হোক। বেসাণ্টের নাম প্রস্তাবিত হলে পর সে প্রস্তাবের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করলেন সুরেন্দ্রনাথ। আসলে তিনি মনেপ্রাণে নরমপন্থী লোক ছিলেন— উগ্র মতবাদের সমর্থক একজন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবেন, এ তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল।

বাবা সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন মিসেস বেসাণ্ট প্রেসিডেণ্ট হোন। এমন-কি, পুরাতনপন্থীদের প্রতিনিধির জায়গায় তিনিই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হবেন— এমনও কথা হয়েছিল। যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হল মিসেস বেসাণ্টই প্রেসিডেণ্ট হবেন— বাবা নির্বাচনদ্বন্দ্বে আর দাঁড়ালেন না। কেবল প্রথম দিনের সাধারণ অধিবেশনে India's Prayer নাম দিয়ে নৈবেদ্যর কবিতার ইংরেজি তর্জমা পড়েছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ এই ঘটনার একটি ছবি এঁকে গেছেন— বাবা পড়ছেন, হাতে কাগজ, মাথার টুপি ও পিঠের পরিচ্ছদের উপর দিয়ে একফালি রোদ তির্যক হয়ে পড়েছে হাজার হাজার দর্শকের উপর। সেদিন তুমুল হর্ষধ্বনিতে সমবেত জনতা বাবাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

তখনকার দিনে এক রটামস্টেডের গবেষণাকেন্দ্র ছাড়া ইংলণ্ডে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে কৃষিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পড়াশুনার সুবিধা পাওয়া যায়। ইংলণ্ড থেকে আমি জার্মানি চলে যাই। জার্মানির গোয়েটিংগেন

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একপর্বকাল নিয়মিত বক্তৃতা শুনেছি। গোয়েটিংগেন জার্মানির প্রখ্যাত প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। প্রিন্স বিস্‌মার্ক ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভর্তি হবার অল্প কিছুদিন পরেই কর্তৃপক্ষ বুঝলেন এই দুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া ছাত্রকে নিয়মানুবর্তী করে তোলা দুঃসাধ্য। নানারকম শাস্তি দেবার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর নিত্যনূতন দস্যিপনার সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তনের মধ্যে তাঁকে থাকতে দেওয়া চলবে না— পড়তে হলে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন। যে নদী ছিল গোয়েটিংগেনের সীমারেখা, তার সাঁকোর ধারে বিস্‌মার্ক একরকম রাতারাতি নিজের বাসোপযোগী একটি ছোট্ট বাড়ি তৈরি করিয়ে নেন। কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা প্রদর্শনেব এ এক অভিনব পন্থা। ইতিহাসের এমনি বিধান, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা-ব্যক্তিরাই আজ বিস্‌মার্কের কুঁড়েঘর সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি তৎপর। বাড়ির পিছনে যে পাহাড় তার চূড়ায় স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সবচেয়ে নামী ছাত্র বিস্‌মার্কের স্মৃতিস্তম্ভ।

গোয়েটিংগেনে থাকতে আমি সর্বপ্রথম 'ডুয়েল'-লড়া দেখি। বিশ শতকের গোড়ায় এরকম একটা মধ্যযুগীয় ব্যাপার দেখা যাবে এ আমি ভাবতে পারি নি। শুনলাম জার্মানির ছাত্রসমাজে ডুয়েল-লড়াটা কিছুই না— প্রায়ই এরকম ঘটে থাকে। গোয়েটিংগেনের মধ্যে ডুয়েল-লড়ার আইনগত বাধা ছিল বলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটা ঘটত শহর থেকে দূরে, চল্‌তিপথের বাইরে কোনো রেস্তোরাঁয়। এ-সব কথা সবাই জানত, পুলিশের লোক দেখেও দেখত না। ডুয়েল-লড়ার খেলাটা হত রেস্তোরাঁর লাগাও একটা বড়ো হল-ঘরে। খেলাই বলতে হবে, কারণ প্রতি সপ্তাহান্তে এই খেলা দেখার জন্য বেশ কয়েক শো লোকের সমাগম হত এবং গ্যালারি খাটিয়ে তাদের বসবার ব্যবস্থাও করা হত। দ্বন্দ্বক্ষেত্রে বেশ পুরু করে বিছানো হত কাঠের গুঁড়োর আস্তর— সেখানে আসত বেশ কয়েক জোড়া ডুয়েল-লড়িয়ে, থাকত তাদের সাঙাতেরা এবং জন-দুই ডাক্তার। চার দিকে আয়োডোফর্মের গন্ধ। আমি যখন গিয়ে ঢুকলাম, সত্ত লড়াই শুরু হয়েছে, লড়িয়েরা চওড়াপাতের তলোয়ার হাতে পরস্পরকে আঘাত করছে। খানিকবাদে দেখা গেল একজনের মাথা থেকে একটা টাকার মাপের চামড়া কেটে বেরিয়ে এল, ডাক্তার লড়াই থামিয়ে দিয়ে মাথায় খানিকটা আয়োডোফর্ম ঢেলে দিলেন। কাটা চামড়া সেলাই করে জুড়ে দেওয়া বারণ।

মুখের উপর কাটা দাগ জর্মন যুবকদের ভারি পছন্দ, দাগের চেহারাটা যত বেশি বিকট হবে ততই নাকি মেয়েদের কাছে তাদের কদর বাড়বে। যে জর্মন বন্ধু ডুয়েল দেখাবার জন্য আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি আরো কয়েকটা ডুয়েল দেখি। একবার দেখাই যথেষ্ট— আর কি আমি সেখানে থাকি!

আবার শিলাইদহ

১৯০৯ সালের শেষদিকে আমি দেশে ফিরলাম। এসে দেখি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আমার জন্য প্রস্তুত— জমিদারির কাজকর্ম তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার খেত খামার গড়ে তুলব, কৃষি নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা করব— এই ছিল বাবার অভিপ্রায়। যুবা বয়স, কাজ করার জন্য হাত মন নিশপিশ করছে— সুতরাং এর চেয়ে বেশি আর কী চাই। ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে— উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেইসঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। হাউসবোটে কেবল বাবা আর আমি। বার বার মৃত্যুশোকের আঘাতে, বিশেষ করে অকালে শমী চলে যাওয়ায়, তাঁর মনে তখন গভীর বেদনা, তিনি নিতান্ত একাকী। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আমি ফিরে এসেছি, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন। অনেক দিনের চেনাজানা নদীর বুকে আমরা দুজন ভেসে চলেছি। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা ডেকে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। এর আগে এমন মন খুলে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ কখনো পাই নি। স্বভাবত আমি মুখচোরা মানুষ, প্রথম প্রথম তাই একটু বাধো-বাধো ঠেকত। সদ্য কলেজ-পাস-করা ছোকরার মুখে কৃষিবিদ্যা, সৌজাত্যবিদ্যা অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধারকরা কেতাবি মতামত শুনে বাবা নিশ্চয় খুব কৌতুক অনুভব করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ করে থাকতেন ও আমার মুখের বাঁধা বুলি ধৈর্যসহকারে শুনে যেতেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি নিজে কিছু বলতেন, তার বিষয় হত দেশের প্রজাসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা এবং তার প্রতিকারকল্পে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা কচিৎ হত— তিনি হয়তো ভাবতেন তাঁর বিজ্ঞানী ছেলের পক্ষে সাহিত্যের রসবোধ কঠিন হবে। ১৯১০ সালের সেই সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসেছিলাম তেমন আর কখনো ঘটে নি।

শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল— আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার

পল্লী-অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরি হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এ দেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হল— এমন-কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল। এইসময় আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌— ইনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে এঁর লেখা অনেক প্রবন্ধাদি তখনকার কাগজে প্রকাশিত হত। তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।

আমি যখন এ-সব কাজ নিয়ে বেশ মনের আনন্দে মেতে আছি, বাবা আমায় কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিবাহ হল ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে— আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ।

এর পরের কয়েকটা বছর কাটল অনাবিল আনন্দে। আমি জমিদারির কাজ ও চাষবাস নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষায় সময় কাটাই, আর আমার স্ত্রী, ইলিনয় থেকে আগত মিস বুর্‌ডেট নামে একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশুনা করেন। কিন্তু বাংলার পল্লীগ্রামে সরলচিত্ত চাষাভুষোদের মধ্যে এই সহজ আনন্দের জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়ল। বাবার পক্ষে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বহন করা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল। আমাকে শিলাইদহ থেকে বাবা ডেকে পাঠালেন। বললেন, শান্তিনিকেতনের কাজে আমি যেন তাঁকে যথাসাধ্য সহায়তা করি। আমার সহপাঠী বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ইতিপূর্বেই বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন। আমার বোন মীরার স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও আমেরিকার শিক্ষা সেরে ফিরে আসবেন কথা আছে। আমাদের তিনজনকেই যে আমেরিকার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বাবা সহায়তা করেছিলেন তার কারণ বাবার ইচ্ছা ছিল আমরা এসে বিদ্যালয়ের কাজে ও দেশের কাজে তাঁর সহায় হই।

সেই শিলাইদহ— যার কুঠিবাড়ির চার দিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী খেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে

সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি ; সেই পদ্মা নদী, যার মতি বোঝা ভার, যার গতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, সেই বজরা যার সঙ্গে কত সুখস্মৃতি বিজড়িত, সেই চমরু শিকারী যার একটিমাত্র হাত এবং যে শিকার-অভিযানে আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী— এই-সব যা-কিছু আমার ভালো লাগত— সেই-সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের উষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।

আমেরিকায় আমার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল কৃষি এবং হাতে-কলমে তার প্রয়োগ—ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপার। ইতিপূর্বে চারুশিল্প কারুশিল্প নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই নি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখি জোড়াসাঁকো বাড়িতে সাহিত্য ও ললিতকলার মহোৎসব বসে গেছে। কিন্তু তার সবই সুষম, রুচিপূর্ণ, সংযত। আমেরিকায় ও আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের বড়ো বড়ো শহরে শিল্পীদের বোহেমীয় জগতের যে-একটু পরিচয় পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে জোড়াসাঁকো-বাড়ির আবহাওয়ার সামান্যই মিল। লম্বা চুল, বিচিত্র পোশাক আর চটকদারি বাগাড়ম্বর—এ-সবের কিছুই ছিল না। কলকাতার বনেদি পরিবারে আর-পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোক যেমন জীবনযাপন করেন—এ বাড়িতে তার ব্যতিক্রম নেই। অথচ এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই ভারতের শিল্প ও সাহিত্য তখন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করছে।

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র তখন শিল্পের নানা বিভাগে নানারকম পরীক্ষা করে চলেছেন; তাঁদের নবনব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা তখন নূতন নূতন সৃষ্টিতে নিবিষ্ট। অথচ শিশু ভোলানাথের মতো সরল এঁদের মন। কত বড়ো কাজ যে এঁরা করে চলেছেন এবং সে কাজের কী যে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাও ছিল না। আমি সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছি, সে দেশ নগদবিদায় ও বিজ্ঞাপনের দেশ। এঁদের দেখে আমার প্রথম প্রথম যতই অদ্ভুত মনে হোক-না কেন, যত পরিচয় বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই এই দুই প্রতিভাবান ভাইয়ের প্রতি আমার সমস্ত মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গেল। প্রায় প্রত্যহ আমি এঁদের ৫ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম আর দেখতাম এঁদের নিত্যকর্ম।

এঁদের কাজকর্মের ধরনধারণ, এঁদের ভাবনা-চিন্তার ধারা, সবই আমার কাছে নূতন। স্টুডিও নেই, ঈজেল নেই, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র তিন ভাই তিনটি ঈজিচেয়ারে বসে আছেন দক্ষিণের লম্বা বারান্দায়। সেখানেই তাঁদের ছবি আঁকা, জমিদারির কাজকর্ম দেখা, অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। এর কিছুকাল আগেই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের কাজ

থেকে অবসর নিয়েছেন, তবু তাঁর অনুগত শিষ্যেরা সব সময় তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করছেন, শিল্পের দুরূহ ব্যাপার তাঁর কাছে বুঝে নিচ্ছেন, কখনো-বা নীরবে ঈজিচেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে গুরুর কাজ নিরীক্ষণ করছেন। প্রাচ্য শিল্পকলায় অনুরাগী ও সমঝদার লোকেরাও প্রায়ই আসতেন তাঁর নবতম ছবি দেখবার জন্য। আর্ট নিয়ে যাঁরা বেসাতি করেন তাঁবা কখনো কখনো আসতেন মহামূল্য সব শিল্পকলার নিদর্শন নিয়ে, যতটা না রোজগারের আশায় তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁদেব কাছে এই-সব সামগ্রী যাচাই করে নেবার জন্য। এ ছাড়া অভ্যাগতদের মধ্যে থাকত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে কর্মপ্রার্থী বেকার, বা নিছক মোসাহেবের দল, যাদের গল্পগুজবে আড্ডা উঠত জমজমাট হয়ে।

সামাজিকতাব এত সব অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁবা মাথা ঠাণ্ডা রেখে কেমন সহজভাবে তাঁদের দিনকৃত্য করে যেতেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তিন ভাইযের মধ্যে সমরেন্দ্র ছিলেন একটু লাজুক প্রকৃতির— শিল্পে তাঁর কোনো অধিকার ছিল না এমন নয়, তবে আর দু-ভায়ের সঙ্গে পাল্লা দেবেন এমন অহমিকা তাঁর ছিল না। •তিন ভাই ফরশির নল মুখে অম্বুরি তামাক টানছেন, চার দিক ভুবভুর করছে সুগন্ধে। গড়গড়ার পাশে পিতলের গামলায় জল, উপরে তার একটি করে তাজা গোলাপ ভাসছে, আর হাতের কাছে ছবি আঁকার কিছু কিছু সরঞ্জাম। এই পরিবেশে চোখের সামনে এমন অনেক ছবির জন্ম হল যা পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে।

বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ তুলি ধরবার কিছুকাল আগেই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীরূপে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। অভিজাত সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তারূপে, যৌবনে গগনেন্দ্রনাথ সামাজিক ও বৈষয়িক কর্তব্য নিয়েই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন। অবসর যাপনের জন্য তাঁর দুটি পথ ছিল— ফোটোগ্রাফ তোলা ও নাটকে অভিনয় করা। আমাদের বাড়িতে যখনই কোনো অভিনয় হত তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারত না, তার কারণ অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তিনি যে ছবি আঁকতে পারেন এটা কীভাবে আবিষ্কৃত হল, সে আমার ঠিক জানা নেই। মনে হয় কাকুজো ওকাকুরা ও তাঁর প্রেরিত জাপানি শিল্পীরাই সর্বপ্রথম তাঁকে প্রেরণা দেন। ১৯০৯ সালে আমি যখন দেশে ফিরলাম তিনি তখন শখের আর্টিস্ট, কালেভদ্রে এক-আধটা ছবি আঁকেন। তাঁর প্রতিভা

তখনো ঠিক স্ফূর্তি পায় নি। সেই সময়ে বাবার লেখা জীবনস্মৃতি ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এই বইয়ের জন্য তাঁকে ধরি ছবি এঁকে দিতে। এই ছবিগুলি দ্বারাই বোধ করি তাঁর শিল্পী-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এইরকম একটা সময়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট নামে প্রতিষ্ঠানের জন্ম। জস্টিস্ উড্রফ, ব্লাউণ্ট, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি প্রভৃতি শিল্প-রসিকদের সঙ্গে গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের সৌহার্দ্য থেকে এই সোসাইটির উদ্ভব। প্রথম প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনী যা হত তার বেশির ভাগ ছবি থাকত এই দুই ভাইয়ের আঁকা। আর থাকত কিছু কিছু ছবি অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ের আঁকা— তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, অসিতকুমার হালদার, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও আরো কেউ কেউ। তখন কলকাতা ভারতের রাজধানী, শীতের সময়ই রাজধানীর 'সিজন'। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সোসাইটির এই-সব প্রদর্শনী ছিল কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ— কেবল কলকাতার লোকের জন্যই নয়, সারাদেশের জন্য, কারণ 'সিজনে' কলকাতায় আসতেন না এমন হোমরাচোমরা ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন এই-সব প্রদর্শনীর প্রাণস্বরূপ। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন একটা উদার মাধুর্য ছিল যে তিনি বিদগ্ধজন থেকে সর্বসাধারণ সকল স্তরের মানুষকে কাছে টানতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল এবং তাঁর পরবর্তী লর্ড রোনাল্ডশে (পরে মার্কুয়েস অব জেটল্যাণ্ড), এঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতীয় কলার সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক রূপে এঁদের সহায়তা ও আনুকূল্য না পেলে সোসাইটি এতখানি প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। কেবল নামে পৃষ্ঠপোষকতা করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, সরকার থেকে যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করেছিলেন।

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের শিল্পীমন কেবল ছবি আঁকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না— তাঁদের চিত্ত ছিল বহুপ্রসারী। তাঁরা যে ৫ নম্বর বাড়িতে ছিলেন সেখানকার আসবাবপত্র ছিল সাবেকযুগের ভিক্টোরীয় ছাঁদে তৈরি। তাঁরা বাড়িঘর আসবাবপত্র নূতন করে ঢেলে সাজাতে শুরু করলেন। দুই ভাই মিলে নানা-রকম আসবাবের নকশা তৈরি করেন, আর সেই নকশা মাফিক জিনিস তৈরি করে আচারী বলে একজন সুদক্ষ সূত্রধর। আভ্যন্তরিক গৃহসজ্জায় তাঁরা যে নূতন রীতিপদ্ধতির সূচনা করেছিলেন, তা পরে কলকাতায়

অভিজাতসমাজে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের যুগল প্রচেষ্টার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল ৫ নম্বরের বৈঠকখানা, আসবাব ও পরিসজ্জায় প্রাচ্য নন্দনরীতির পরাকাষ্ঠা।

এই বৈঠকখানায় কত যে মধুর সন্ধ্যা কেটেছে তার স্মৃতি এখনো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ওস্তাদ বীনকার বীণার তারে ঝংকার দিচ্ছেন, স্তিমিত আলোয় দেখা যাচ্ছে দু-চার জন রসিক ব্যক্তি চওড়া ডিভানে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, এ ছবি তো সুস্পষ্ট মনে পড়ে। এই-সব অনুষ্ঠানের সময় আমি এক কোনায় আড়ালে চুপচাপ বসে অতিথি-অভ্যাগতদের দেখতাম। তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো স্বনামধন্য বিদেশী অতিথিও থাকতেন। যাঁদের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত পর্যটক ও দার্শনিক কাউণ্ট কাইজারলিং, আর্টিস্ট রোটেন্স্টাইন, অতুলনীয়া পাভলোভা, আদর্শবাদী ওকাকুরা, শিল্পসমালোচক আনন্দ কুমার-স্বামী, রুশদেশের প্রখ্যাত শিল্পরসিক গোলোবিউ, আনন্দ-উচ্ছল কার্পেলেস ভগ্নীদ্বয় এবং লর্ড কারমাইকেল।

লর্ড কারমাইকেলের কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে, এঁর সঙ্গে গগনদাদার কী গভীর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। আমার এই দাদাদের মতো যাঁরাই কারমাইকেলের নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সকলেই শিল্পরসিক বলে ও বাংলার কারুশিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য এঁর উৎসাহ দেখে, এঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য এঁর প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। এঁরই প্রস্তাবক্রমে বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রীজ অ্যাসোসিয়েশন সরকারি আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন এই অ্যাসো-সিয়েশনের যোগ্যতম সম্পাদক হবেন গগনেন্দ্র, তাই তাঁকেই এই ভার দিয়ে-ছিলেন। হগ্ স্ট্রীটের বিক্রয়কেন্দ্রে যে প্রচুর টাকার শিল্পসম্ভার কেনাবেচা হত তার পিছনে ছিল গগনদাদার অক্লান্ত চেষ্টা।

এই সময় গগনদারা প্রায় প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যেতেন। সেই পাহাড়ে যাবার স্মৃতিচিহ্নরূপে থেকে গেছে গগনদার আঁকা হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যায়ের ছবিগুলি। তুষারাবৃত হিমাচল সম্বন্ধে গগনদার মনে ভারি একটা অনুরাগ ছিল, হয়তো তার অনেকখানিই পেয়েছিলেন কালিদাসের কাব্য থেকে। পাহাড়ে থাকতে উনি নিজের পছন্দমাফিক তিব্বতি জোব্বা অথবা

'বোকু' তৈরি করিয়ে নিতেন— তাই হত তাঁর দার্জিলিঙের পোশাক। পরে এই তিব্বতি 'বোকু'র গগনেন্দ্র-সংস্করণ তাঁদের দুই ভায়ের এবং আমার বাবার বিশেষ পোশাকরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা— এ হল ঠাকুরবংশের ধারা।

কিছুদিন পরে ধারণা হল যে, এই শিল্পপ্রতিভার ধারাকে একটা প্রতিষ্ঠানের বাঁধাধরা রাস্তায় নিয়ন্ত্রিত না করলে তার অনেকটাই অপচয় হবে। তার ফলে 'বিচিত্রা ক্লাব' যার কথা কলকাতার অনেকে এখনো মনে রেখেছেন। গগনদাদা এ কাজে আমায় অকুণ্ঠ সহায়তা করেছিলেন। ক্লাবের প্রথম অধিবেশন বসেছিল লালবাড়িতে। অনেক মান্যগণ্য সদস্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন, আচার্য ব্রজেনাথ শীল ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। ক্লাবের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন সুরেনদা— অবশ্য যে ক্লাবে চাঁদা দেবার ব্যাপারে কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না তার আবার নিয়মতন্ত্র কী! ক্লাবের প্রতীকচিহ্নরূপে 'বিচিত্রা' কথাটা নন্দলাল বসু মহাশয় ভারি সুন্দর অক্ষরে কুঁড়েঘরের ধাঁচে এঁকে দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনের শেষ দিকে বাবা তাঁর অপ্রকাশিত রচনা থেকে পড়ে শোনালেন। অধিবেশন শেষ হল, সদস্যেরা দোতলা থেকে নেমে একতলার খাবার ঘরে জমায়েত হলেন, সেখানে বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা। চৈনিক প্যাগোডায় যেমন লাল ও সোনালি রঙের প্রাবল্য, সেইরকম রঙের সংযোগে গৃহসজ্জা। ক্লাব যতদিন টিঁকেছিল ততদিন নিত্যনূতন গৃহসজ্জায় খাবার ঘর সাজানো হত ও আহার্যবস্তুরও বৈচিত্র্যবিধান হত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওকাকুরা দুজন তরুণ জাপানি আর্টিস্টকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। গগনদার অতিথিরূপে তাঁরা কলকাতায় থেকে যান। মেঝের উপর বসে তাঁরা যখন রেশমের থানের উপর তুলি দিয়ে রেখা টেনে ছবি সৃষ্টি করতেন, সে এক দেখবার মতো ব্যাপার ছিল। যেমন ক্ষিপ্র তেমনি নিপুণ ছিল তাঁদের কালিতুলির কাজ— সে কাজ দেখার জন্য সমস্ত বাড়ির লোক ভেঙে পড়ত। এই দুজন চিত্রকরের মধ্যে একজন ছিলেন টাইকান— ইনি বর্তমানে জাপানের বিখ্যাত বিজিৎসুইও স্কুলের অধিনেতা। গগনেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের আঁকা ছবি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর উপর জাপানি চিত্রশৈলীর প্রভাব গভীর হয়ে পড়েছিল। জাপানি চিত্রশিল্পের প্রতি

এই গভীর অনুরাগবশত অনেক কাল পরে বিচিত্রা ক্লাবের তত্ত্বাবধানে কাম্পো আরাইসান নামে আর-একজন জাপানি আর্টিস্ট কলকাতায় আসেন জাপানি প্রথায় ছবি আঁকা শেখাবার জন্য।

বিচিত্রা ক্লাবের কার্যক্রম ছিল বিচিত্র। সকালবেলা ক্লাব পরিণত হত কলাভবনে, নিজের নিজের স্টুডিওতে বসে সে সময় নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর ছবি আঁকতেন। নারায়ণ কাশীনাথ দেবল তৈরি করতেন মাটির মূর্তি আর মুকুল দে এচিং-এর কাজ করতেন। তাঁদের আশে-পাশে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ঘুরঘুর করতেন। প্রথম যাঁরা ভরতি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার স্ত্রী প্রতিমা। সন্ধ্যায় লাইব্রেরি ছিল লোক জমায়েত হবার কেন্দ্র। সপ্তাহে একদিন করে স্টুডিও আবার পরিণত হত আর্টিস্ট, লেখক ও সংগীতজ্ঞদের সামাজিকতা চর্চার কেন্দ্রে! প্রায়ই হত অভিনয় ও গানবাজনার জলসা।

অচিরে আরো অনেকগুলি কাজ বিচিত্রার কার্যক্রমে স্থান পেল— বাংলা-দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে ভালো ভালো কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা তার অন্যতম। একজন উৎসাহী যুবক নিযুক্ত হলেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে আলপনা, ছুঁচের ফোঁড়ের রকমারি কাজ, মাটির বাসন, বাঁশ ও বেতের ভালো ভালো কাজের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। পরে কিছু কিছু আলপনার নকশা, ছেলেভুলানো ছড়া ও পল্লীগ্রামের ব্রতকথা— অবনীন্দ্রনাথ 'বাংলার ব্রত' বইয়ে একত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

গগনেন্দ্রনাথের মনে হাস্যরসের একটি ধারা প্রচ্ছন্ন ছিল, এই সময় তা প্রকাশ পেল ব্যঙ্গচিত্রের আকারে। পত্র-পত্রিকায় যে দুটি-একটি ছবি বেরল তা সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই-সব ব্যঙ্গচিত্রের কপি সংগ্রহে লোকের আগ্রহ দেখে, বিচিত্রা ক্লাবে নূতন একটি বিভাগ যুক্ত হল— একটি পুরানো লিথোপ্রেস কেনা হল, ছাপার কাজে অভিজ্ঞ বুড়ো একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হল প্রেস চালাবার জন্য। সকালবেলা গগনেন্দ্রনাথ একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকলেন, বিকেলেই সে ছবি ফেলা হত পাথরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাপা শুরু হয়ে যেত আর্টিস্টের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। এইভাবে ব্যঙ্গচিত্রের দুটি অ্যালবাম্ ছাপা হয়ে বের হয়। বাজারে তার কাটতিও হল বেশ।

বিশ্বভারতীর দাবি অগ্রগণ্য হওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে বিচিত্রা ক্লাবের কাজ

হ্রাস পেতে থাকে ও শেষপর্যন্ত ক্লাব উঠে যায়। ক্লাবের আর্টিস্ট অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর— এক এক করে শান্তিনিকেতন কলাভবন গড়ে তোলার কাজে যোগ দেন। যে কটি বছর বিচিত্রা ক্লাব টি'কে ছিল, কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ঐশ্বর্যময় করে তোলার জন্য অনেক কিছু করেছে। অবশ্য এই কৃতিত্বের পিছনে ছিল, বাবা, গগনদা ও অবনদার ব্যক্তিত্বের দান। মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান লোক'ও যদি একযোগে কাজ করেন তা হলে তাঁদের উদ্যমে আর-পাঁচজনের সৃজনীশক্তিও কিরকম স্ফূর্তি লাভ করতে পারে— বিচিত্রা ক্লাব তা প্রমাণ করেছে। আমি শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই ক্লাবের কৃতিত্বের কথাটাই বেশি করে বলেছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর দান নগণ্য নয়। ক্লাবের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তদানীন্তন কালের অধিকাংশ সাহিত্যিকই যোগ দিতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ও বাবার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য লেখা এই-সব অধিবেশনে প্রথম পঠিত হয়। সাহিত্যের মাধ্যমরূপে সংস্কৃতবহুল সাধুভাষার বদলে চলতি ভাষা প্রয়োগের পক্ষে সবুজ পত্র যে আন্দোলনের সূচনা করে— তার সূত্রপাত হয় এই বিচিত্রা ক্লাব থেকেই। এটা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

নাটক ও অভিনয়

আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নাটক রচনা ও অভিনয়ের একটা মস্ত স্থান ছিল। বাবা ছিলেন এই পরিবারিক ঐতিহ্যের ধারক। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স থেকেই তিনি নাটক রচনা শুরু করেন এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের দিয়ে সেই-সব নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য অধিকাংশ সময়ে নিজের লেখা নাটকের দুরূহ কিংবা বড়ো বড়ো ভূমিকায় তিনি নিজেই নেমেছেন।

প্রত্যক্ষভাবে নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে আমার স্মৃতি আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম পর্ব থেকে। বাবা সে সময় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হবার যোগ্য নাটক রচনা করছেন। এগুলিকে শান্তিনিকেতন-পর্বের নাটক বলা চলতে পারে। এর আগে লেখা নাটকগুলির মূল রস ছিল রোম্যান্টিক ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত। শান্তিনিকেতন-পর্বের তিনটি নাটক— 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'-র রস ছিল পূর্বরচিত নাটক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' লেখা হয়েছিল পরিচিত প্রচলিত আঙ্গিকে। পরবর্তী যুগের 'ডাকঘর', 'রাজা', প্রভৃতি নাটককে বলা চলে রূপক-নাট্য অথবা তত্ত্বধর্মী নাটক। মাঝখানের এই তিনটি নাটক যেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র— এগুলিতে নাটকের বিষয়বস্তু সহজ ও সংহত হয়ে এসেছে, কিন্তু রূপক-নাট্যের কিছু কিছু লক্ষণ এদের মধ্যে স্পষ্ট। শান্তিনিকেতন-পর্বের নাটকগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। আশ্রম-বিদ্যালয় তখন কেবল ছাত্রদের বিদ্যালয়, ছাত্রীরা যোগ দেয় পরে, সুতরাং স্ত্রীভূমিকা না থাকার কারণ সহজেই অনুমেয়।

আমার ধারণা, শান্তিনিকেতনে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হয় শারদোৎসব রচনার বেশ কয়েক বছর আগে। ১৯০২ সালের শীতকালে আশ্রমে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। তখন আমাদের না ছিল স্টেজ, না পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। উৎসাহ দিয়ে আমরা এই-সমস্ত অভাব পূরণ করে নিয়েছিলাম। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই কম, তাই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় ও আমি— এই তিনজনকে একাধারে প্রধান উদ্যোক্তা, প্রযোজক

ও কুশীলবরূপে অবতীর্ণ হতে হল। এনট্রান্স পরীক্ষা তখন নিকটবর্তী, তবু নিয়মিত আমাদের মহড়া চলল। আমাদের অধ্যাপকেরা আতঙ্কিত হয়ে বাবার কাছে দরবার করলেন যে, অভিনয়ের পরিকল্পনা যদি অগৌণে বাতিল না করা হয় তা হলে পরীক্ষায় পাস করার আশা সুদূরপরাহত। বাবা কিন্তু এঁদের কথায় কান দিলেন না। মহড়া চলতে লাগল আগের মতো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো— নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে মাস্টারমহাশয়দের আপত্তি পরবর্তী কালেও মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু বাবার প্রশ্রয়ের দরুন তাঁরা খুব বেশি সুবিধা করতে পারতেন না।

গ্রন্থাগারের পিছনে একটা নড়বড়ে ধরনের চালাঘর ছিল, তখনকার দিনে তাই ছিল আমাদের খাবার ঘর। আমরা ঠিক করলাম এই ঘরেই আমাদের স্টেজ খাটাব আব দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা করব। স্টেজ তৈরির একমাত্র উপকরণ ছিল কতকগুলি ভাঙা খাট। তা হলে কি হয়, কলকাতা থেকে একজন আর্টিস্ট এলেন সীন তৈরি করতে। তুলি চালানোয় এঁর হাত বেশ পাকা, ছেঁড়া কাপডেব পবদায় রঙ-তুলি দিয়ে ইনি একরকম ভাড়াটে থিয়েটারি ধরনের সীন বেশ ঝট্‌পট্‌ এঁকে ফেলতে পারতেন। মানুষটি নিজেও ছিলেন একটু অদ্ভুত নাটুকে ধরনেব। হরিশ্চন্দ্র হালদার— এই পুরো নামে ওঁকে খুব কম লোকই চিনত, বেশির ভাগ লোকের কাছে উনি ছিলেন হ. চ. হ.। আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়িতে ওঁর সম্বন্ধে নানা রকম মজার গল্প প্রচলিত ছিল। যতদূর মনে পড়ে গগনদা একবার এঁর একটি ব্যঙ্গচিত্রও এঁকেছিলেন। 'গল্পসল্প' বইয়ে বাবার লেখা এক গল্পে হ. চ. হ. -র উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের তখন ছেলেবয়স, রঙচঙে সীন দেখে আমাদের সব তাক লেগে গেল। হস্টেল থেকে সব ভাঙা খাট একত্র জড়ো করা হল, কিছু পাতা হল শুইয়ে, কিছু রাখা হল উঁচু করে। দাঁড়করানো খাটগুলোর গায়ে পেরেক মেরে হ. চ. হ. -র আঁকা সীন খাটিয়ে দেওয়া হল। এমনি সব ছেলেমানুষি সত্ত্বেও অভিনয় উতরেছিল খুব ভালো। আর কিছু না হোক, আমাদের মধ্য থেকে দু-চারজনকে বাবা আবিষ্কার করলেন অভিনয়ে যাদের স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। নক্ষত্রমাণিক্যের অভিনয় নয়ন করেছিল চমৎকার। বেচারি অল্পবয়সে মারা গেল, বাবার শেষবয়সের নাটক অভিনয়ের জন্য তাকে আর পাওয়া যায় নি। রঘুপতির ভূমিকায় জগদানন্দবাবুর অপূর্ব অভিনয় দেখে বাবা বুঝেছিলেন

এ ব্যক্তিটি লাখে এক। এর পর যখনই কোনো অভিনয় হত, জগদানন্দবাবুকে ছাড়া হত না।

'শারদোৎসব' অভিনয় যখন প্রথম হল, আশ্রমের চেহারা অনেকখানি পালটে গেছে। আদি কুটিরের পুবদিকে একটি পাকা বাড়ি তোলা হয়েছে ছেলেদের হস্টেল হিসেবে। মস্ত লম্বা-চওড়া হলঘরের মতন এই বাড়ি, অভিনয়ের পক্ষে প্রশস্ত। অবশ্য ছাদ একটু নিচু, কিন্তু কোথায় সেই খাবার ঘরের চালা আর কোথায় এই পাকাবাড়ি! প্রথম থেকেই নাটক অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল বলে এই বাড়ির নাম হল 'নাট্যগৃহ'। ততদিনে ছাত্রসংখ্যা একশোর কোঠায় পৌচেছে এবং সেই অনুপাতে মাস্টারমহাশয়দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর কুশীলব খুঁজতে হয়রান হতে হয় না, প্রচুর লোক আছে, বেছে নিলেই হল। ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতিকে পেয়ে বাবার খুব সুবিধা হল। অভিনয়ের জন্যে লোক বাছাবাছির ব্যাপারে বাবা খুব সতর্ক ছিলেন, বেজায় কড়া ছিল তাঁর মানদণ্ড। তাঁর ইচ্ছাক্রমেই তখনকার দিনে অভিনয়ের মহড়া হত খোলা জায়গায়— তিনি চাইতেন আশ্রমবাসী সবাই এসে দেখুক, শুনুক, শিখুক ; আশ্রমের শিক্ষার এও একটি অঙ্গবিশেষ। এইভাবে শিল্পকলার বোধ, সংগীতের চর্চা প্রভৃতি ধীরে ধীরে আশ্রমের জীবনে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে। শিক্ষকরূপে এইখানেই বাবার কৃতিত্ব। তখনকার দিনে গানের জন্য কোনো আলাদা ক্লাস ছিল না। কিন্তু আশ্রমের প্রায় সকলেই গাইতে পারত, গান ছিল আবহাওয়ায় সঙ্গে ওতপ্রোত। আমি এমন বলব না যে অনেকেই অভিনয়ও করতে পারত। তবে এ কথা সত্যি যে পরবর্তী কালে বাবার অভিনেতা নির্বাচনের পরিধি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল, সুতরাং কোনো নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে খুব বেশি বেগ পেতে হত না। দুঃখের বিষয় আশ্রম বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এবং ঘন ঘন আগন্তুক সমাগমের ফলে খোলা আকাশের নীচে গান ও অভিনয়ের মহড়া দেওয়া আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। এটা পরবর্তী কালের ছাত্রদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে, কারণ বাবার অভিনয় শিক্ষা দেবার প্রণালী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ছিল।

শরৎঋতুর সমাগমে আশ্রমের নৈসর্গিক শোভা 'শারদোৎসব' নাটকের যেন মুখ্য চরিত্র। প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে এমন সংগতি খুব কম নাটকেই দেখা

যায়। যারা এই নাটকে যোগ দিয়েছিল তারা যেন সেই প্রকৃতিরই অঙ্গবিশেষ —সুতরাং অভিনয়ে জড়তা বা কৃত্রিমতা ছিল না বললেই হয়। এই অভিনয়ে কিছু কিছু অতিথি-অভ্যাগত কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা এরকম সহজ স্বাভাবিক অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শারদোৎসবের সাফল্য বাবাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে পর পর 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা' ও 'অচলায়তন' রচিত ও শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। বিদ্যালয়ের এক-একটি পর্বের শেষে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেন বিদ্যালয়ের কৃত্য হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে ক্রমেই বেশি সংখ্যায় বন্ধুবান্ধবেরা অভিনয় দেখবার ইচ্ছায় আসতে থাকেন, তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাবা আবার এমন অতিথি-পরায়ণ ছিলেন যে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না।

'রাজা' অভিনয় দেখে দর্শকের দল মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁদের মনে যথেষ্ট সংশয় থেকে গিয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে এই সময়ে লেখা বাবার নাটক সম্বন্ধে কলকাতার কোনো কোনো সাহিত্যগোষ্ঠী প্রচার করতে থাকেন যে, এগুলি সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত; ধোঁয়াটে, আবছা ও অর্থহীন এদের রূপক এবং সচরাচর নাটকে যে গতি থাকে, তা এ-সবের মধ্যে অনুপস্থিত কিংবা নিতান্তই স্তিমিত। এরকম প্রচারের কাজ বেশ কিছুকাল ধরে চলতে থাকে। অবশ্য এই-সব ধারণার একমাত্র জবাব ছিল বার বার এই-সব নাটকের অভিনয় লোকের সামনে উপস্থিত করা। বাবা তাই করেছিলেন।

অ্যান্‌ড্রুজ সাহেবের সংবর্ধনা উপলক্ষে 'অচলায়তন' নাটক অভিনীত হয় ১৯১৪ সালে। 'শারদোৎসব' ও 'অচলায়তনে'র বিশেষত্ব ছিল এই যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে অল্প বয়সের ছেলেরাও এ দুটি নাটকের অভিনয়ে যোগ দিয়েছিল। অভিনেতাদের বয়সের তারতম্য সত্ত্বেও পরস্পরের সহজ মেলা-মেশার মধ্যে দিয়ে এমন সুন্দর অভিনয় যে হতে পারত তার কারণ, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সুন্দর একটা স্নেহসম্বন্ধ ছিল। ১৯১৪ সালের এই অভিনয়ে মহাপঞ্চকের ভূমিকায় জগদানন্দবাবু অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে তিনি গানের দলের অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত। ঠাকুরদার ভূমিকায়

ক্ষিতিমোহনবাবুর অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। বাবা হয়েছিলেন আচার্য। এই অভিনয়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল শোণপাংশু দলে পিয়ার্সনের আবির্ভাব। সাহেব সুন্দর বাংলা বলতেন, কিন্তু 'আর খেঁসারির ডাল' বলতে গিয়ে রোজই তাঁর জিভে কেমন জড়তা এসে যেত— উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকেরা তা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত। বাবার খুব আগ্রহ ছিল যে, আশ্রমে যে-সব বিদেশী এসে বসবাস করবেন, তাঁরা যেন আশ্রমের নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। কেবল পিয়ার্সন নন, বিভিন্ন সময়ে এল্‌মৃহর্স্ট, হ্যারি টিম্বার্স ও তাঁর স্ত্রী, 'হৈমন্তী' চক্রবর্তী ও আরো অনেকে অভিনয়ে নেমেছেন।

কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি নূতন রসের সঞ্চার হয় যখন বাবার নাটক শান্তিনিকেতন আশ্রম ও জোড়াসাঁকো-বাড়ির সহযোগে নিয়মিত কলকাতায় অভিনীত হতে থাকে। 'ফাল্গুনী' অভিনয় দিয়ে এর সূত্রপাত। ১৯১৫ সালের বসন্তকালে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাবা শ্রীনিকেতনে থাকতে এই নাটক রচনা করেন। রচনার অল্প কিছুদিন পরেই শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী' অভিনীত হল। কলকাতায় প্রথম অভিনয়ের দিন যাঁরা দুই আশ্রমবালকের মুখে 'ওগো দখিন হাওয়া' গানটি শুনেছেন, বছরে বছরে ফিরে ফিরে যখন বসন্ত আসে, তাঁরা নিশ্চয় সেই মধুর কণ্ঠের গান স্মরণ করে থাকেন। 'ফাল্গুনী'র রস অন্য নাটকের রস থেকে স্বতন্ত্র। 'ফাল্গুনী'র সেই বিশেষ রসবস্তুকে প্রকাশ করার জন্য মঞ্চসজ্জা ও অন্যান্য আঙ্গিকের দিক থেকে নানা রকম নূতন আইডিয়ার আমদানি করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে সবসময়েই 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'-র অভিনয়ে চিত্রবিচিত্র সীনের ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। শিল্পচাতুর্যের দিকে খুব বেশি দৃষ্টি না দিয়ে, প্রকৃতির আপন হাতের রচনা ইতস্তত স্টেজের উপর সাজিয়ে দেওয়া— এই ছিল রীতি। 'ফাল্গুনী'তে এই ধরনের সজ্জার সুযোগ বেশি করে পাওয়া গেল, স্টেজের উপর তৈরি হল প্রায় একটা আস্ত বাগান— গাছে ফুল ফুটে আছে, গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে দোলনা। স্টেজ সাজানোতে কাপড়ের ব্যবহার আরো পরে, যখন মঞ্চসজ্জাশিল্পীরা শিল্পরুচির প্রতি বিশেষ করে মনোযোগী হন।

পরবৎসর (১৯১৬) মাঘোৎসবের পর কলকাতায় ফাল্গুনীর অভিনয় করা স্থির হল বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যকল্পে— মাঘোৎসবে উপাসনা করতে

বাবা এই সময় কলকাতায় আসতেন আর শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও আসত উৎসবে গান করতে।

আমি তখন কলকাতায় আছি বিচিত্রা ক্লাবের কাজ নিয়ে। কাজেই অভিনয়ের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করার ভার পড়ল আমার উপর। এই প্রথম শান্তিনিকেতনের দল কলকাতায় টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করবে। এ-সব ব্যাপারে আমি তখন নিতান্ত অনভিজ্ঞ। বিরাট এক দায়িত্ব এসে চাপল আমার কাঁধে— আমি তো দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলাম। প্রথম যেদিন টিকিট বিক্রি শুরু হল, দেখা গেল সামান্যই বিক্রি হয়েছে। সেদিন সন্ধেবেলা আমি শান্তিনিকেতনের একদল প্রাক্তন ছাত্রকে ডেকে পাঠালাম— এরা কলকাতার বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনো করে। এদের বললাম কলেজে-কলেজে, এদিকে-ওদিকে যেন প্রচার করে বেড়ায় যে পরের দিন সকাল সকাল এসে যদি লোকে টিকিট না কেনে, তা হলে 'ফাল্গুনী' অভিনয় দেখবার আশা দুরাশা। ফলে, তার পরের দিন টিকিট-ঘরের সামনে অগুনতি লোক। একটিও আসন খালি রইল না। প্রত্যেকটি টিকিট বিক্রি হয়ে গেল, যদিও দর ছিল বেশ চড়া। অভিনয়ের সন্ধ্যায় কেউ কেউ একশো টাকা দিল কেবল দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখার জন্য। সব খরচ-খরচা বাদ দিয়েও আমরা অভিনয় করে বাঁকুড়াদুর্ভিক্ষ-ত্রাণসমিতির হাতে নগদ আট হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলাম। পরে শান্তি-নিকেতন থেকে যে-সব অভিনয় হয়েছে টিকিট বিক্রি করে, তা থেকেও টাকা মন্দ ওঠে নি। কিন্তু 'ফাল্গুনী' থেকে যত টাকা উঠেছিল, তেমন বোধ করি আর কখনো হয় নি।

বাবার সৃষ্টিশীল মন সবসময় বৈচিত্র্য অন্বেষণ করত, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ওঁর কাছে অসহ্য ছিল। দেখা যেত অভিনয়ের অব্যবহিত আগে তিনি নানা রকম কাটাকুটি অদলবদল করে চলেছেন। মহড়ার একেবারে শেষদিন পর্যন্ত চলত এই রকম পরিবর্তনের পালা, কখনো-বা পরপর দুই রাতের অভিনয়ের মাঝখানে অনেক কিছু বদলে যেত, ফলে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হত। যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে তার স্টেজকপিগুলো রক্ষা করলে একটা বিচিত্র সংগ্রহ হতে পারত।

সুতরাং বছরখানেক আগে শান্তিনিকেতনে যে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হয়ে গেছে, তার সঙ্গে কলকাতার 'ফাল্গুনী'র যে অনেক তফাত থাকবে— এতে

আর আশ্চর্য কি! একেবারে শেষ মুহূর্তে, মহড়া যখন পুরোদমে চলছে, বাবা 'ফাল্গুনী'র একটি ভূমিকা লিখলেন সংলাপ-আকারে; নাম দিলেন 'বৈরাগ্য-সাধন'। এর জন্য প্রয়োজন হল সম্পূর্ণ আলাদা একদল অভিনেতার। আমার মনে হয় বাবা এই উপক্রমণিকা লেখেন এই ভেবে যে লোকে হয়তো সহজে তাঁর এই নূতন ধরনের নাটক বুঝতে পারবে না। হয়তো তাঁর মনে মনে এও বাসনা ছিল যে, তাঁর তিন অভিনয়দক্ষ ভ্রাতুষ্পুত্র— গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র এই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মনে হয় 'বৈরাগ্যসাধন' যেন এই তিন ভাইয়ের কথা ভেবেই লেখা হয়েছিল।

স্টেজ খাটানো হয়েছিল আমাদের বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। মঞ্চসজ্জা তৈরি করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর। ইতস্তত বাস্তবের ছোঁয়া থাকলেও, চেষ্টা ছিল সে সজ্জা ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে নাটকের তাৎপর্য তুলে ধরা। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতি-পরিবেশ রচনার একটা বাস্তবানুগ প্রচেষ্টা ছিল, এবার তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হল। দর্শকদের সব চেয়ে বেশি অভিভূত করে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় বাবার গান ও অভিনয়। বাবার গানের গলায় তখনো বেশ জোর ছিল, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে' এই গান গাইতে গাইতে বাবা অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন, গানের রেশ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল: তখন দর্শকদের পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠল। 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রধান উপজীব্যই ছিল গান; আর অপূর্ব হয়েছিল সেই গান— বাবা, দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও শান্তিনিকেতনের ছেলেদের কণ্ঠে। অজিতকুমার চক্রবর্তী গাইলেন 'আমি যাব না গো এমনি চলে'— আমি তাঁর কণ্ঠে যে-সব গান শুনেছি, তার মধ্যে এই গানের স্মৃতি সবচেয়ে উজ্জ্বল।

এরপর ১৯১৭ সালে বাবা 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হলেন— মহড়া হচ্ছে কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে নয়। এবারকার অভিনয়ে শান্তি-নিকেতনের দান হল অমল— বিদ্যালয়ের একটি ছোট্ট ছেলে। নাটকের বাকি চরিত্র কলকাতাতেই সংগৃহীত হল, মহড়া ও অভিনয় হল বিচিত্রা-'হলে'। নাটক হিসেবে 'ডাকঘর' প্রায় কাব্যধর্মী। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বাবা যে তত্ত্বের কথা বলতে চেয়েছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছে সহজ সরল কাব্যময় ভাষায়। এ নাটক আয়তনে যেমন ছোটো, এতে চরিত্রও তেমনি অল্প

কয়েকটি। অতিরিক্ত কথা এতে একটিও নেই, আর প্রত্যেকটি বাক্যই দ্যোতনাপূর্ণ।

খুব সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম নাটক অভিনয় করতে পারেন তেমন রসজ্ঞ ও সুদক্ষ অভিনেতার সম্মিলন একরকম ঘরে বসেই হয়ে গেল। বাবা স্বয়ং নামলেন ঠাকুরদা ও প্রহরীর ভূমিকায়, অবনীন্দ্র হলেন কবিরাজ ও মোড়ল, গগনেন্দ্রনাথ মাধব, দিনেন্দ্রনাথ নামলেন ঠাকুরদার চেলা হয়ে আর অসিত হালদার দইওয়ালা। অমলের ভূমিকায় আশামুকুলের নির্বাচন সার্থক হয়েছিল— সে যেন ওই ভূমিকার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিল। নাটকের একমাত্র স্ত্রীচরিত্র অমলের খেলার সাথি সুধার ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে অপূর্ব অভিনয় করেছিল। শেষ দৃশ্যে অমলের মৃত্যুর পর সুধা যখন এসে তাকে ডাকল, 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে' শুনে বলল, 'ও যখন জাগবে তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে ? ··বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি,' তখন যে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছিল তা বোধ হয় স্বয়ং নাট্যকারও কল্পনা করেন নি।

স্টেজ বাঁধা হয়েছিল বিচিত্রা হলের একপ্রান্তে, খালি জায়গাটুকুতে বড়ো জোর দেড়শো লোকের মতো বসবার ব্যবস্থা। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারত না। নাটকের অনেক সব সূক্ষ্ম ভাব এই অন্তরঙ্গ পরিবেশে যেমন ফুটে উঠেছিল, তেমনটা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভবপর হত না। স্টেজের পরিকল্পনা ছিল গগনদার, দুঃসাহসিকভাবে নূতন। স্টেজের উপর তিনি খাড়া করেছিলেন সত্যিকার একটি কুটির; তার খড়ের চাল, ছিটে বাঁশের বেড়া, কুলুঙ্গি, আসবাবপত্র, আলপনা— সমস্ত মিলিয়ে শাদাসিধে অথচ সুন্দর এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে বোদ্ধা লোকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, যথার্থ শিল্পীর চোখ ও রুচি না থাকলে এমনটা সম্ভব হয় না।

প্রথমে কথা ছিল অভিনয় হবে কেবল বিচিত্রা ক্লাবের সদস্যদের জন্য। কিন্তু এই অপূর্ব অভিনয়ের খ্যাতি মুখে মুখে এমনি ছড়াল যে একাধিকবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হল। এক-একবার অভিনয় শেষ হয়, আর আমি বলি এবার স্টেজ উঠিয়ে দিই, আবার অভিনয়ের অনুরোধ আসে। অমলের সেই তিনদিকে-দেয়াল-ঘেরা কুঁড়েঘরের বারান্দা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বিচিত্রা হল-এর অঙ্গাঙ্গী হয়ে খাড়া ছিল। শেষ দিনের অভিনয়ে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে আগত বিভিন্ন

প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। যতদূর স্মরণ হয় এটি ছিল সপ্তম অভিনয়রজনী। দর্শকদের মধ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সর্বজনমান্য মহিলা প্রেসিডেণ্ট অ্যানি বেসাণ্ট, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য টিলক ও আরো অনেকে। রচয়িতা, প্রযোজক, অভিনেতা, দর্শক— সকলেই এই অভিনয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছিলেন, অন্য কোনো নাটক সম্বন্ধে সেরকম বলা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চসজ্জার এমন দুর্লভ মিলন কদাচিৎ ঘটে।

পরেশনাথ

বিচিত্রা ক্লাবের কাজে আমায় কলকাতায় কয়েক বছর থাকতে হল। তার পর শান্তিনিকেতনের দাবি এড়িয়ে চলা যখন ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠল, আমায় গিয়ে বাসা বাঁধতে হল শান্তিনিকেতনে। মাঝে একটা সময় আমি ব্যবসাতে নেমেছিলাম— বিচিত্রা ক্লাবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে, মোটর-কারখানার কাজ হাতে নেওয়া, বেশ বড়োরকমের একটা পরিবর্তন বলতে হবে। ব্যবসাতে ফেল পড়া ঠাকুর-পরিবারের বংশের ধারা, সুতরাং আমার বেলাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। তবে মোটর চালনা ছিল আমার বাতিক-বিশেষ, সুতরাং বেশ কয়েকটা দিন নূতন নূতন মডেলের মোটরগাড়ি কিনে এবং খুশিমতো গাড়ি হাঁকিয়ে, সময়টা নেহাত মন্দ কাটে নি। ব্যবসার উপলক্ষ করে ঘন ঘন কলকাতার বাইরে মোটরে ঘুরে বেড়ানোও গেল। বেশির ভাগ সময় বেড়াবার জায়গা ছিল ছোটনাগপুর। সভ্যতার পরুষহস্ত তখনো পর্যন্ত ছোটনাগপুরের বন্য সৌন্দর্য হরণ করে নি। পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝে মাঝে সমতলভূমি, লোকজনের বসবাস, ধানখেত, বনজঙ্গল, তার গা-ঘেঁষে পাহাড়ে নদী— বর্ষায় দুরন্ত, খরার সময় ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জলের ধারা, শাল-মহুয়ার জঙ্গলে বন্যপশুদের আসা-যাওয়া— এ সমস্ত আমায় তীব্রভাবে আকর্ষণ করত।

এক নিদাঘতপ্ত দুপুরবেলা, গিরিতট দিয়ে মোটরযোগে গড়িয়ে চলেছি, সর্ব অঙ্গ রৌদ্রে যেন ঝলসে যাচ্ছে— এমন সময় চোখে পড়ল পরেশনাথ পাহাড়ের মাথায় শীতল সবুজ ছায়া। ঝাঁ করে ব্রেক কষা গেল। পরেশনাথ পাহাড় খাড়া উঠেছে চারহাজার ফুট, চারপাশে তার বেঁটেখাটো পাহাড় ও টিলা, যেন লিলিপুটদের দেশে গালিভার। ভূতত্ত্ববিদ্ কী বলবেন জানি না, আমার মতো আনাড়ির পক্ষে কতকগুলো নিচুমাথা ঢিবির মাঝখানে উঁচুমাথা পরেশনাথের আবির্ভাব পরম বিস্ময়ের বিষয়। চতুর্দিকের সমতলভূমিকে তুচ্ছ করে পরেশনাথ যেন খাড়া উঠে গেছে। নিঃসঙ্গ মহিমায় পরেশনাথের সৌন্দর্য অতুলনীয়। অথচ এমন তার সৌষ্ঠব— প্রথম দর্শনে মনে হয় এক লাফে বুঝি পরেশনাথের চুড়োটা ছুঁয়ে আসা যায়। অন্ততপক্ষে আমাদের তো সেইরকমই

মনে হয়েছিল। আমরা বেশ নিরুদ্‌বেগে মোটর থেকে নেমে সোজা পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। এর জন্য যে কোনো প্রস্তুতির দরকার, সে আমাদের মনেও হল না।

পায়ে-চলা উতরাই পথের প্রথম পর্ব যেখানে শেষ হল, সেখানে একটি সুন্দর জৈন ধর্মশালা। ধর্মশালার সাধু আমাদের দুঃসাহস দেখে নিশ্চয় মনে মনে হেসে থাকবেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, আমাদের প্রতি কারুণ্যবশতই যেন তিনি তরমুজের মতো প্রকাণ্ড একটি পেঁপে উপহার দিলেন। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে এই অদ্ভুত উপহার গ্রহণ করা গেল, কাষ্ঠহাসি হেসে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হল। আবার খানিকটা উতরাই পথ অতিক্রম করার পর দেখা গেল তিনি চারজন বাহকসমেত আমার স্ত্রীর জন্য একটি ডুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রতিমাই ছিলেন আমাদের দলে একমাত্র মহিলা। এবার বোঝা গেল, জৈন সাধুটি যথার্থই করুণাময়, কেননা ততক্ষণে চড়াই ভেঙে পথ বেয়ে পাহাড়ে ওঠার উৎসাহে অনেকখানি ভাঁটা পড়েছে।

পেঁপেটির সদ্‌গতি হয়ে গেল অনতিবিলম্বে। কিছু যাত্রী নেমে আসছে দেখা গেল— অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসার আগেই ধর্মশালায় পৌঁছবার জন্যে তারা পা চালিয়ে চলেছে। কেউ কেউ আমাদের সাবধান করে বলে গেল যে তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারলে বিপদ আছে। একটি বৃদ্ধা আমার দু-হাত ধরে সজল চোখে বলল, সময় থাকতে থাকতেই যেন আমরা নেমে যাই, দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে যেন ভুল না করি। কিন্তু তরুণ বয়সের তাজা রক্ত কি আর সে সাবধানবাণীতে কান দেয়! আমাদের মাথার উপর উন্নতশীর্ষ শালগাছের জঙ্গল, তারই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সুদূর হাজারিবাগের প্রান্তরেখায় সূর্য যেন একমুঠো রাঙা আবির ছড়িয়ে ধীরে ধীরে অস্ত গেল। একটু একটু করে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঝিঁঝিপোকার একটানা ডাকের ফাঁকে কানে এল নিশাচর পশুপাখিদের নানারকম শব্দ। ডুলির বেয়ারারা নিজেদের ভয় ভাঙাবার জন্য মাঝে মাঝে হেঁকে উঠল 'রাম রাম'। রাত্রের আকাশে তাদের সেই হাঁক-ডাক কোথায় যেন মিলিয়ে গেল— প্রতিধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেল না। ততক্ষণে আমাদের উৎসাহ স্তিমিত, শরীর-মন ক্লান্তিতে অবসন্ন। কোনোপ্রকারে তো পরেশনাথ শিখরের ঠিক নীচে তীর্থযাত্রীদের যে আস্তানা— সেইখানে পৌঁছানো গেল। পৌঁছে দেখি দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। অগত্যা এদিক

ওদিক থেকে সংগৃহীত কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালানো হল এবং তার চারপাশে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। ঘুম ভাঙল যখন সূর্যের আলো তীব্র হয়ে পড়েছে চোখের পাতার উপর। চোখ রগড়ে দেখি আমরা যেন চারি দিকের পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে বসে আছি। পরেশনাথ মন্দিরের শাদা ধবধবে মারবেল পাথরের চুড়ো অবশ্য আমাদের আস্তানা থেকেও কয়েক ধাপ উঁচুতে। সূর্যের প্রথম আলোর স্পর্শে শাদা মারবেল পাথর ঝকঝক করছে। সর্বাঙ্গে ব্যথা, তবুও সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। আমাদের মনে অদম্য কৌতুহল— ধনকুবের জৈনদের মহা-গুরু পরেশনাথের মন্দিরে না জানি কত ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। ভিতরে ঢুকে দেখি, সদ্যঃস্নাতা শুচিস্নিগ্ধ বিধবার বেশ— শ্বেতমর্মরের মেঝে, দেয়াল, ছাদ কোথাও লেশমাত্র মলিনতা নেই। উপকরণহীন পরিচ্ছন্নতার মাঝখানে একটি মাত্র সামগ্রী যা চোখে পড়ল সে হল জৈন তীর্থংকরদের বচনামৃত সংগ্রহের একখানি মহাগ্রন্থ। মনে হল আমরা যেন দাঁড়িয়ে আছি ভারতসাধনার এক সর্বোচ্চ গিরিশিখরে।

গিরিডি

পরেশনাথ-পর্ব আমার মনের উপর একটি গভীর দাগ কেটে থাকবে— তা না হলে অনেক বছর পরে আবার কেন আমি প্রতিবেশী অঞ্চলে অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে গিরিডি শহরে গেলাম! নিশ্চয় স্মৃতির পটে সেই নিঃসঙ্গ গিরিশিখর, সেই তুষারধবল মন্দিরচূড়া বার বার ভেসে উঠে থাকবে।

আমার অনেকদিনের বান্ধবী একজন সেই সময়ে লেখা আমার একটি চিঠি নকল করে পাঠিয়েছেন। চিঠিখানিতে কয়লা- ও অভ্র-খনির কেন্দ্র এই গিরিডির একটা বিস্তারিত বর্ণনা আছে, তাই চিঠিখানি তুলে দিলাম—

গিরিডি
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সীমুর,

এবার আমরা এসে উঠেছি বিহারের খনি অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে— গিরিডি শহরের একপ্রান্তে আমাদের বাসা। শহরের এদিকে লোকালয়, ওদিকে পাহাড়। কয়লা ও অভ্রের খনি আছে পাহাড় অঞ্চলে। পাহাড়-তলির যে অঞ্চলে আমাদের বাংলো, তার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত এক পার্বত্য নদী। নদীর বাঁকে বিরাট একখণ্ড পাথরের বুকে স্রোতের জল এসে আছড়ে পড়ছে। আমাদের বাংলো থেকে বাঁকের ওদিকে নদীর ধারা আর চোখে পড়ে না। নদী ও পাহাড়ের মাঝখানে খানিকটা লাল কাঁকরের এবড়ো খেবড়ো জমিতে সবুজ ঘাসের ঈষৎ রেখা দেখা যায়। অনতিদূরে সমতল জমিতে যেখানে পলি পড়েছে, সেখানে কচিধানের টুকরো টুকরো খেত— হলুদে সবুজে মেশা। দু-একটা খেতের জমি যেন গড়িয়ে পড়েছে নদীর কিনারা অবধি। ধানখেত পেরিয়ে কিছুদূর অবধি আমবনের ঘন সবুজ পাতার অন্ধকার। তার পরে ঢালু জমি শেষ ও পাহাড়ের শুরু। লোকালয়কে স্পর্ধা করেই যেন পাহাড়ের গায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ঋজুদেহ শালগাছের জঙ্গল। দূর থেকে দেখা যায় এই জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পাথরের টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আর

তার ফাঁকে ফাঁকে গাঁয়ের কয়েকটা গোরু যূথভ্রষ্ট হয়ে দু-চার মুঠো ঘাসের লোভে এদিকে ওদিকে চরে বেড়াচ্ছে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে নাক বরাবর দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট একফালি ধানখেতে একটি লোক একজোড়া বলদের সঙ্গে লাঙল জুতে ক্রমাগত চাষ করে চলেছে। পাশেই একটি চষা জমিতে আব-একজন লোক ধান বুনছে। মনে হয় যেন মিলে-র আঁকা একখানি ছবি দেখছি।

বারান্দায় বসে রোজ এই ছবি দেখি— নদীর দুই তটে রুপোলি বালির দেওয়াল, লালমাটি মাখা দুরন্ত নদীর ধারা, নদীর বাঁকে প্রকাণ্ড একখানা পাথর— যেন কোনো বীরের স্মৃতিস্তম্ভ, ঢালু জমির ধাপে ধাপে সবুজ ধান-খেতের পদক্ষেপ, দূরে দৃপ্ত শালগাছের শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে যেন সান্ত্রির মতো! রোজই এই ছবি দেখি, কিন্তু কখনো একঘেয়ে লাগে না। মাঝে মাঝে রঙ বদলায়, কখনো মেজাজ— তবে এ-সব পরিবর্তন লক্ষ্য করে দেখতে হয়— ধৈর্য ধরে, শিল্পীর চোখ দিয়ে। চোখ-ধাঁধানো আলো নিয়ে যখন শরৎকালের সূর্য ওঠে, সুদূর দিগন্তরেখা পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না, চোখের সামনে নানা রঙের বাহার নিয়ে মন মেতে থাকে। আবার যখন অলসগতি এক-টুকরো মেঘ ভেসে যায়, তখন দূরের দৃশ্য যেন নিবিড় হয়ে প্রকাশ পায় একেবারে চোখের সামনে। তখন নদীর ওপারে গাঁয়ের কোনো মেয়ে ভরা কলসি মাথায় করে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে যখন অবলীলায় চলে যায়, জানেও না তার চলার ছন্দে সে কেমন ছবি এঁকে এঁকে চলেছে।

আমরা শহরের একপ্রান্তে আছি বলে আমাদের সবকিছু এত ভালো লাগছে। যখন চেনা-পরিচিত লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে শহরের গলিঘুঁজিতে ঢুকি— তখন চোখে পড়ে কেবল ইট-কাঠের জঙ্গল। রাস্তার দু-ধারে পাঁচিল, পাঁচিলের অন্তর্বর্তী ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি, দেখে মনে হয় যেন জেলখানা। এই-সব বাড়ির মালিক হলেন কলকাতার সব পয়সাওয়ালা লোক। তাঁরা নাকি কলকাতার হট্টগোল থেকে বাঁচবার জন্য গিরিডিতে আসেন ছুটি কাটাতে।

কোনো কোনো দিন আমরা খনি অঞ্চল দেখিতে যাই, কোনোদিন-বা বাজারে। কয়লা ও অভ্রের কারবার করে বেশ ধনী হয়েছেন এরকম

অনেক মারোয়াড়ি আছেন গিরিডির বাজারে। এমন ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন বাজার সচরাচর দেখা যায় না। শুনেছি এখানে জমি বেশ সস্তা। কিন্তু তা হলে কী হয়, যারা টাকার মূল্য বোঝে তারা ভগবানের দান আলো-হাওয়াও ব্যবহার করে কৃপণের মতো। বাজার পেরিয়ে রেল স্টেশন। এখানকার স্টেশন যেন অক্টোপাস—যেখানে যেখানে খনি, সেখানে লাইন চলে গেছে। এই খনি অঞ্চলেও পাহাড় আছে, সমতল জমি আছে, নদী আছে। এককালে শালবনও ছিল। এখন শালগাছ নিশ্চিহ্ন, তার স্থান নিয়েছে কয়লা-তোলা যন্ত্রপাতির জঙ্গল ও ধূমায়িত চিমনি। খনির গহ্বর থেকে যে জল পাম্প করে তোলা হচ্ছে, সেই নোংরা জলে খানাডোবায় চারিদিক পঙ্কিল। এ অঞ্চলে লোকের মুখ অল্পই দেখা যায়। শোনা গেল হাজার দশেক লোক প্রতিদিন খনির গহ্বরে কয়লা কাটে। তারা অসূর্যম্পশ্য, সারাদিন যে অন্ধকারের মধ্যে কাজ করে, সেই অন্ধকারের মধ্যেই দিনের শেষে উঠে আসে। তার পর সারাদিনের গ্লানি ধুয়ে দিতে চায় আকণ্ঠ পচাই পান করে।

বাড়ি ফিরে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। কিন্তু সে তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। পরদিন আবার যখন দেখি নদী খিলখিল শব্দে পাথরের গা ঘেঁষে বেয়ে চলেছে, শালবনের গাম্ভীর্যকে উপহাস করছে রৌদ্রস্নাত সবুজ ধানখেত— তখন কেন যেন মন আগেকার মতো ভরে ওঠে না। কী যেন একটা মনের ভার কিছুতেই মন থেকে ঘুচতে চায় না।

বাবার সঙ্গে বিদেশে

লণ্ডন

১৯০২ সালে মার মৃত্যুর পর বাবা তাঁর নিজের শরীরের প্রতি নজর একপ্রকার দিতেন না বললেই হয়। তাঁর কলম চলত বিরামবিহীন, লেখার ঝোঁকে অনেক সময় নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত মনে থাকত না। তার উপর এ সময় কয়েক বছর তিনি দেশের কাজ নিয়ে মেতে ছিলেন। রাজনীতির কাজে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, রুচিও ছিল না। অপ্রীতিকর কাজ করে চলার দরুন তাঁর শরীর-মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তা ছাড়া ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছোটো বড়ো নানা রকম দাবি। এতে যে কেবল তাঁর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হত তা নয়, তাঁর সামান্য অর্থসংগতির উপরেও ক্রমাগত টান পড়ত। এই সব টানাপোড়েনের ফলে তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে। পৈতৃকসূত্রে যে সুন্দর স্বাস্থ্যের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন, তা ১৯১২ সালে একপ্রকার ভেঙে পড়ে। ডাক্তার ও বন্ধুবান্ধবেরা এ সময় তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি যেন বিলাত যান ও দরকার হলে সেখানে চিকিৎসা করান।

কলকাতা থেকে লণ্ডনগামী এক জাহাজের টিকিট কেনা হল। জাহাজ ছাড়বার আগের দিন রাত্রে স্যর আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বাবার নিমন্ত্রণ। কেবল খাওয়াদাওয়া নয়, সেইসঙ্গে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। দিনেন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করলেন। অসুস্থ শরীরে বাবাকে অনেক রাত অবধি জাগতে হল। আমরা ঘরে ফিরলাম বেশ রাত করে। বাকি রাতটুকু বাবা না ঘুমিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলা উঠে বাবার শরীরের অবস্থা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, ক্লান্তিতে অবসাদে যেন ধুঁকছেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তল্পি-তল্পা মালপত্র সবকিছু জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁদপাল ঘাটের জেটিতে অনেক বন্ধুবান্ধব জড়ো হয়েছেন যথাসময়ে বাবাকে বিদায় দিতে। জাহাজ আমাদের জিনিসপত্র সমেত যথাসময়ে পাড়ি দিল, কিন্তু আমাদের সে যাত্রা আর যাওয়া হল না।

আমার মনে হয় শরীর খারাপ হওয়া ছাড়াও একটি কারণ ছিল যেজন্য নির্দিষ্ট দিনে বাবার বিলাতযাত্রা ঘটে ওঠে নি। ডাক্তার ও বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয়ে এরকম দায়ে পড়ে বিদেশ যাওয়া তাঁর ঠিক মনঃপূত হয় নি। মন বিদ্রোহ করলে শরীরও বেঁকে বসত— বাবার বেলা এরকম আমি একাধিকবার দেখেছি। বাইরে থেকে যখনই তাঁর উপর জোর করে কোনো মতামত চালাবার চেষ্টা হয়েছে, তখনই তিনি নিজস্ব ধরনে প্রতিবাদ করেছেন— সরবে নয়, আকারে-ইঙ্গিতে। ধরনটা তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী নানাভাবে প্রকাশ পেত— এমন-কি, মাঝে মাঝে হাস্যকর ছেলেমানুষি পর্যন্ত বাদ যেত না। তাঁর এই অদ্ভুত 'অবাধ্যপনা'র সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেছে, তাঁরা এ বিষয়ে অনেক মজার মজার গল্প বলতে পারবেন।

সে যাই হোক, সে যাত্রা তো বিলেত যাওয়া বন্ধ হল। ডাক্তারেরা বললেন, কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে, শরীরটাকে কিঞ্চিৎ মেরামত না করা পর্যন্ত বিলেত যাওয়া স্থগিত থাকবে। শরীর-মন নিরাময়ের জন্য তাঁরা বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিলেন। বায়ুপরিবর্তনের কথা উঠতেই বাবার সবার আগে মনে হল শিলাইদহের কথা। নানা সুখস্মৃতিবিজড়িত পরিচিত প্রিয় পরিবেশে কিছুদিন কাটাতে পারবেন ভেবে তিনি খুশি হলেন। ডাক্তারেরা বিধান দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে, মানসিক পরিশ্রমসাধ্য লেখার কাজ করা চলবে না। বাবা স্থির করলেন তাঁর কিছু কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে সময় কাটাবেন। আমার মনে হয় এ কাজে তাঁর উৎসাহের মূল ছিলেন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডনাল্ড— কয়েকমাস আগে তিনি যখন আশ্রমে এসেছিলেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁকে বাবার লেখার কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদ দেখান। অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়, আনন্দ কুমারস্বামী ও জগদীশচন্দ্র বসুর আগ্রহাতিশয়ে। কয়েকটি অনুবাদ ম্যাক্‌ডনাল্ডের ভালো লেগেছিল, সে কথা তিনি বাবাকে বলেওছিলেন।

সেবার শিলাইদহে ফিরতে পেরে ভারি খুশি হয়েছিলেন বাবা। তখন তিনি বুঝতে পারেন নি সেবারকার যাওয়া তাঁর একপ্রকার শেষবারের মতো শিলাইদহে যাওয়া। অনেক বছর পরে আর-একবার তিনি শিলাইদহে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে নিতান্তই দু-চারদিনের জন্যে। এ যাত্রা তিনি কাউকে সঙ্গে নিলেন না, স্থির করলেন একাই থাকবেন কুঠিবাড়িতে। অনুচর

-পরিচয় যে দু-একজন সঙ্গে ছিল তাদের কাছে শুনেছি, যে কটা দিন শিলাই-দহে ছিলেন, তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ছাদের উপরকার সিঁড়ির ঘরে। সেই ছিল তাঁর লেখাপড়া করার জায়গা। সেখান থেকে দেখা যেত একদিকে দিগন্তবিস্তৃত কাঁচা সোনার বরন সরষের খেত, অন্য দিকে বিশীর্ণা পদ্মার রজতরেখা ; তার ওপারে আবার দিগন্ত-জোড়া ঢেউ-খেলানো চর— রৌদ্রে বালি চিকচিক করছে। এই মনোরম শান্তিময় পরিবেশে বাবার নিঃসঙ্গ নির্জনতায় ব্যাঘাত দেবার মতো কেউ ছিল না। কালেভদ্রে উপস্থিত হত এক বোষ্টমি —যার কথা বাবা তাঁর অনেক লেখায় বলেছেন। লেখাপড়া না-জানা এই সহজিয়া সাধিকার মুখে বাবা ধর্ম ও দর্শনের নানা রকম তত্ত্বকথা শুনতে ভারি ভালোবাসতেন।

বাবার সৃষ্টিশীল জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা কেটেছিল শিলাইদহে। সেই-সব দিনের স্মৃতি, দীর্ঘ রোগভোগের পর একটা অলস অবসরের আনন্দ এবং বৈষ্ণবীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ— এই সবকিছু নিশ্চয় কবিতা নির্বাচনে ও কবিতা অনুবাদে বাবার সহায় হয়ে থাকবে। অনেকের ধারণা ইংরেজি গীতাঞ্জলি ওই নামের বাংলা বইয়ের কবিতাগুলির অনুবাদ। আসলে কিন্তু তা নয়। অবশ্য অধিকাংশ কবিতা বাংলা গীতাঞ্জলি থেকে নেওয়া— তবে সে বই ছাড়া আরো কয়েকখানা বই থেকে কবিতা বাবা বেছে নিয়েছিলেন অনুবাদের জন্য। মনে হয় অনুবাদের সহজ ভাষা ও গভীর ব্যঞ্জনার সমন্বয় য়েট্‌স্‌-কে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করে থাকবে। আমার কেমন যেন ধারণা, ইংরেজি অনুবাদে বাবার তাৎকালিক মনের ভাব প্রতিফলিত হয়ে আছে— এ-সব কবিতা নিছক অনুবাদ নয়, শিলাইদহের জমিতে নতুন সৃষ্টির ফসল।

বাবা শিলাইদহ থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে। আবার একবার চেষ্টা করা হল তাঁকে বিলেত নিয়ে যাবার জন্য। এবার আমাদের চেষ্টা সফল হল, বোম্বাই থেকে পি. অ্যাণ্ড ও.-র একটি জাহাজে আমরা বিলেত পাড়ি দিলাম ১৯১২ সালের ২৭ মে তারিখে।

আমেরিকা থেকে ফিরতি পথে আমি কিছুকাল ইংলণ্ডে-ইয়োরোপে ছিলাম বটে, কিন্তু এ-সব দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল যৎসামান্য। আমার স্ত্রী প্রতিমার পক্ষে তো এই প্রথম বিদেশযাত্রা। সুতরাং বিদেশযাত্রার সঙ্গী হিসেবে আমরা দুজনেই ছিলাম নিতান্ত অপটু। সমস্যাটা আর-একটু ঘোরালো

হল এজন্ত যে, আমাদের অভিভাবকত্বে শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র ঐ একই জাহাজে রওনা হল। তার গন্তব্য হার্ভার্ড— সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। এ ছেলেটি একেবারে আনকোরা আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, পশ্চিমী কায়দাকানুনে একান্ত অনভিজ্ঞ, একে নিয়ে আমাদের ভালো এক বিপদ হল। আশ্রমে খালি পায়ে হাঁটাচলার অভ্যাস, সুতরাং জুতো-মোজা এর কাছে অনাবশ্যক বাহুল্য— প্রায়ই একে দেখা যেত প্রথম শ্রেণীর ডেকে খালি পায়ে চলাফেরা করছে। বেচারা তার সহজ বুদ্ধিতে জানে যে কাঁটা দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায় আর ছুরি দিয়ে কাটা যায়। একটা ডান হাতে পাঁচ-পাঁচটা আঙুল থাকতেও কেন যে খেতে হলে ছুরি-কাঁটা ধরতে হবে, সে তাব জ্ঞানের অগম্য। একদিন বিকেলবেলা আমরা সবাই ডেকে যার যার চেয়াবে দিবানিদ্রাচ্ছন্ন, এমন সময় এই বালক উত্তেজিত অবস্থায় প্রবেশ করল। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় নাতিনিম্ন কণ্ঠে সে যে সংবাদ প্রচার করল তা শুনে প্রতিমার কর্ণমূল আরক্ত, আর আমি তো হতবাক্। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, বাবা আম খেতে ভালোবাসেন বলে আমরা বোম্বাই থেকে একঝুড়ি অলফন্‌সো আম এনে তাঁর ক্যাবিনে রেখেছিলাম। বিকেলে ক্যাবিনের খোলা দরজা দিয়ে নিশ্চয় আমের সুগন্ধ ভেসে এসে থাকবে। সে যাই হোক, বালকটি সংবাদ দিলে যে বাবাব ক্যাবিনে প্রবেশ করে আমাদের সহযাত্রিণী এক মেমসাহেব নাকি সন্তর্পণে দু-চারটে আম সরিয়েছেন— সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

আমাদের হাসির খোরাক আমাদের সঙ্গেই ছিল, তা না হলে জাহাজের দিনগুলি ভারি একঘেয়ে ঠেকত। আমরা লণ্ডনে এসে পৌছলাম এক সন্ধ্যায়। চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে এসে জানা গেল টমাস কুক আমাদের জন্ম ব্লুম্‌স্‌বেরি অঞ্চলে একটি হোটেলের কয়েকটি কামরা ভাড়া করে রেখেছেন। স্টেশন থেকে টিউব রেল -যোগে আমরা ব্লুম্‌স্‌বেরি অভিমুখে রওনা দিলাম। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রেলপথে এই আমার প্রথম অভিযান। নূতন অভিজ্ঞতার জন্মই হোক কিংবা অত্যধিক দায়িত্বভারের জন্মই হোক— আমি নিজের হাতে অতি সন্তর্পণে বাবার যে এ্যাটাচি কেসটি বহন করে আনছিলাম, টিউব থেকে নামবার মুখে সেইটিই নামাতে ভুলে গেলাম। এই অ্যাটাচির মধ্যেই বাবার ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও আরো অনেক সব দরকারি কাগজপত্র ছিল। পরের দিন বাবা যখন রোটেনস্টাইনের বাড়ি যাবেন, অ্যাটাচির খোঁজ পড়ল,

আর তখনই বোঝা গেল সেটি টিউবে ফেলে আসা হয়েছে। আমার অবস্থা অনুমেয়; শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম টিউব রেলের লস্ট প্রপার্টি অফিসে। সেখানে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হারানো ধন ফেরত পাওয়ার পর আমার প্রাণে যে কী গভীর স্বস্তি হয়েছিল— সে আমি কখনো ভুলব না। মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভাবি, যদি ইংরেজি গীতাঞ্জলি আমার অমনোযোগ ও গাফিলতির দরুন, সত্যিই হারিয়ে যেত, তা হলে··· ।

বোধকরি প্রত্যেক বিদেশী আগন্তুকের চোখেই প্রথম দর্শনে মনে হয় লণ্ডন বুঝি অতিথিপরায়ণ নয়। আমাদেরও প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, আমরা যেন একেবারে সঙ্গীহীন নির্বান্ধব কোনো জগতে অবাঞ্ছিত অনধিকার প্রবেশ করেছি। লণ্ডন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস— অথচ মনে হত এই জনসমুদ্রে আমরা যেন একা, যেন লণ্ডনের তাবৎ নাগরিক স্পর্শদোষ এড়াবার জন্য সযত্নে আমাদের পরিহার করে চলেছে। ১৯১২ সালের পরে আমরা অনেকবার পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছি কিন্তু এই প্রথমবারের লণ্ডনের মতো অভিজ্ঞতা আমাদের আর কোথাও হয় নি। আসলে লণ্ডনের সঙ্গে ঠিক পরিচিত হতে গেলে সময় লাগে; আর একবার নিবিড় পরিচয় হয়ে গেলে ধূসর একঘেয়ে পরিবেশ সত্ত্বেও লণ্ডনকে ভালো না লেগে পারে না। পারিপার্শ্বিক বিষয়ে বাবার মন বরাবর স্পর্শকাতর, সুতরাং প্রথম দু-চার সপ্তাহ লণ্ডন-বাস বাবার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ বাবার এই প্রথম লণ্ডনে আসা নয়— ছাত্রাবস্থায় তিনি লণ্ডনে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। ১৮৯০ সালে মেজজ্যাঠামশাই ও লোকেন পালিতের সাহচর্যে লণ্ডনে একমাস অবকাশ যাপন করে গেছেন পরম আনন্দে। কিন্তু সে তো প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার, সে-সব দিনের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে, সেদিনের সঙ্গীসাথি বন্ধুবান্ধব কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। রোটেনস্টাইন ছাড়া আমরা অন্য কোনো ইংরেজকে বড়ো একটা চিনতাম না। রোটেনস্টাইনের সঙ্গেও মাত্র এক বছর আগে দু-দণ্ডের আলাপ, কলকাতায় গগনদাদের বাড়িতে। রোটেনস্টাইন কিন্তু আমাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন, বাবার সঙ্গে একে একে তাঁর শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি নিজে চিত্রশিল্পী হলে কী হয়, লণ্ডনের সাহিত্য-জগতে নামকরা অনেক লেখক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাজনীতি কিংবা সাহিত্যের

ক্ষেত্রে যাঁরা নাম করেছেন, কোনো-না-কোনো সময়ে রোটেনস্টাইন তাঁদের ছবি এঁকেছেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন আলাপনিপুণ বৈঠকি মানুষ, সুতরাং রসিক ব্যক্তিরা সর্বদা তাঁর চার দিকে বিচরণ করতেন। কথাপ্রসঙ্গে বাবা যদি একবার য়েট্‌স, মেসফিল্ড, এইচ. জি. ওয়েলস, স্টফোর্ড-ব্রুক, হাডসন, নেভিন্‌-সন, ঈভলিন, আণ্ডারহিল প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন, তা হলে দেখা যেত লাঞ্চে কিংবা চায়ের আসরে এঁদের কেউ-না-কেউ রোটেনস্টাইনের বাড়িতে উপস্থিত এবং সেইসঙ্গে বাবাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অধিকাংশ সময়ে বাবা নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন রোটেনস্টাইনের স্টুডিও-ঘরে। রোটেনস্টাইন ছবি এঁকে চলেছেন আর যাঁর ছবি আঁকা হচ্ছে তাঁর সঙ্গে বাবা গল্প করছেন; হামেশাই এমনটি ঘটত। এইভাবে বাবার সঙ্গে কর্নেল লরেন্সের আলাপ হয়, যিনি পরে 'আরব-দেশের লরেন্স' নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। এই সময় ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রোটেনস্টাইন পার্লামেণ্ট-ভবনে কয়েকটি ভারতীয় দৃশ্য আঁকার ফরমাশ পান। একটি ছবির বিষয়বস্তু ছিল বারাণসীর ঘাট। এই ছবির সম্মুখভাগে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, তার মুখের আদল অনেকটা শান্তিনিকেতনের কালীমোহন ঘোষের মতো। তিনি তখন লণ্ডনে। পাশ থেকে দেখা তাঁরা মুখের আদল রোটেনস্টাইনের বিশেষ পছন্দ ছিল।

রোটেনস্টাইনের বাড়িতে এক আসরে য়েট্‌স্‌ তাঁর ভাবগম্ভীর কবিকণ্ঠে গীতাঞ্জলি-অনুবাদের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্নেস্ট রীস, অ্যালিস মেনেল, হেনরি নেভিন্‌সন, এজরা পাউণ্ড, মে সিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, সি. এফ. অ্যানড্রুজ ও আরো অনেকে। আবৃত্তি শেষ হল, সভাস্থ সকলে কবিতা সম্বন্ধে একটি কথাও না বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পরের দিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চিঠি আসতে লাগল তাঁদের কাছ থেকে। ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল: ইংরেজ পাঠক-সাধারণ যেন একদিনেই বাবাকে স্বীকার করে নিল যুগবরেণ্য কবিরূপে। এ-সব ঘটনা আজ সকলেরই একরকম জানা। তবু অ্যানড্রুজের মনে এই আবৃত্তি শুনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল, সে কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেদিনকার কথা স্মরণ করে অ্যানড্রুজ লিখেছেন:

> নেভিন্‌সনের সঙ্গে আমি হ্যামস্টেড হীথ-এর ধার ঘেঁষে হাঁটছি। একাকী নীরবে আমি এই কাব্যের মহিমার কথা চিন্তা করব এই আমার মনের

বাসনা। নেভিন্‌সনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হীথ্‌ অতিক্রম করে চলতে শুরু করলাম। নির্মেঘ আকাশ, আকাশের গায়ে ঈষৎ রক্তরাগ— ভারতের অস্তরবির ছোঁওয়া যেন লেগেছে লণ্ডনের আকাশে। একা চলতে চলতে আমি ভাবতে লাগলাম, কী আশ্চর্য এই কবিতা :

জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা ··।

On the seashore of endless worlds, children meet···
On the seashore of endless worlds is the great meeting of children.

শৈশবে শ্রুত নানা মধুর ধ্বনির মতো এব স্বরে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত বোধ করছিলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের নীচে পদচারণা করতে লাগলাম। ফিরে এসেছি যখন প্রায় ভোর হয়েছে।

রোটেনস্টাইনের বসবার ঘরের যে কোণটিতে আমি বসেছিলাম, সেখানকার খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত লণ্ডন শহর। গ্রীষ্মের সেই দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটল রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে। য়েট্‌স্‌ অভিভূতের মতো একটির পর একটি কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন আর আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছি। রাত্রে যখন বিদায় নিলাম আমার মন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-কাব্যমদিরা আমার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। চ্যাপমান-কৃত হোমারের অনুবাদ পড়ে কীট্‌সের যে মনোভাব হয়েছিল, আমারও যেন অনেকটা সেই অবস্থা :

আমি যেন জ্যোতির্বিদ।
দূর লক্ষ্যে ভেসে এল
কোনো যেন অচেনা গ্রহের
দূরাগত আলো।···

বাবাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-সব চিঠিপত্র এসেছিল তা থেকে একটি মাত্র চিঠি এখানে উদ্‌ধৃত করি। এ চিঠি লিখেছিলেন সুলেখিকা শ্রীমতী মে সিন্‌ক্লেয়ার।

৪ এডওয়ার্ডস স্কোয়্যার স্টুডিও
কেনসিংটন
৮ জুলাই ১৯১২

প্রিয় মি. টাগোর,

কাল রাত্রে আপনার কবিতার বিষয়ে কোনো কথা বলি মনের তেমন অবস্থা ছিল না। এ কবিতা এমন পর্যায়ের যে, এর সম্বন্ধে প্রথাগত-ভাবে দু-চার কথা বলা অসম্ভব। আজ আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি, আবার যদি এ কবিতা নাও শুনি তবু এর রেশ আজীবন আমার মনে বাজতে থাকবে। নিছক কবিতা হিসেবে বিশুদ্ধ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বলেই নয়, এই কবিতায় এমন এক ঐশী স্পর্শ আছে যা আমি কদাচিৎ হঠাৎ-আলোর ঝলকের মতো, নিতান্ত ক্ষণিকের জন্য, মনে মনে অনুভব করেছি। জানি না আর একজনের চোখ দিয়ে দেখা যায় কিনা, তা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়, তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আর একজনের প্রত্যয় দিয়ে নিজের প্রত্যয়কে দৃঢ় করে নেওয়া সম্ভব।

আপনার কবিতার সঙ্গে তুলনীয় কবিতা আমার মনে পড়ে, একমাত্র সেণ্ট জন্ অফ দি ক্রস-এর 'আত্মার অন্ধকার রাত্রি'। তবে আপনি অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে সেণ্ট জন্ ও অন্যান্য খৃস্টীয় মরমিয়া কবি যাঁদের কথা আমি জানি তাঁদের অতিক্রম করে গেছেন। এই দিকটা পশ্চিমের মরমিয়া সাহিত্যে নেই বললেই হয়। এঁরা চোখের দেখা জগৎ নিয়েই অতি-মাত্রায় ব্যস্ত। এঁদের মধ্যে সেই কাঠিন্য ও সূক্ষ্মতা নেই যা সাংসারিক মায়াকে ভেদ করে উপলব্ধির অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। তাই এঁদের কবিতায় বিশুদ্ধ প্রেরণার অভাব দেখা যায়। অন্তত আমার তো সর্বদাই এইরকম বোধ হয়েছে। আর এই অপূর্ণতার ফলে তা অতৃপ্ত ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই তৃপ্তি, পূর্ণ তৃপ্তি, আমি পেয়েছি কাল রাত্রে আপনার রচনায়। ইংরেজি ভাষায়, বা পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্য কোনো ভাষায়, যে-সব কথা লিখিত হতে পারে বলে ভরসাও করি নি, স্বচ্ছ ইংরেজিতে আপনি তা প্রকাশ করেছেন।

আগামী শরৎকালে কবিতাগুলি বই-আকারে বেরোবে জেনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি

ভবদীয়
মে সিন্‌ক্লয়ার

ইতিমধ্যে আমরা দক্ষিণ কেনসিংটন অঞ্চলে একটি বোর্ডিং হাউসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, এর পরিচালিকা ছিলেন দুজন বেলজিয়ান— দুই বোন— ইংরেজদের হোটেলের একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে আমাদের অরুচি হবার জোগাড় হয়েছিল। আমাদেব নূতন বাসাবাড়ির খুব কাছেই ছিল ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয় ছাত্রদের হস্টেল। ফলে এই ছাত্রেরা বাবার বেশ নিকট সম্পর্কে আসবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই ছাত্রদলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন সুকুমার রায়, বাংলা সাহিত্যে যিনি চিরস্মরণীয়।

লণ্ডনে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রোটেনস্টাইন-পরিবার ছাড়া ছিলেন হ্যাভেল সাহেব। এককালে হ্যাভেল ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ও অবনীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয়। কাজ থেকে অবসর নেবার পর হ্যাভেল তাঁর জন্মভূমি ডেনমার্কে না গিয়ে লণ্ডনেই বসবাস করছিলেন। ভারতীয় শিল্প বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। যতদূর মনে পড়ে তিনিই ছিলেন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক। এই সোসাইটি স্থাপন করার ব্যাপারে হ্যাভেল সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভারতীয় শিল্পকলা বিলাতে সমাদৃত হয় ও ভারতীয় চিত্রকরেরা কাজ-কর্ম পান। এই সময় তার একটা মস্ত স্থযোগ এসেছিল। নয়াদিল্লী তৈরি করার তখন পরিকল্পনা চলছে; হ্যাভেল দৃঢ়সংকল্প, যেন ভারতের রাজধানী ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতিতে রচিত হয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যের একটা জগা-খিচুড়ি না ঘটে। ইণ্ডিয়া সোসাইটির মারফত তিনি বিলাতের শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের তাঁর এই পরিকল্পনার অনুকূলে আনবার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে তিনি এই কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইংরেজ সওদাগরের জাত। ইংরেজ স্থপতি স্যর এডওয়ার্ড লাটিয়েন্‌স-এর

স্বপক্ষে অনেক ক্ষমতাবান লোক জুটে গেলেন। ভারতীয় কলাশিল্পের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও উইলিয়াম রোটেনস্টাইন প্রমুখ ব্যক্তি হ্যাভেলের বিপক্ষে যান, ফলে ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে ভাঙন ধরে। অতঃপর সোসাইটি ইণ্ডিয়া অফিসের অনুবর্তী একটি প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ হ্যাভেল সোসাইটি থেকে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করলেন না।

লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজে এইসময় আনন্দ কুমারস্বামীর বিশেষ সমাদর। শিল্পের হেন প্রসঙ্গ ছিল না যে বিষয়ে তিনি অবলীলায় আলোচনা করতে না পারতেন। তবে মনে হয়, পাণ্ডিত্যের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই লোকে তাঁর কাছে বেশি আসত।

চোখে পড়বার মতো আর-একজন ছিলেন য়েট্‌স্‌— যে-কোনো সভায় তাঁকে দেখে মনে হত তিনি আর-পাঁচজনের মতো নন, তিনি বিশেষ। জনতার মধ্যেও তিনি ছিলেন একা। তাঁর চার দিকে এমন একটা দূরত্বের বেড়া নিয়ে তিনি ঘুরতেন যে, মনে হত না কেউ কখনো তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসতে পারে। অথচ তাঁর মধ্যে অহমিকা বা ঔদ্ধত্যের স্পর্শও ছিল না। যেদিন এক বৈঠকখানা ঘরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল, মনে হয়েছিল তিনি দুরধিগম্য, তাঁর সঙ্গে দু-চার কথা বলব এমন সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন তাঁকে ভালো করে জানবার সুযোগ এল, বুঝতে পারলাম তিনি অতি সহৃদয় মানুষ। তিনি তখন রাসেল স্কোয়্যারের নিকটবর্তী ওবার্ন প্লেসে এক জুতোর দোকানের উপরতলার ছাদের ঘরে বাস করতেন। কালীমোহন ঘোষ ও আমি বহু সন্ধ্যা যাপন করেছি য়েট্‌সের এই চিলেকোঠায়, অনেক রাত অবধি গল্পগুজবে কেটেছে। সে সব গল্পের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অশরীরী প্রেতলোকের বাসিন্দাদের নিয়ে। অনেক রাত্রে কেনসিংটনে ফিরে আসার পথে মনে মনে ভাবতাম য়েট্‌স্‌ ঠিক যেন বাস্তব জগতের মানুষ নন, তাঁর বিচারণা রূপকথার এক কল্পরাজ্যে, যে রাজ্যের অস্তিত্ব তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। য়েট্‌স্‌ যে পশ্চিম দেশের মানুষ— এ কথা মেনে নিতে কষ্ট হত।

একদিন হঠাৎ স্যর অলিভার লজ আমাদের বোর্ডিং হাউসে এসে উপস্থিত। বাবার সঙ্গে দেখা করে নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। ওঁর মতন নামজাদা

একজন বিজ্ঞানী যখন বাবাকে ভারতবর্ষের জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, আমার বেশ মজা লেগেছিল। অবশ্য ইতিপূর্বেই তিনি বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিয়ে প্রেততত্ত্বের চর্চায় নিমগ্ন হয়েছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এসেছিলেন আগের থেকে কোনো খবর না দিয়ে, অকস্মাৎ। বাবার সঙ্গে পূর্বপরিচয় না থাকায়, ইনিও অলিভার লজ-এর মতো নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসেল বললেন, তিনি কেম্ব্রিজ থেকে সোজা এসেছেন লণ্ডনে, কেবল বাবার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর বেশি কিছু ভণিতা না করেই বাবাকে প্রশ্ন করে বসলেন: 'আচ্ছা টাগোর, তোমার মতে "সুন্দর" কি?' এমন আচমকা প্রশ্নের জবাব কি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায়? বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামত বলতে লাগলেন। পরে এই বিষয়ে তিনি তাঁর *Creative Unity* বইয়ে What is Art প্রবন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন। বাবার ব্যাখ্যা রাসেলের মনঃপূত হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। যতক্ষণ বাবা বললেন, তিনি চুপ করে বসে শুনলেন, যেই বলা শেষ হল অমনি, যেমন ঝড়ের মতো এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বাবার কাছে নিত্য নূতন লোকের আনাগোনা চলছে। আমি ও কালীমোহনবাবু এদিকে আমাদের উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু কাটাচ্ছি য়েট্‌স্‌ ও এজরা পাউণ্ড-এর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে। পাউণ্ড একেবারে আলাদা জাতের লোক—যাকে বলা যায় অনন্য। তাঁর কাছে কাব্যরচনা ছিল এক মহৎ ব্যাপার। তিনি যে কাব্যরচনায় চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজের স্বতন্ত্র পথ তৈরি করে নিতে পেরেছেন— এ নিয়ে তাঁর মনে একটা অহমিকাবোধ সদাজাগ্রত ছিল। পাউণ্ড-এর প্রকৃতিতে ও আচরণে বেশ একটা নাটকীয়তা ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁকে আমাদের ভালো লাগত। তিনি যে মার্কিন মুলুকের লোক, এ কথা চেপে যেতে পারলেই তিনি যেন খুশি হতেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, তাঁর সরলতা ও সহৃদয়তা থেকে বেশ বোঝা যেত তিনি বিলিতি সাহেব নন। পাউণ্ড এ সময়ে বাবার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লিউ. এইচ. হাডসন সম্বন্ধে বাবার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মনে পড়ে দিদি আর আমি যখন বেশ ছোটো ছিলাম, আমাদের ইংরেজি জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, বাবা হাডসনের ভ্রমণকাহিনী থেকে

বাছা বাছা অংশ আমাদের পড়ে শোনাতেন। হাডসনের রচনার মধ্যে বাবার বিশেষ প্রিয় বই ছিল *The Naturalist in La Plata* ও *Green Mansions*। রোটেনস্টাইনও বাবার মতো হাডসনের অনুরাগী ছিলেন, তিনি উদ্যোগী হয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। হাডসনের সঙ্গে বাবার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আমরা উপস্থিত ছিলাম না। ফিরে এসে বাবা এই ইংরেজ লেখক সম্বন্ধে যে কাহিনী বললেন, তা থেকে বুঝতে পারলাম কেন হাডসনের লেখায় প্রকৃতিপ্রেম এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সংগীতে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। তিনি যাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন উঁচুদরের বেহালা-বাজিয়ে। যখনই তাঁর বাজনা শুনতেন হাডসন, গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়তেন। কিন্তু মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটল বিয়ের পরেই, যখন তাঁর স্ত্রী বেহালা বাজানো একেবারে ছেড়ে দিলেন। এতে হাডসন গভীর মনোবেদনা পান; তৎসত্ত্বেও ওঁর স্ত্রী যখন চিররুগ্‌ণা হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন, হাডসন বছরের পর বছর একান্ত অনুরাগে তাঁর সেবাযত্ন করেছেন। যে-একজনের প্রতি তাঁর প্রীতি বর্ষিত হয়েছিল তার কাছ থেকে যখন প্রতিদান পেলেন না, তখন সে প্রেম উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে—যে প্রকৃতি আরণ্যক, যা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে মলিন হয় নি। এই ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে এই বিচিত্র মানুষটির সম্বন্ধে বাবার শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে যায়।

একদিন মে সিনক্লেয়ার আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন এক সান্ধ্যভোজের আসরে। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক এসেছেন। বাবার আসন পড়েছে ঠিক বার্নার্ড শ-এর পাশে। খেতে খেতে আলাপ চলছে। সবাই নামজাদা সাহিত্যিক, সুতরাং আলাপের ভাষা ও বিষয় বেশ উচ্চকোটির, কথার গায়ে কথা লেগে যেন কথার ফুলঝুরিতে আসর সরগরম। সবাই কথা বলে চলেছেন, কেবল শ-এর মুখে রা নেই। ফলে কথা কওয়ার পাট বাবাকে প্রায় একতরফা চালাতে হচ্ছে। পরে শুনলাম বার্নার্ড শ যে এমন নীরব শ্রোতা হতে পারেন—এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। শ-এর সঙ্গে আবার দেখা হয় কুইন্‌স্ হলে। আমরা সবাই সেখানে গেছি বিখ্যাত বেহালাবাদক হাইফেৎস-এর বাজনা শুনতে। কনসার্ট শেষ হল, আমরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কে-একজন বাবাকে ধরে দাঁড় করালেন, বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন,'আমায় মনে পড়ে? আমি হলাম গিয়ে বার্নার্ড শ।' ব্যস, তার পরেই দ্রুত প্রস্থান।

তখন মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলেছে। প্রতিমার দেখি এ বিষয়ে দারুণ উৎসাহ; তিনি প্রায়ই এই আন্দোলন সংক্রান্ত সভা-সমিতিতে যাতায়াত করতে শুরু করলেন। একদিন বেশ রাত হয়ে গেছে অথচ প্রতিমা ফেরেন নি। আমরা ভাবছি তিনি উৎসাহের প্রাবল্যে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে হয়তো পথের ধারের দোকানপাটের শার্সি ভেঙে জেল-হাজতে গিয়ে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ফিরলেন তাঁর মুখে বার্নার্ড শ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শোনা গেল। শ যে মেয়েদের এই আন্দোলনে ষোলো আনা মেয়েদের পক্ষে— সে কথা লণ্ডনের সবাই জানত। সেদিন সকালবেলা অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তি অ্যাডেল্‌ফি টেরাসে শ-এর বাড়িতে এসে হাজির। ব্যস্তসমস্ত ভাব— যেন তাঁর তর সইবে না। শ-এর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে, উত্তেজিত কণ্ঠে লোকটি তাঁকে যে খবর দিল তার মর্ম হল এই যে— আন্দোলনের নেত্রী মিস প্যাঙ্কহর্স্টকে পুলিস গ্রেফতার করেছে, তাঁকে জামিনে খালাস করার জন্য তদ্দণ্ডে একশো পাউণ্ড না দিলেই নয়। দ্বিরুক্তি না করে শ টাকাটা দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বোঝা গেল ব্যাপারটা ধাপ্পাবাজি, লোকটা শ-কে ডাহা ঠকিয়েছে। শ নাকি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'ঠকবাজ লোক। কিন্তু লোকটা বাহাদুর বলতে হবে, প্রমাণ করেছে অন্তত একটা লোকও আছে যে শ-এর চাইতেও চালাক!'

আর্নেস্ট রীস ছিলেন বাবার একজন অকৃত্রিম বন্ধু। পুস্তক-প্রকাশক ডেন্টদের প্রতিষ্ঠানে দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার পথে তিনি প্রায়ই আমাদের বোর্ডিং হয়ে যেতেন। নীরবে প্রবেশ করতেন— একমুখ দাড়ির কোণে একগাল হাসি। চুপচাপ বসতেন বাবার পাশে আর সাহিত্যবিষয়ে নানা রকম আলোচনা করতেন। তাঁর বিচারবৈদগ্ধ্য ছিল যেমন অসাধারণ, তেমনি গভীর ও ব্যাপক ছিল সাহিত্যবিষয়ক জ্ঞান। আমরাও মাঝে মাঝে গোল্‌ডার্স্‌ গ্রীন অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। ছোট্ট বাড়ি, কিন্তু সুন্দর ছিমছাম আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা। বাড়ির সংলগ্ন বাগানে বসে, শরবত পান করতে করতে আমরা রীস-এর পিয়ানো বাজনা শুনতাম। তিনি বেশ আবেগ দিয়ে বাজাতেন। রীস-গৃহিণীর হৃদয় ছিল বাৎসল্যরসে ভরপুর। আর সেইজন্যেই তাঁর আতিথ্য ছিল আন্তরিক। তাঁদের দুটি সন্তান— ভারি মধুর তাদের স্বভাব। প্রায়ই রীস-পরিবারের সকলে বাবার চার দিক

ঘিরে বসে বাবার মুখে গীতাঞ্জলির গান শুনতে চাইতেন। এঁরা ছিলেন জাতিতে ওয়েল্‌শ্‌, অনেক কাল ধরে লণ্ডনে বসবাস করা সত্ত্বেও স্বভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রকাশ পেত। সংগীতপ্রিয়তা ওয়েল্‌শ্‌দের মজ্জাগত, সুতরাং বিদেশী সুর হলেও বাবার গান ওঁদের ভালো লাগত। রীস-পরিবারের বন্ধু ডক্টর ওয়ালফোর্ড ডেভিস প্রায়ই এঁদের বাড়িতে আসতেন ও বাবার বাংলা গানের স্বরলিপি ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে টুকে নিতেন। পরে এই ডেভিস একজন উঁচুদরের সংগীতকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

বাবার সঙ্গে যখন টমাস স্টার্জ মোর-এর প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি একজন তরুণ কবি। পরবর্তী জীবনে তিনি তেমন খ্যাতনামা হতে পারেন নি, অপ্রধান কবি হিসেবেই পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছন্দের বোধ ছিল অসাধারণ এবং লাগসই শব্দ নির্বাচনে তাঁর ছিল অদ্ভুত দক্ষতা। ইংরেজি গীতাঞ্জলির পর বাবার আরো যে-সব ইংরেজি অনুবাদ পর পর প্রকাশিত হতে থাকে, সে-সব নির্বাচন করা, বিন্যাস করা নিয়ে বাবার সঙ্গে মোর-এর নিয়মিত আলাপ-আলোচনা চলত। তাঁর স্বভাবটা ছিল ফরাসি-সুলভ, মোটেই বিলিতি সাহেবদের মতো নয়। তাঁর স্ত্রী *The Crescent Moon*-এর কবিতাগুলি ফরাসি ভাষায় তরজমা করেছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের স্বভাবে এমন একটা সহজ অমায়িকতা ছিল যে, তাঁদের সঙ্গে অনায়াসেই আমাদের বেশ বন্ধুতা জমে ওঠে।

য়েট্‌স্‌-এর নেতৃত্বে কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিক ত্রোকাদেরো রেস্তোরাঁয় যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানেই আমাদের লণ্ডন পর্ব এবারকার মতো শেষ হল বলা যেতে পারে। এই ভোজসভায় প্রচুর গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের সমক্ষে য়েট্‌স্‌ গীতাঞ্জলির অনুবাদ থেকে পড়ে শোনাবার পর, বিভিন্ন সাহিত্য-গোষ্ঠী প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যিকেরা বাবাকে প্রচুর সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লৌকিক প্রথায় স্বাস্থ্যপানাদির পর বাবা তাঁর অপ্রকাশিত কিছু অনুবাদ পড়ে শোনান। সবশেষে তিনি নিজের সংযোজিত সুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ গানটি গেয়ে শোনাতে শুরু করলে সভাস্থ সকলে ভারতের জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হলেন।

আমেরিকায়

লণ্ডনে শীত এল ধূসর কুয়াশার ঘোমটা টেনে। অক্টোবর মাসে আমরা রওনা হয়ে গেলাম আমেরিকার দিকে। সেখানে নূতন দেশে নূতনতর অভিজ্ঞতা বাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বাবাকে খুব করে বলাতে শীতের মরসুমটা আমার পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় ইলিনয় জেলার আর্বানা শহরে যাপন করতে বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আশা ছিল যে এই সুযোগে হয়তো বা ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা করতে পারব। আমার কলেজের অনতিদূরে একটা বাসা পেয়ে গেলাম, দুদিনের মধ্যে বেশ গুছিয়ে বসা গেল। নতুন বাসায় অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা তাঁর লেখার কাজ শুরু করলেন দেখে মনে মনে ভরসা হল, বাবা হয়তো চট করে নড়াচড়া করতে চাইবেন না। তা হলে আমিও নিশ্চিন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণার কাজটা শেষ করতে পারব। আমেরিকায় একটা বাসা পত্তন করে বসবাস করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, আমার স্ত্রী প্রতিমার মতো আনাড়ি ব্যক্তির পক্ষে তো নয়ই। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সংসারের কাজে দুজন পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা পাওয়া গেল— এঁদের একজন হলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক বঙ্কিম রায়, আর-একজন আমাদের সেই বিলাতগামী জাহাজের সহযাত্রী শান্তি-নিকেতনের ছাত্র সোমেন্দ্র দেববর্মন। সস্ত্রীক সীমুর সাহেব অবশ্য আমাদের জন্য কিছু করতে বাকি রাখেন নি।

বাবা তখন *Sadhana* নামে ইংরেজি বইয়ের প্রবন্ধগুলো লিখছেন। এক-একটা লেখা শেষ হয়, আর আমি তা টাইপ করতে দিই। কিন্তু ঘন ঘন সংশোধন-সংযোজনের ফলে দেখা গেল, লোক রেখে টাইপ করানো বেশ খরচ-সাপেক্ষ হচ্ছে। আমি তখন একটা ছোটোখাটো মেশিন কিনে নিজেই টাইপ করতে লাগলাম। এক-একটা লেখা কতবার যে টাইপ করতে হল তার ঠিক নেই। গোটা বই যখন টাইপ করা শেষ হল, ততক্ষণে বইটা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। স্থানীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের পাদরি মহাশয় ছিলেন খাস হার্ভার্ডের গ্র্যাজুয়েট, সুতরাং তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্থানীয় রক্ষণশীল খ্রীস্টানদের তুলনায় অনেক উদার। তিনি প্রায়ই তাঁর চার্চের বাছা বাছা

কয়েকজনকে ডেকে বাবাকে বলতেন তাঁর লেখা থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাতে। এঁদের আগ্রহ দেখে বাবা একে একে *Sadhana*র সব কটি প্রবন্ধই পড়ে শুনিয়েছিলেন। এক-একটা প্রবন্ধ যেন এক-একদিনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু আর্বানা হল যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ— একপ্রকার মফস্বল বললেই হয়। এমন জায়গায় যে বাবা বেশি দিন সুস্থির হয়ে থাকবেন, সেরকম আশা করাটাই আমার ভুল হয়েছিল। তিনি যে হাঁফিয়ে উঠেছেন, তার পরিচিত লক্ষণ অচিরেই প্রকাশ পেতে লাগল। প্রবন্ধগুলি লেখা শেষ হয়ে গেছে; প্রবন্ধের বিষয় হল ভারতের অধ্যাত্মজগতের গভীর সব বাণী। পশ্চিম জগতে ভারতের এই মর্মবাণী পৌঁছে দেবার জন্য বাবার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে একটা সুযোগ এসে গেল। দি ফেডারেশন অব রিলিজাস লিবারল্স্ নামে এক সংস্থা রচেস্টার শহরে এক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সেখান থেকে বাবার ডাক এল। জাতিবৈরিতা অর্থাৎ Race Conflict-এর উপর বাবা যে বক্তৃতা দেন, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর তা খুব ভালো লাগে। এই সম্মেলনের আওতায় বাবার দেখা হয়ে গেল জর্মান দার্শনিক ডক্টর রুডল্ফ্ অয়কেন-এর সঙ্গে। তিনি রচেস্টারের এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য সুদূর জর্মানি থেকে এসেছেন। রচেস্টারে বাবার অধিকাংশ সময় কাটল অয়কেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়।

অতঃপর নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাবার আমন্ত্রণ আসতে লাগল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দেবার কথা, সুতরাং বাবার থাকার জন্য ব্যবস্থাদি করতে আমায় শিকাগো চলে যেতে হল। এইখানেই মিসেস উইলিয়াম ভন্ মোডির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। মিসেস মোডি বিশেষ আগ্রহে বাবাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। শিকাগোতে অবস্থানকালে তাঁর বাড়িতেই থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। এই প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে মিসেস মোডির সঙ্গে আমাদের প্রীতির যোগ তাঁর মৃত্যু অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে জেনেছিলাম, কেবল বাবা নন, খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখক ও শিল্পীর তিনি ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। বিদেশী অভ্যাগতদের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল আকর্ষণের বস্তু।

শিকাগোর পর বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এল হার্ভার্ড ও নিউ ইয়র্ক থেকে।

বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের আর্বানার পাট এবার উঠিয়ে দিতে হবে—ডক্টরেট পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। এজন্য খুব যে আক্ষেপ হয়েছিল তা অবশ্য বলতে পারি নে।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরা আমেরিকা থেকে বিলেত ফিরলাম এবং তার কিছুদিন পরেই (৪ সেপ্টেম্বর) জাহাজে করে দেশের দিকে পাড়ি জমালাম।

কয়েকটি ঘটনা

বাবা ছিলেন জন্মপথিক। বয়স যখন কম ছিল তখনো বেশি দিন বাড়ি বসে থাকা তাঁর ভালো লাগত না। তখন তিনি দেশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে বেড়াতেন। দু-বার বিলেতেও গিয়েছিলেন— অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প মেয়াদে। প্রথম যেবার বিলেত যান সে আমার জন্মের অনেক কাল আগে। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে, তখন আমি নিতান্তই শিশু। পরের বার যখন ইয়োরোপে যান তখন এবং একবার আমেরিকায়, আমি সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯১২, ১৯২০, ১৯২৪, ১৯২৬ ও ১৯৩০ সালে আমরা তাঁর বিদেশ সফরের সঙ্গী হয়েছিলাম। ১৯৩২ সালে তিনি যখন ইরান ও মেসোপটেমিয়ায় আকাশপথে ঘুরে এলেন— সেবার তাঁর সঙ্গে প্রতিমা গিয়েছিলেন, অসুস্থতাবশত আমি যেতে পারি নি। অন্যান্যদের নিয়েও বাবা একাধিকবার দূরপ্রাচ্যে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ঘুরে এসেছিলেন। রাশিয়াতে যেবার গেলেন সেবারেও ওঁর সঙ্গে যাওয়া আমাদের পক্ষে ঘটে ওঠে নি।

১৯১২ সালের বিলেত-ভ্রমণ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ ও তার ফলে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য স্মরণীয়। এর পরে তিনি বিলেত ও ইয়োরোপে বেড়াতে যান ১৯২০ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের অল্প কিছুদিন পরেই। ১৯২০ ও ১৯২১— এই দুটি বছরে আমরা ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশে ঘুরি এবং শীতের এক দীর্ঘ মরসুম কাটাই আমেরিকায়। এই দু-বছরে বাইরের জগৎকে আমরা যেমন অন্তরঙ্গভাবে চিনতে পেরেছিলাম, তেমনটা আর কখনো ঘটে নি। যুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে একটা বিরাট লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেছে— তার স্মৃতি তখনো সমগ্র সভ্য জগতের মনে জাগরূক। আরো একবার প্রাচ্যের মুখে তাকিয়ে পশ্চিম তখন ভাবছে, হয়তো পূর্বদিগন্ত থেকে আলো দেখা দেবে: সেই আলোতে তারা আবার নূতন করে পথ চলতে শুরু করবে। ঠিক এই রকম মুহূর্তে পশ্চিমী জগতে বাবার উপস্থিতি যেন অলৌকিক আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছিল প্রতীচ্যবাসীর কাছে। প্রাচ্যখণ্ড থেকে বাবা যে বাণী বহন করে আনলেন, তা থেকে তারা যেন নূতন আশার ইঙ্গিত

দেখতে পেল। বিলেত ও ফ্রান্সের লোকেদের উচ্ছ্বাস একটু কম— কিন্তু এই দুই দেশেও বাবা যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অভ্যর্থনা পেলেন, তা বিস্ময়কর। মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপের লোকেরা তাঁকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করার উপক্রম করেছিল। জনবহুল সভাসমিতিতে ও রেল স্টেশনে লোকের পর লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসত— কেবল বাবার লম্বা জোব্বার এক প্রান্তে মাথা ঠেকাতে। এই সময় তাঁর বইয়ের যেমন কাটতি হয়েছিল তেমনটি আর কখনো হয় নি। জর্মানিতে বই বিক্রি হল লক্ষ লক্ষ। যে ব্যাঙ্কে রয়্যালটির টাকা জমা পড়ছিল, তারা ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করে পাঠাল, জর্মান মার্কের মূল্য হ্রাস পাবার আগে আমরা টাকা তুলে নিতে চাই কিনা। আমরা যখন জর্মানিতে গিয়ে পৌঁছলাম, ততদিনে যে লক্ষ লক্ষ মার্ক জমা পড়েছিল, ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য দশ হাজার টাকার বেশি হবে না। আমাদের সঙ্গে বোম্বাই শহরের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি পরামর্শ দিলেন, সামান্য টাকা তুলে কী হবে, তার চেয়ে জমানো টাকায় ব্যাভেরিয়ান বণ্ড কিনে রাখা অনেক ভালো। কিছুদিন সবুর করলে আবার মার্কের মূল্যমান নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। তাঁর এই সদুপদেশ কার্যে পরিণত করার দু-চার দিন আগেই ব্যাঙ্ক থেকে এই মর্মে চিঠি এল : বাবার নামে যে টাকা জমা পড়েছিল তার মূল্য কয়েক আনায় এসে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তাঁরা অ্যাকাউণ্ট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অল্পের জন্য বাবা লক্ষপতি হওয়ার থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন!

আমরা তখন আছি দক্ষিণ ফ্রান্সে। কাপ্ মার্তাঁ-য় আলবেয়ার কান্-এর সুদৃশ্য ভিলায় কয়েক সপ্তাহ থাকা হবে— এইরকম স্থির হয়েছে। সদ্য-ইতালি-ফেরতা একজন ফরাসি বান্ধবীর কাছে একদিন একটা মজার গল্প শোনা গেল। বান্ধবীটি ছবি এঁকে থাকেন; গিয়েছিলেন ইতালির রিভিয়েরা অঞ্চলে। সেখানকার এক জেলেপাড়ায় সমুদ্রের ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন, একজন জেলে রোদ্দুরে তার জাল শুকোতে দিয়ে বালির উপরে শোয়ানো নৌকার ছায়ায় বসে আপন মনে একটি বই পড়ছে। তাঁর খুব কৌতূহল হল, তিনি গিয়ে লোকটিকে জিগগেস করলেন এমন মন দিয়ে সে কী বই পড়ছে। লোকটি তো চটেই অস্থির; বলল, 'আপনি ভাবছেন আমি আজেবাজে কোনো গল্পের বই পড়ছি! এই দেখুন আমার হাতে কী বই— তাগোর-এর লেখা 'ডাকঘর'!'

ভারতীয় একজন জঙ্গি অফিসারের মুখেও এইরকম একটা গল্প শুনেছিলাম। মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইয়োরোপের কোথাও রেলগাড়ি চেপে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের ট্রেন থামিয়ে একদল মেয়ে এসে সেই কামরায় উঠল, ঝুড়ি ভরতি করে তারা ফুল ফল উপহার এনেছে। ট্রেন যখন চলতে শুরু করল, তারা চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের এই উপহার টাগোর-এর দেশেব লোকেদের জন্য।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল, শুনেছি ফরাসি দেশেব প্রধানমন্ত্রী ক্লেমঁাসো সেদিন সন্ধেবেলা কঁতেস দ্য নোয়াইকে ডেকে, তাঁর মুখে গীতাঞ্জলির কিছু কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী হল একটি চিঠি। যুদ্ধে তরুণ কবি উইলফ্রিড ওয়েন্-এর অকালমৃত্যুব পর তাঁর মা লিখেছিলেন এই চিঠি। চিঠিখানি আমি নীচে তুলে দিচ্ছি :

শ্রুজবেরি

১ অগস্ট ১৯২০

শ্রদ্ধেয় স্যর রবীন্দ্রনাথ,

যেদিন শুনেছি আপনি লণ্ডনে এসেছেন, সেদিন থেকে রোজই ভাবছি আপনাকে চিঠি লিখি। আজ আপনাকে আমার মনের কথাটুকু জানাবার জন্য সেই চিঠি লিখছি। এ চিঠি আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে কিনা জানি না; কারণ আপনার ঠিকানা আমার জানা নেই। তবু আমার মনে হচ্ছে লেফাফার উপর আপনার নামটুকুই যথেষ্ট। আজ থেকে দু-বছব আগে আমার অতি স্নেহের বড়ো ছেলে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ফ্রান্স পাড়ি দিল। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। যাবার আগে আমার কাছে বিদায় নিতে এল। আমরা দুজনেই তাকিয়ে আছি ফ্রান্সের দিকে। মাঝখানে সমুদ্রের জল রৌদ্রে যেন ঝলমল করছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার কবি-ছেলে তখন আপন মনে আপনার লেখা কবিতার সেই আশ্চর্য ছত্রগুলি আউড়ে চলেছে :

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—

যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।···

তার পকেট-বই যখন আমার কাছে ফিরে এল, দেখি তার নিজের হাতে এই কটি কথা লিখে তার নীচে আপনার নাম লিখে রেখেছে। যদি কিছু মনে না করেন, আমায় কি জানাবেন আপনার কোন্ বইয়ে সম্পূর্ণ কবিতাটি পাওয়া যাবে?

এই পোড়া যুদ্ধ থামবার এক হপ্তা আগে আমার বক্ষের ধন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিল। যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল, সেদিন এই নিদারুণ খবর এসে পৌঁছল আমাদের আছে। আর কিছুদিন পরেই আমার ছেলের একটি ছোটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এ বইয়ে থাকবে যুদ্ধের বিষয়ে লেখা তার কবিতা। দেশের অধিকাংশ লোক নিশ্চিন্ত আরামে নিরাপদে দেশে বসে আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করছে, এমন-কি, প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, তাদের জন্য কোনো মমতা বা অনুভূতি নেই —এ কথা ভেবে বাছা আমার ভারি মনোবেদনা অনুভব করত। যুদ্ধে যে কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ নেই— এ বিষয়ে তার সংশয় মাত্র ছিল না। কিন্তু নিজের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে সে একটি কথাও বলে নি তার কবিতায়। যারা তাকে ভালোবাসত একমাত্র তারাই বুঝবে— কী গভীর দুঃখ ছিল তার মনের মধ্যে। তা না হলে এরকম কবিতা সে লিখতে পারত না। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর। সে ছিল সৌন্দর্যের উপাসক— তার নিজের জীবন ছিল সুন্দর, কল্যাণময়। আমি অভিযোগ করব না, ভগবান তাকে যখন টেনে নিলেন, ভালোবেসেই নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের প্রাণ, আমি নিয়ত তাঁর কাছে কত প্রার্থনাই করেছি। তিনি প্রেমময়, তিনি যদি ভালো বুঝতেন তা হলে তো মায়ের কোলেই সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। সুতরাং আমি নতমস্তকেই তাঁর বিধান মেনে নিয়েছি। যতদিন এ জগতে আছি, কোনো অভিযোগ না করে নীরবে কাটিয়ে যাব। আমাদের ত্রাণ করার জন্য যিনি মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন, তিনি আমাদের জন্য এক অমৃতলোক রচনা করে রেখেছেন। সেইখানে আমার উইলফ্রিডের সঙ্গে আমি আবার মিলিত হব। আমি যখন চিঠি লিখতে শুরু করি তখন ভাবি নি এত কথা লিখব,

চিঠি বড়ো হয়ে গেল বলে আমায় মার্জনা করবেন। আপনি যদি আমার ছেলের কবিতার বইখানি পড়েন, ভারি অনুগৃহীত বোধ করব। চ্যাটো অ্যাণ্ড উইন্ডাস শরৎকালের মধ্যেই বইখানি বের করবে। যদি অনুমতি দেন আমি একখানি বই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি

উইলফ্রিড ওয়েনের মা

সুজান এইচ. ওয়েন

বাবা যখনই বিদেশে গেছেন এইরকম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছেন। এমন আন্তরিক ও অজস্র শ্রদ্ধার কাছে মন যেন আপনা থেকেই নত হয়ে যায়।

ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জি

পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে দেখি ১৯২০ সালে বাবা যেবার বিদেশে যান, তখনকার অনেক ঘটনা আমি আমার ডায়েরিতে টুকে রেখেছি। অবশ্য সে-সব নিতান্তই তাড়াহুড়োয় নোট-আকারে লেখা। তবু মনে হয় বাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের হয়তো এ-সব নোট পড়তে মন্দ লাগবে না :

১৫ মে ১৯২০

প্রাতরাশ সেরে সকাল সাড়ে-দশটা নাগাদ আমরা জাহাজঘাটের দিকে রওনা দিলাম। আমরা যে রওনা হচ্ছি— এ কথাটা খুব বেশি জানাজানি হয় নি। কেবল ক্ষিতিমোহন সেন সঙ্গে এলেন আমাদের তুলে দিতে। দুপুরের মধ্যেই আমরা জাহাজে উঠে পড়লাম। জাহাজ যখন নোঙর তুলল তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। জাহাজটা বড়ো হলে কী হবে, লোকও তাতে বিস্তর।

১৬ মে

জাহাজে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন— অলওয়ারের মহারাজা, আগা খাঁ, স্যর করিমভাই, স্যর জিজিভাই, নওনগরের জামসাহেব রণজিৎসিংজি (রনজি) ও আরো অনেকে। এই কয়েকজন ছাড়া বাকি যাত্রীরা সব গতানুগতিক ধরনের লোক। মুশকিল এই যে, এরাই সংখ্যায় বেশি। সারা জাহাজ লোকে গিজগিজ করছে— এত ভিড় আমার ভালো লাগে না। আগা খাঁ ও মহারাজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে বাবার দেখছি ভালোই লাগছে। আগা খাঁ প্রায়ই হাফিজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। সুফি মতবাদ নিয়েও দুজনের আলোচনা হচ্ছে। জামসাহেবকে আমার বেশ লাগছে— হাসিখুশি অমায়িক মানুষটি।

৫ জুন

মার্সাই থেকে প্লিমাথ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। আমরা ভেবেছিলাম প্লিমাথে কেবল কেদার দাশগুপ্ত আসবেন আমাদের নিতে। তাঁর সঙ্গে পিয়ার্সন সাহেবও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন দেখে আমরা একটু আশ্চর্য হলাম। প্যাডিংটন স্টেশনে সপরিবারে রোটেনস্টাইন এসেছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন কেনসিংটন প্যালেস ম্যান্‌সন্‌স-এ। সেখানে

আমাদের বসবাসের জন্য একটি ফ্ল্যাট ঠিক করে রেখেছেন। ফ্ল্যাট দেখে মনে হল বেশ আরামেই থাকা যাবে।

ডিনারের পর আবার রোটেনস্টাইন এসেছিলেন। বাবার সঙ্গে অনেক গল্পগুজব হল, পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের বিষয়ে বাবা খোঁজখবর করলেন। ভারত ও ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। সব মিলিয়ে যেন ১৯১৩ সালের সেই গ্রীষ্মবাসরের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

৬ জুন

পিয়ার্সন আমাদের সঙ্গেই আছেন। সারাদিন ধরে আজ অতিথিসমাগম হল। সকালবেলা রোটেনস্টাইন এসেছিলেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে। বাবার সঙ্গে ওঁর কথা হচ্ছিল আধুনিক জগতে শিল্পী-সাহিত্যিক ও মনীষীদের কর্তব্য নিয়ে। যেখানে রাজশক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে পরস্ব অপহরণে রত, সেখানে সমাজের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কি জেনেশুনেও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন? বোঝা গেল রোটেনস্টাইন সহযোগিতার পক্ষে। দেশকে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্র যদি আহ্বান জানায়, তা হলে বিদগ্ধমণ্ডলী সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে 'কেমন করে পারেন? আসলে সমাজসেবার ভাব আধুনিক মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে শিকড় চালিয়েছে, যে সে বুঝেছে সেখানেই তার মোক্ষলাভ। তা ছাড়া বিশেষভাবে যদি শিল্পীদের কথা বিচার করা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। ললিতকলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা বিত্তবানের পক্ষেও দিন দিন দুরূহ হয়ে পড়ছে। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে জনগণের সেবা করা ছাড়া শিল্পীদের আর অন্য গতি নেই। বাবা বললেন, অন্যদের কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, অন্তত্পক্ষে শিল্পীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন। শিল্পীকে বিধিনিষেধের নিগড়ে বেঁধে রাখা মানে শিল্পকেই কুণ্ঠিত করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাবা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন যে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিল্পীদের মনের উপর তথা তাদের কাজের উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে, শিল্পের পক্ষে তা হয়তো স্বাস্থ্যকর নয়। রোটেনস্টাইন বললেন, বাধ্যবাধকতা থাকা শিল্পীদের পক্ষে সবসময়ে খারাপ নয়। পরন্তু শিল্পের বিষয়বস্তু যদি শিল্পীর রুচির উপরে একেবারে

ছেড়ে না দেওয়া হয়, তা হলে ফল যে খারাপ হবেই এমন কথা নেই। ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতালীয় শিল্পীরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে তথাকথিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' যে সব সময়ে সুফল প্রসব করছে না, 'ফিউচারিস্ট' শিল্পীদের দেখেই তা বোঝা যায়।

গ্রীনিচের মানমন্দিরে স্যর ফ্র্যাঙ্ক ডাইসনের সঙ্গে বিকেলটা বেশ কাটল আজ। ভারি সহজ মানুষ ডাইসন, শাদাসিধে, আড়ম্বরের বালাই নেই। শোরগোল না তুলে নীরবে কাজ করার মতো পরিবেশ তাঁর এই কেন্দ্রে— অথচ কাজের পরিমাণ ও গুরুত্ব কিছু কম নয়। ডাইসনের পূর্ববর্তীরা সকলেই ছিলেন দিক্‌পাল জ্যোতির্বিদ্— স্বয়ং নিউটন এই মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হয় যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু প্রজন্ম ধরে একটা মহৎ কাজ এই প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন হয়ে চলেছে। সম্প্রতি সূর্যের যে পূর্ণগ্রহণ ঘটে গেছে এবং যার ফলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রথম সত্যিকার সমর্থন পেল— স্যর ফ্র্যাঙ্ক আমাদের সেই সূর্যগ্রহণের আলোকচিত্র দেখালেন।

১৭ জুন

কয়েকদিন ধরে এ-কাজে ও-কাজে বিস্তর ঘোরাফেরা করতে হয়েছে বলে ডায়েরি লেখা হয়ে ওঠে নি। রোটেনস্টাইনদের সঙ্গে অবশ্য প্রায় প্রত্যহ দেখা হচ্ছে। বাবা প্রায়ই ওঁর বাড়িতে যাতায়াত করছেন। অবশ্য আগের বারে আমরা যখন হ্যামস্টেডে ছিলাম তখন যাতায়াতের পালা ছিল এর চেয়েও ঘন ঘন। রোটেনস্টাইনের বাড়ি যাওয়ার এক মস্ত সুবিধা ও আকর্ষণ এই যে, সেখানে পূর্বপরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকের সঙ্গে বাবার দেখাশোনা ঘটছে।

আজ বাবা ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়েছিলেন মি. মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সঙ্গে দেখা করতে। মণ্টেগুকে বাবা যা বলে এলেন তার সারমর্ম হল এইরকম : ডায়ার শাস্তি পাক ভারতের লোক সেটা তত চায় না, যতটা চায় তার এই দুষ্কৃতি, সভ্যসমাজ-বিগর্হিত এই দুর্নীতি ইংরেজদের দ্বারাই নিন্দিত হোক। ভারতের শাসনব্যবস্থা যেন এক যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে যার মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শলেশ পর্যন্ত নেই। ভারতবাসীর কাছে এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

কাঠিয়াওয়াড়ের রাজন্যবর্গের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের গোরু মোষ সুদূর ব্রাজিলদেশে চালান দেওয়ার ঘটনাটি বাবা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করলেন। দুধের অভাবে কাঠিয়াওয়াডে যে হাজার হাজার শিশু অকালে মারা গেল— সেদিকে সরকারের লক্ষ্যমাত্র নেই। মি. মণ্টেগু বললেন, পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে বাবার সঙ্গে তিনি একমত। কিন্তু তা হলে কী হয়, সর্বদা নিজের মত অনুসারে চলার সুযোগ ও স্বাধীনতা তাঁর নেই। তিনি আরো বললেন, সরকারি শাসনযন্ত্রে এমন কিছু আভ্যন্তরিক পরিবর্তন তিনি ঘটানোব চেষ্টা করছেন যার ফলে ভবিষ্যতে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো ব্যাপারের আব পুনরাবৃত্তি হবে না।

ডিনাবের পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এলেন রুশ চিত্রকর নিকোলাস রোয়েরিখ্ ও তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বাবাকে দেখানোর জন্য রোয়েরিখ্ তাঁর ছবির একটি অ্যালবাম এনেছিলেন— তাঁর জয়ন্তী উপলক্ষে রোয়েরিখের বন্ধুবান্ধবেরা এই অ্যালবামটি ছাপিয়েছেন। চমৎকার ছবিগুলো, প্রতীচ্যের চিত্রকলায় এ-সব ছবির জুড়ি মেলা ভার। ছবি দেখে বাবা মুগ্ধ হলেন। রোয়েরিখের এক ছেলে লণ্ডনে সংস্কৃত পড়ছে, আর একজন পড়ছে স্থাপত্যবিদ্যা। আগামী সেপ্টেম্বরে রোয়েরিখ্ সপরিবারে ভারতে যাচ্ছেন। চমৎকার লোক এঁরা— সহজ সরল অমায়িক। বিলিতি সাহেবদের মধ্যে যে একটা উগ্র কাঠিন্যের ভাব আছে, এঁদের মধ্যে তার একান্তই অভাব। এঁদেব সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় হলে আমরা খুশি হব।

২৭ জুন

আজ দুপুরে বাবা কর্নেল লরেন্সের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন। এঁকে বাবার খুব ভালো লেগেছে। লরেন্স বললেন, ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ওঁর আরবদেশে যেতে পর্যন্ত কুণ্ঠা হয়। তিনি আরবদের যে-সব কথা দিয়ে এসেছেন তার একটিও রাখা গেল না— এখন কোন্ মুখে তিনি আরবদের কাছে যাবেন। ভাবতে অবাক লাগে যে লরেন্স যখন আরবদেশে প্রথম গেলেন, তখন তিনি অক্সফোর্ডের এক তরুণ স্নাতক মাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরবদের চিত্ত জয় করে তাদের নেতা হয়ে বসলেন এবং এক পরাক্রান্ত সৈন্যদল গঠন করে আরবদেশ থেকে আটোমান তুর্কিদের বহিষ্কৃত করলেন। ও দেশের লোকেদের সঙ্গে তিনি এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে

ওরা লরেন্সকে আপনার লোক বলেই ভাবত। আর একটু হলেই আরবরা ওঁকে হয়তো দেশের রাজসিংহাসনে পর্যন্ত বসিয়ে দিত। সত্যিকার রোমাঞ্চকর জীবন লরেন্সের— এমনটি আর এ যুগে দেখা যায় না। বাবা ওঁকে বলেছিলেন, পশ্চিমের লোকের অন্তরে একটা পাশবপ্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে। ভারতীয়দের স্বভাব এমনই ভিন্নপ্রকৃতির যে বহুদিনের নিকট সংস্পর্শ সত্ত্বেও শাসকসম্প্রদায়ের এই পাশবিকতা তারা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারবে না। লরেন্স বললেন, ইংরেজদের জব্দ করার একমাত্র উপায় হল তারা যতখানি শক্তিতে আঘাত করে, তার দ্বিগুণ শক্তিতে সে-আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া। একমাত্র এই উপায়েই তাদের চৈতন্য হতে পারে। শক্তিতে যারা তাদের তুল্য, ইংরেজ তাদেরকেই ভ্রাতৃত্বের যোগ্য বলে স্বীকার করে।

জুন

গত বৃহস্পতিবার ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট সোসাইটি থেকে বাবাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ক্যাক্সটন হলে এক সভা হয়। সভায় তিলধারণেরও জায়গা ছিল না। সভাপতি হয়েছিলেন চার্লস রবার্ট্স্— যিনি মণ্টেগুর আগে ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারি ছিলেন। দীর্ঘ ভাষণ' দিলেন রবার্ট্স্, যদিও বেশির ভাগ লোক তা শুনতেই পেল না। অতঃপর এক স্বনামধন্য সুরকারের রচিত সুরে মিস টাব্স্ বাবার চারটি কবিতা গেয়ে শোনালেন। বেশ জোরালো গলা তাঁর ; কিন্তু কবিতার ভাব গানের সুরে যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলে আমাদের মনে হল না। গানের ভঙ্গিটি বড়ো বেশি অপেরা-ঘেঁষা। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত লরেন্স বিনিয়ান-এর একটি আবৃত্তি করে শোনালেন সিবিল থর্ন্ডাইক্। সম্প্রতি ইনি রঙ্গমঞ্চে 'ট্রোজান উইমেন' ও 'মিডিয়া' নাটকে বিয়োগান্ত ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর সেই আশ্চর্য সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাবা একটি ছোটো বক্তৃতায় বেশ মানানসই প্রতিভাষণ দিলেন। সবাই খুব তারিফ করল। হল থেকে বেরোবার মুখে আর্নেস্ট রীস আমায় বললেন যে, অনুষ্ঠানসূচিতে বাবার ভাষণই সবচেয়ে মনোজ্ঞ হয়েছে। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু-কথা না বলে পারলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ যেন ফেটে বের হল। তাঁর কথার মধ্যে সত্যিকার অনুভূতি ছিল বলে এই উচ্ছ্বাস

বেমানান হয় নি। অলওয়ার ও ঝলওয়ারের দুই মহারাজা, আর্নেস্ট রীস, গিলবার্ট মারে, লরেন্স বিনিয়ান, স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দুবেদের সঙ্গেও এখানে দেখা হয়ে গেল। ওঁরা আজকাল ব্রাইটনেব কাছাকাছি এক পল্লী অঞ্চলে থাকেন; সেখানে যাবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রবেশপথে বহু লোকের ভিড— বাবা যখন গাড়িতে উঠবেন তখন তাঁকে দেখবার আশায় লোকেরা অপেক্ষা করে আছে।

চার্লস রবার্টস আমাদের মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেখানে লর্ড রবার্ট সেসিল ও গিলবার্ট মারে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ভোজনপর্ব শেষ হলে বাবা লর্ড সেসিলকে আলাদা ডেকে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। সেসিল গোড়াতেই জানিয়ে দিলেন যে তিনি এ-সব ব্যাপারে একেবারেই খোঁজখবর রাখেন না, কিন্তু বাবার কাছ থেকে সবকিছু জানতে তিনি যথেষ্ট আগ্রহী। বাবা সব কথা বললেন ও মণ্টেগুর শাসনসংস্কারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। স্যর সেসিল বললেন, 'কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন— আমরা মুষ্টিমেয় ইংরেজ মাত্র ভারতে আছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতের মঙ্গলার্থেই আমরা এই মুষ্টিমেয় লোকেদের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিয়েছি। সুতরাং এই সংখ্যালঘু ইংরেজদের নিরাপত্তা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য আমাদের যথাসাধ্য করতেই হবে।' উত্তরে বাবা বললেন, 'আপনারা ভারতের জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে না গিয়ে আলাদা একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলে নিজেদের এমন করে সরিয়ে রেখেছেন বলেই, যখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় তখন নিছক পশুশক্তি প্রয়োগ না করে পারেন না। এইজন্যই রাজা-প্রজার সম্পর্ক এমন একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁচেছে। সেসিল খুব বেশি যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে চাইলেন না, বাবার বক্তব্য শুনে যথাশীঘ্র প্রস্থান করলেন। গিলবার্ট মারে বললেন, তিনি সবরকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বাবা তাঁকে বোঝালেন যে তিনি এবং চিন্তাজগতে নেতৃস্থানীয় তাঁর মতো আরো কয়েকজন ইংরেজ যদি শাসনব্যাপারে অবৈধ পশুশক্তির প্রয়োগের বিরুদ্ধে সকলের মিলিত স্বাক্ষরে একটি ইস্তাহার প্রচার করেন— তা হলে হয়তো তার নৈতিক প্রভাব ভালো হতে পারে। মারে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এ ব্যাপারে

তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ; তাঁর মতে এরকম কাজ হয়তো খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

সোমবার দিন আমরা সবাই কেম্‌ব্রিজ গিয়েছিলাম— লেডি রবার্টস্‌ চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাবা চলে গেলেন পিয়ার্সনের সঙ্গে দেড়টার গাড়িতে। আমরা গেলাম বিকেল বেলা। সেদিন ছিল কেম্‌ব্রিজে ডিগ্রি বিতরণের অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে অনেক অভ্যাগতের সমাগম হয়েছে। প্রফেসর অ্যাণ্ডারসন স্টেশনে এসেছিলেন, এবার যেন তিনি অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা পাওয়া মুশকিল দেখে আমরা 'ব্লু বোর' নামে এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম। পরের দিন সারা সকালটা বাবা অ্যাণ্ডারসন সাহেবের সঙ্গে বাংলা কবিতার ছন্দ ও ফরাসি ছন্দের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করে কাটালেন।

লাঞ্চ খাওয়া হল লোজ্‌ ডিকিন্‌সনের সঙ্গে। অধ্যাপক কেইন্‌সও এসেছিলেন। তাঁকে দেখে যেন কলেজের কোনো প্রাণোচ্ছল ও বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ ছাত্র বলেই মনে হয়। অর্থশাস্ত্রে এঁরই যে বিশ্বজোড়া নামডাক সে কথা বিশ্বাস হতে চায় না। খ্যাতি তাঁর মধ্যে একটুও পরিবর্তন আনতে পারে নি। কিংস কলেজে ডিকিন্‌সনের বাসস্থানটি ভারি চমৎকার। প্রাচ্য-দেশে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি রেশমের উপর সূচিশিল্পের সুন্দর সব নিদর্শন সংগ্রহ করে এনেছেন। আর এনেছেন চীনা পদ্ধতিতে আঁকা ছবি। সেই-সব দিয়ে ওঁর কামরাগুলি রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দূরপ্রাচ্যে ও আমেরিকায় ভ্রমণ, ভারতের ধর্ম ও দর্শন, চীনদেশের শিল্পকলা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। ডিকিন্‌সনের বিশেষ ইচ্ছে যে ভারতীয় দর্শনের সারতত্ত্বগুলি পাশ্চাত্ত্য পাঠকের উপযোগী করে প্রকাশ করা হোক। বাবা বললেন, এ পর্যন্ত যে-সব অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশ করেছেন পশ্চিমের পণ্ডিত ব্যক্তিরা। ভাষা বা রচনারীতির দিকে তাঁরা নজর দিয়েছেন খুব কম। তা ছাড়া তাঁরা সব সময়ে হয়তো দর্শনের মর্মস্থলে ঠিকমতো প্রবেশও করতে পারেন নি। ফলে এই-সমস্ত অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখপাঠ্য হয় নি।

ম্যুরহেড বোন্-দের বাড়িতে সপ্তাহখানেক কাটানোর জন্য শনিবার বিকেলে বাবা পিয়ার্সনকে নিয়ে পিটার্সফিল্ড গেলেন। স্টার্জ মোর-ও থাকেন কাছাকাছি। আমরা আর গেলাম না, কারণ পিটার্সফিল্ড এত লোকের স্থান সংকুলান হবে না।

আজ বিকেলে আমরা য়েট্‌স্-দম্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁদের ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে রোটেনস্টাইন বলেছিলেন যে ওঁরা এজরা পাউণ্ডের ফ্ল্যাটেই থাকেন। সুতরাং আমরা আমাদের পরিচিত ১০ নম্বর চার্চ ওয়াক-এ চলে গেলাম। সেখানে পৌঁছে শুনি পাউণ্ড বাসা বদল করেছেন। খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে দেখা গেল য়েট্‌স্-দম্পতি এখন আমাদের বাসার কাছেই চার্চ স্ট্রীটে আছেন। রোটেনস্টাইনই বাড়ি খুঁজে বের করলেন। কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে রোটেনস্টাইন চলে গেলেন। য়েট্‌স্ প্রায় আগেকার মতোই রয়েছেন, খুব বেশি বদল হয় নি। কিছুদিন হল ওঁরা সস্ত্রীক আমেরিকা থেকে ফিরেছেন— য়েট্‌স্ সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বাবার আধুনিক রচনার মধ্যে ওঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ঘরে-বাইরে'র অনুবাদ। ওঁর মতে 'জীবন-স্মৃতি'-পর্যায়ে গত কয়েক বছরের কথা থাকলে ভালো হত, কারণ সাম্প্রতিক কালেই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট লেখাগুলি বেরিয়েছে এবং তিনি নিভৃত জীবন থেকে বেরিয়ে ক্রমশ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করছেন। তিনি আরো বললেন, 'ঘরে-বাইরে'র সমস্যাগুলির সঙ্গে আধুনিক আইরিশ সমাজের সমস্যারও যেন অনেক-খানিই মিলে যায়। জিগগেস করলেন, 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে আমাদের দেশে হৈ-চৈ হয়েছে কিনা। এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আয়ার্ল্যাণ্ডের কোনো লোক যদি এরকম একটি উপন্যাস লিখতেন, তা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যেত।

শুক্রবার রাত্রে ডিনারের পর রোটেনস্টাইন তাঁর বাড়িতে আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। দিলীপকুমার রায় কয়েকটি ভারতীয় গান গেয়ে শোনালেন। এই আসরেই য়েট্‌স্-এর সঙ্গে এ-যাত্রা বাবার প্রথম সাক্ষাৎ। য়েট্‌স্-এর অনুরোধে বাবা গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি গান গাইলেন। প্রথমে য়েট্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর স্বরে ইংরেজি অনুবাদ আবৃত্তি করলেন, অতঃপর বাবা মূল বাংলা গান গেয়ে শোনালেন।

আজ স্যর হরেস প্লাংকেট-এর সঙ্গে তাঁর মেফেয়ার অঞ্চলের ফ্ল্যাটে বাবার অনেক কথাবার্তা হল। পিয়ার্সন আর আমি ছিলাম বাবার সঙ্গে। আলোচনার মূল বিষয় হল আয়ার্ল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলন। স্যর হরেস বাক্‌পটু নন, কিন্তু তিনি যা বললেন তার সমস্তটাই আয়ার্ল্যাণ্ডের পল্লীসংস্কারের কাজে তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি একাধারে আদর্শনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী মানুষ। তাঁর অনেক কল্পনা তিনি বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছেন —এ তাঁর কম কৃতিত্ব নয়। তিনি বললেন, গোড়ায় তাঁরা ভুলচুক যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু এও একপ্রকার ঠেকে শেখা। এখন তিনি স্পষ্ট বলতে পারেন, কোন্ কোন্ ভুলের দরুন কী কী বিষয়ে তিনি ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু রীতি হিসাবে সমবায়প্রথার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। আবার যদি গোড়া থেকে কাজ করার সুযোগ হত তাঁর, তবে ঠিক বলতে পারতেন কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, কোথায় কী রকম আটঘাট বাঁধতে হবে। তিনি বললেন, পশ্চিম আয়ার্ল্যাণ্ড অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেক মিল আছে। শরীর ভালো না থাকায় তিনি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কমিশনের সদস্য হিসেবে ভারতে যেতে পারলেন না বলে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করলেন। সমবায়নীতির গোড়াকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিলতে পারে, তেমনটা বোধ হয় ধর্মের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। আমাদের ডেনমার্ক যাবার পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানাতে তিনি বললেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে তিনি যখন কাজ শুরু করেন তখন ডেনমার্কে অনুসৃত রীতিপদ্ধতি অবিকল অনুসরণ করেছিলেন। ডেনমার্কের পরিবেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের তুলনায় সমবায়ের দিক থেকে অনেক বেশি অনুকূল, তাই এই-সব রীতিপদ্ধতি আয়ার্ল্যাণ্ডে সবসময় কার্যকর হয় নি। তাঁর মতে আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে ভারত যতটা শিখতে পারবে ততটা ডেনমার্ক থেকে সম্ভব হবে না। কোথায় কী বাধাবিপত্তি ঘটতে পারে, কেমন করে তার নিরাকরণ করা যায়— এটাই হল শিক্ষণীয় বিষয়। সে শিক্ষার বেশি সুযোগ মিলবে আয়ার্ল্যাণ্ডে। তাঁর মতে সর্বাগ্রে দরকার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও জনসাধারণের সত্যিকার প্রয়োজন বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান। তার পর কোনো একটি বিশেষ কার্যক্রম নিয়ে নামতে হয় এবং সেই একটি কাজ সফল

করে তুলতে হয়। নানা কাজ হাতে নিয়ে প্রথমেই অকৃতকার্য হলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। তাতে কাজেরও ক্ষতি। অতঃপর তিনি বাবাকে একবার আয়ার্ল্যাণ্ড ঘুরে যেতে বললেন। অবিলম্বে যাবার দরকার নেই, অক্টোবর নাগাদ গেলেই চলবে। তখন আবহাওয়াও ভালো থাকবে এবং ততদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভালোর দিকে যাবে বলে মনে হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে লেডি কর্টনি-র বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ ছিল বাবার, সেখানে 'কনটেম্পরারি রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক গুচ্ এবং সিডনি ওয়েব ও তার স্ত্রীর সঙ্গে বাবার আলাপ হল। গুচ্ সাহেবকে বাবার বেশ ভালো লেগেছে। কাপড় কলের ভারতীয় মালিকেরা মজুরদের উপর যথেচ্ছাচার করে, ভারতের সাধু সন্ন্যাসী ও ফকির শ্রেণীর লোকেরা বিনা কায়িক শ্রমে সমাজের অন্ন ধ্বংস করে— এই রকম সব ঢালাও মত প্রকাশ করলেন মিসেস ওয়েব। বাবা অবশ্য বেশ দৃঢ়ভাবেই সে-সব কথার প্রতিবাদ জানালেন।

৪ অগস্ট

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহটা কাটল নাটক অভিনয়ে। অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল 'ইউনিয়ন অব ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' নামে এক সংস্থা। কিছুকাল আগে 'স্যাক্রিফাইস অ্যাণ্ড আদার প্লেজ' নাম দিয়ে বাবার নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই নাট্যকাব্যগুলিই অভিনয় করে দেখানো হল। এই একই সংস্থার উদ্যোগে বাবা বাংলার বাউল গান বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। অভিনয়ের ব্যাপারে আমরা সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করলাম। বাবা নিয়মিত মহড়ায় উপস্থিত থেকে নির্দেশ দিতেন। প্রতিমা ও আমি ভার নিয়েছিলাম সাজপোশাকের ব্যাপারে। উইগমোর হল-এ অনুষ্ঠিত এই অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা ছিল নিতান্ত সাদাসিধে— পিছনে গাঢ় নীল রঙের পরদা, কয়েকটা ফুলের টব এবং দু-পাশে দুটি স্পটলাইট। ফুটলাইটের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। অভিনয় জমেছিল ভালোই। এক-একটি নাটিকার আগে সরোজিনী নাইডু নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দু-চার কথা বললেন। বিরতির সময় গান গেয়ে শোনালেন আনন্দ কুমারস্বামীর স্ত্রী অ্যালিস। সুর একটু একঘেয়ে হলেও তাঁর গানের গলাটি ভালো বলে লোকে মন দিয়ে শুনল। যবনিকা ওঠার আগে বাবা 'জনগণমন-অধিনায়ক' কবিতাটির মূল

বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে আবৃত্তি করলেন। নাটকের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রত্যেক নাটকের প্রস্তাবনা-স্বরূপ কিছুক্ষণের জন্য মূক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন 'কচ ও দেবযানী' অভিনয়ের শুরুতে দেখা গেল তপোবনে গুরু বসে আছেন, চারদিকে শিষ্যরা বসে অধ্যয়ন করছে, আশ্রমবালিকারা জলের ঝারি নিয়ে গাছে জল দিচ্ছে। অধ্যয়ন শেষ হল, উদাত্ত কণ্ঠে গুরু মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সকলে বেরিয়ে যেতে কচের প্রবেশ ও দেবযানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেবযানী তখন ফুলের মালা গাঁথছে···ইত্যাদি। এই ধরনের পূর্বরঙ্গ রচনার কথা বাবার মাথাতেই প্রথম আসে। তপোবনের দৃশ্যে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুকুল দে, নিখিল চৌধুরী ও ক্লিংহফার পরিবারের দুই বোন। দুঃখের বিষয় কেদার দাশগুপ্ত যখন এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন তখন অধিকাংশ সমঝদার লোক লণ্ডনের বাইরে ছুটি কাটাতে চলে গেছেন। তবু হল-ভরতি লোক হয়েছিল— অভিনয় তাঁদের ভালোও লেগে থাকবে। অভিনয়ের পরের দিন ছিল বাবার বক্তৃতা। বাবার বক্তৃতা শোনবার জন্য যত টিকিট বিক্রি হয়েছিল অভিনয়ের বেলা ততটা হয় নি।

কিছুদিন আগে রোটেনস্টাইনের বাড়িতে বাবার সঙ্গে মাদ্‌মোয়াজেল আরাঞি (Mlle. D'Aranyi)-র দেখা হল। সেদিন রোটেনস্টাইন দিলীপকুমার রায়কে ডেকেছিলেন হিন্দুস্থানি গান শোনাতে। বাবাকেও দু-চারটে নিজের গান গাইতে হল। গান শুনে মাদ্‌মোয়াজেল মুগ্ধ, বাবাকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন একটি জলসায় আসতে, সেখানে তাঁর বেহালা বাজাবার কথা। বাবাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাবেন— এরকম একটি আশা তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মনে মনে পোষণ করছেন। বাবা জলসা থেকে ফিরে এলেন খুব খুশি হয়ে— এত খুশি তাঁকে সচরাচর দেখা যায় না। মাদ্‌মোয়াজেল বাজিয়েছিলেন চমৎকার— এমন ভালো তিনি আগে কখনো বাজান নি। বাবা বললেন, এই প্রথম তিনি যেন ইয়োরোপীয় সংগীত বুঝলেন ও শুনে খুশি হলেন। বাজিয়ে হিসেবে মাদ্‌মোয়াজেলের অদ্ভুত ক্ষমতা— তবে ভিতর থেকে একটা তাগিদ কিংবা প্রেরণা না এলে তাঁর হাত ঠিক খোলে না। সেই সন্ধ্যায় তাঁর হাত সত্যি সত্যি খুলে গিয়েছিল। কেবল বাজিয়ে হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ইনি আর পাঁচজনের মতন নন— সহজ সরল শিশুর মতো স্বভাবের

সঙ্গে হৃদয়ের গভীরতার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। বাবা ও রোটেনস্টাইন দুজনেই একেবারে মুগ্ধ। পরের দিন সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইন মাদ্‌মোয়াজেলকে ডাকলেন তাঁর বাড়িতে বাজনা শোনাতে। আমরা সবাই গেলাম। সেদিন তিনি যেন একটু ক্লান্ত, বললেন যে একা বাজাবেন না, সঙ্গে তাঁর বোনও বাজাবেন। দুজনের যুগ্ম বাজনা খুবই চমৎকার লাগল শুনতে। কিন্তু গত রাত্রের তুলনায় কিছুই নয়। বাবাও এটা লক্ষ্য করলেন। বোনটি বিয়ে করেছেন এক গ্রীককে, তাঁর নাম ফাখিরি; বেশ মানুষটি। এই দুই বোন হলেন গিয়ে বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় সুরকার যোয়াখিম-এর ভ্রাতুষ্পুত্রী। পরের সপ্তাহে আমরা এঁদের বাড়ি গেলাম চায়ের নিমন্ত্রণে। বেশ দ্রুত ভাব জমে উঠল— যেমন এঁদের মিষ্টি স্বভাব তেমনি সহজ আন্তরিকতা। লৌকিকতার অন্তরায় যদি না থাকে, মানুষে মানুষে কত সহজে মেলামেশা যায়। প্রফেসর টোভি-ও এসেছিলেন চায়ে— তিনি বাখ্ ও হাইডন্ থেকে কিছু কিছু বাজিয়ে শোনালেন এবং সুরের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে হাইডন্-এর সুরের সঙ্গে বাবার কিছু কিছু গানের যেমন নিকট-মিল, তেমন আর কোনো পশ্চিমী সুরকারের সঙ্গে নয়। অতঃপর ওঁরা সবাই মিলে সমবেতভাবে ব্রাম্‌স্-এর একটি চমৎকার সুর বাজিয়ে শোনালেন— একযোগে বাজল পিয়ানো, দুটি বেহালা ও একটি চেলো। দুই বোনের সঙ্গে এমন সহজে আমাদের ভাব হয়ে গেল বলে নিজেদের বেশ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

নরওয়ে ভ্রমণ ভণ্ডুল

১৯২০ সাল। মহাযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে, ইয়োরোপ তখনো ঠিক প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। গোয়েন্দা আর গুপ্তচরে চারি দিক তখন ছেয়ে গেছে। আমরা যখন বিলাত পৌঁছই তখন এইরকম একটা অবস্থা চলেছে। ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ থেকে তখন বাবার আমন্ত্রণ আসছে। ১৯১৩ সালের শেষ দিকে বাবাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। রীতি অনুসারে নোবেল কমিটি বাবাকে স্বয়ং, সুইডেনে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় বাবার পক্ষে তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব হয় নি। এবার ইয়োরোপে আসার পর আবার যখন সুইডেন থেকে ডাক এল, সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না। সুতরাং ঠিক হল প্রথমেই বাবা যাবেন সুইডেনে। বাবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে যাবেন উইলি পিয়ার্সন, বোমানজি নামে বোম্বাইয়ের এক পার্শি ভদ্রলোক, প্রতিমা ও আমি। ইতিমধ্যে নূতন এক মহিলা এলেন আমাদের দলে যোগ দিতে— দল ভারী হল বলে বাবা খুব খুশি, কারণ লোকজন তিনি ভালোই বাসতেন। আমাদের সঙ্গে মহিলাটির পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন ইয়োরোপের এক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। লোকটি পণ্ডিত হলেও রাজনীতিতে তাঁর যে বিশেষ উৎসাহ আছে সে কথা আমরা জানতাম। কিন্তু তিনি যে সরকারি দপ্তরের নিতান্ত একজন তাঁবেদার দালালের মতো আচরণ করবেন— এ আমরা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারি নি। কন্টিনেন্টের মেয়েদের একটা সহজাত ক্ষমতা আছে, যে-কোনো অবস্থায় তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই মহিলা দু-দিন যেতে-না-যেতে একেবারে আমাদের বাড়ির লোক হয়ে গেলেন। প্রাচ্যদেশের দর্শন বিষয়ে এঁর গভীর অনুরাগ দেখে বাবা ভারি খুশি হয়েছিলেন। আমাদের সুইডেন ভ্রমণের পরিকল্পনা আছে শুনে মহিলাটি বললেন যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের পদস্থ ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই এঁর ভালো রকম আলাপ-পরিচয় আছে। আরো বললেন, তিনি নিজের খরচে আমাদের গাইড হয়ে যাবেন; এভাবে যদি তিনি কবির সামান্য কাজে লাগেন কিংবা সেবা করতে পারেন—

তা হলে তিনি ও তাঁর দেশের লোক কৃতার্থ বোধ করবেন। স্পষ্ট বোঝা গেল যে মহিলাটিকে নিরস্ত করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিঠিপত্র লিখতে শুরু করে দিলেন এবং সুইডেন-ভ্রমণের যাবতীয় খুঁটিনাটি কার্যসূচি তৈরি করতে লাগলেন। কাজে যেমন তাঁর দক্ষতা, স্বভাবও তেমনি মিষ্টি— পিয়ার্সন আর আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্থির হল, হ্যাহেভন্ বন্দর থেকে জাহাজ ধরে উত্তর সমুদ্র পার হয়ে আমরা নরওয়েদেশের বের্গেন বন্দরে গিয়ে নামব। সেখান থেকে সোজা যাব স্টকহোম। বাবার সঙ্গে যখনই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়েছি, টিকিট কেনার ব্যাপারটা সেরেছি একেবারে প্রায় শেষ মুহূর্তে। এবারেও জাহাজ ছাড়বার কয়েকদিন আগে আমি টিকিট কিনতে গেলাম টমাস কুক-এর অফিসে। যিনি টিকিট বিক্রি করেন তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ চেনাজানা হয়ে গেছে। তিনি বুঝে নিয়েছেন বাবা ঘড়ি-ঘড়ি মত বদলান। টিকিটগুলো দেবার সময় তো তিনি তর্জনী নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এবার কিন্তু আর টিকিট ফেরত নেওয়া হবে না।'

সাউথ কেনসিংটনের ফ্ল্যাটে যখন আমি ফিরে এলাম, সঙ্গে আমার পাসপোর্ট, টিকিট, লগেজ-লেবেল সব কিছুই তৈরি। ফিরতে-না-ফিরতে বোমানজির কাছে এক চমকপ্রদ কাহিনী শোনা গেল— সদ্য তিনি তাঁর সুইডিস মালিশওলার কাছে শুনে এসেছেন। অবশ্য সে কাহিনীতে নূতনত্ব কিছু ছিল না, আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে সে-সব গল্প যুদ্ধের দৌলতে প্রায়শই শোনা যায়, তেমনি এক কাহিনী শোনালেন বোমানজি। কিন্তু গোল বাঁধল যখন জানা গেল যে এই গল্পের নায়িকা আর আমাদের গাইড একই ব্যক্তি। পিয়ার্সন তো রেগেই আগুন। সোজা গিয়ে মহিলাকে বেশ স্পষ্টাস্পষ্টি দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। বাবার উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম— তিনি বললেন, সমস্ত কার্যসূচি বদলে পরের দিন সকালবেলাই প্যারিস যাত্রার ব্যবস্থা করা হোক। বাবার মতের এই দ্রুত পরিবর্তন অনেক আগের থেকেই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘণ্টাকয়েক আগে যে কেরানির কাছ থেকে টিকিট কেটেছি, আবার তার কাছে গিয়েই হাত পাততে হল টিকিটের টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্যে। টিকিটের পুরো দামই সে ফেরত দিল বটে, কিন্তু টমাস কুকের প্রতিষ্ঠানে নির্ভরযোগ্য খদ্দের হিসেবে আমার যে খ্যাতি হয়েছিল তা অনেকখানি খর্ব হল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা পৌঁছলাম প্যারিসে। দু-চারদিন বাদে বের্গেনের খবরের কাগজ থেকে এক গাদা কর্তিকা আমার হাতে এল। আমি সেগুলি সযত্নে রক্ষা করেছিলাম। একেবারে প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে আমাদের বের্গেন পৌঁছবার খবর বেরিয়েছে— এমন-কি, জাহাজ থেকে বাবা সদলবলে নামছেন তার ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়েছে! আধুনিক খবর-কাগজের কী আশ্চর্য কেরামতি! মহিলাটি এই-সব কর্তিকা আমার নামে পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে নিশ্চয় প্রচুর হেসেছিলেন।

প্যারিসের দিনপঞ্জি

৭ অগস্ট ১৯২০

শনিবার সন্ধ্যাবেলা। ওয়াই. এম. সি. এ.-র চাটুজ্জে আমাদের নিয়ে গেলেন গ্র্যাণ্ড অপেরার 'ফাউস্ট' অভিনয় দেখতে। এই অপেরা বাবার খুব ভালো লেগেছে। এমন চমৎকার অপেরা আমরা বিলেতে কিংবা আমেরিকায় কখনো দেখি নি। নাটক উঁচুদরের কিছু না হলে বাবার ঠিক মন ভরে না। 'ফাউস্ট' বাবার ভালো লেগেছে দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। এই তো সেদিন লণ্ডনে 'বেগার্স অপেরা' দেখবার জন্য বাবাকে নিয়ে গিয়ে কী ঝকমারিই না হল! বেশ খুঁতখুঁতে রুচিবাগীশদের মুখেও যাকে বলে ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল। তাই শচীন সেন যখন আমাদের কোনো-একটা থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমরাই বললাম 'বেগার্স অপেরা' দেখতে যাওয়া যাক। বাবা তো রীতিমতো আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু শুরুতেই বোঝা গেল হতাশ হতে হবে। অপেরার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনের কলাকৌশল, গীতবাদ্য, অভিনয়— সবই যেন চক্ষুকর্ণের পীড়াদায়ক বলে মনে হল। কোথায় এর মধ্যে হাস্যরস, কোথায় সাহিত্যিক উৎকর্ষ, কোথায় বা শিল্প-চাতুরী। দ্বিতীয় দৃশ্যের পরেই বাবা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পিয়ার্সনের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন। পাছে শচীন মনে ব্যথা পায়, আমরা শেষ পর্যন্ত বসে রইলাম। যদিও সে বেচারার করণীয় কিছু ছিল না— 'বেগার্স অপেরা'য় যাবার প্রস্তাব আমরাই করেছিলাম। শেষ দৃশ্যটা একেবারে অসহ্য মনে হল, বাবা থাকলে বোধ করি খেপে যেতেন। ইংরেজি সাহিত্যের পড়তি অবস্থায় রচিত এই বস্তাপচা জিনিস এ যুগে চালিয়ে দেবার চেষ্টার অর্থ আমাদের কাছে ঠিক বোধগম্য হল না। আর এই নিয়ে কিনা কত লোকের কী উচ্ছ্বাস! আসলে মহাযুদ্ধের পর বিলেতে একটা প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমান দেখা গিয়েছিল— এ তারই প্রকাশ। অপেরা, থিয়েটার, সংগীত, বাদ্য— সব কিছুতে বিদেশীয় প্রভাব ও প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়াতে তাদের কেমন যেন মাথা হেঁট হবার উপক্রম হত। সেইজন্যেই খাস ইংলণ্ডে প্রস্তুত এই খাঁটি দিশি অপেরা কেবল বাহবা ও হাততালির জোরে চালাবার একটা দারুণ চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

প্যারিস

৮ অগস্ট ১৯২০

রবিবার সকালবেলা সুধীর রুদ্রকে পথপ্রদর্শক করে আমরা ট্যাক্সিযোগে ৯ নম্বর কে দ্যু কাৎর্ সেপ্‌তাঁব্‌র্‌ বুলোঁ স্যুর সেইন্‌-এ অবস্থিত ওতুর্‌ দ্যু মঁদ্‌-এর অতিথিভবনে চলে গেলাম। জায়গাটা প্যারিসের উপকণ্ঠে, বোয়া দ্য বুলোঁ পেরিয়ে। চেঁচামেচি ও অন্ধকার ঘরগুলোর পরে এই বাড়ি আর তার আশে-পাশের দৃশ্য আমাদের খুবই মনোরম মনে হল। বাবা বললেন, দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম তিনি যেন আপনার ঘরে এসে পা দিলেন। ওতুর্‌ দ্যু মঁদ্‌-এর সেক্রেটারি মঁসিয়্য গার্নিয়ে সেখানে ছিলেন না, কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। লোরেন্স নামে যে লোকটিকে আমাদের দেখাশুনো ও তদ্‌বির করার জন্য রেখে গিয়েছিলেন. সে দস্তুরমতো ভদ্রলোক। তার পরিচর্যায় আমরা বিশেষ খুশি হলাম। ওতুর্‌ দ্যু মঁদ্‌-এর সদস্যদের ব্যবহারের জন্য এ বাড়ি এখানকার গৃহকর্তা মঁসিয়্য কান্‌ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে বসবাস করেন পাশের বাড়িতে। বিশিষ্ট বিদেশী অতিথি ও কান্‌-কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তিভোগী পণ্ডিতদের জন্য তিনতলার দুটি কামরা নির্দিষ্ট। দোতলায় সুন্দর একটি লাইব্রেরি— নানাবিধ ভ্রমণ-কাহিনী ও বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তথ্য-সংবলিত বইয়ে ঠাসা। সেক্রেটারিও থাকেন দোতলার একটি কামরায়। নীচের তলায় বসবার আর খাবার ঘর। পিছনে ঢাকা বারান্দা চলে গেছে বাগান অবধি। আর কী সুন্দর বাগান! বাগানটি মঁসিয়্য কান্‌-এর বাড়ির সংলগ্ন। রবিবার দিন সদস্যেরা বাগানে বেড়াতে পারেন— আমাদের জন্য অবশ্য সর্বক্ষণই তা খোলা। বাঁকাচোরা গলি অতিক্রম করে যে জায়গায় এসে পড়া গেল তা অবিকল পিরেনীজ অঞ্চলের পার্বত্য দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃত্রিম উপায়ে চড়াই-উতরাইয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পাহাড় পর্বত মালভূমির কথা মনে পড়ে যায়। পাহাড়ে পাইন গাছের ঘন জঙ্গল, জমির উপর ইতস্তত মস্ত সব পাথর ছড়ানো। শুনেছি এই অংশের গাছ ও পাথর নাকি সত্যি সত্যি পিরেনীজ অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়েছে। একধারে জঙ্গলের সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীচে সমতল মালভূমি, মাঝখানে তার ছোট্ট একটি পদ্মদিঘি। হঠাৎ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। জঙ্গল পেরিয়ে সমতলভূমিতে পা দিয়ে দেখা গেল অবিকল ফরাসি ধাঁচে সাজানো ফুলের

বাগিচা আর ফলের বাগান। ফলগাছগুলি অদ্ভুত, নানান কায়দায় বেঁকিয়ে চুরিয়ে তাদের নানা রকম আকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব ডালেই ঝুলে আছে লোভনীয় সমস্ত ফল। বাগানের মাঝখানে সুন্দর একটি কাচের ঘর। একটু দূরেই পুকুর— তার পারে মস্ত মস্ত পাথর আর গুহা। অনতিদূরে আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার— মঙ্গোলীয় ধাঁচের তোরণদ্বার পেরিয়ে একটি জাপানি ধরনের বাগান। এখানে জাপান থেকে আনা চা-ঘর এবং মন্দির ও প্যাগোডা ইতস্তত ছড়ানো। গাছগুলি সবই বেঁটেখাটো, বাঁকাচোরা ডাল নানান আকারের। জাপান থেকে আমদানি করা চিনেমাটির পাত্রে রক্ষিত কয়েকটা গাছ আছে, যার বয়স কম করেও একশো বছর হবে। চার বছর অবিরাম পরিশ্রম করে দুজন জাপানি ওস্তাদ মালি এই বাগান সাজিয়েছে। এমন নিখুঁত ভাবে তারা তাদের কাজ করেছে যে জাপানেও এই রকম সুন্দর একটি বাগান সমাদৃত হত সন্দেহ নেই। ওতুর্ দ্যু মঁদ্ সমিতির ঘরবাড়ি ও বাড়ির সংলগ্ন বাগান— দর্শকদের চোখে তাক লাগাবার মতো। কিন্তু ততোধিক আশ্চর্য হলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকারী মঁসিয়্য কান্। ইনি একজন ধনকুবের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী, আর্থিক জগতে এঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক। কিন্তু জীবনযাত্রা নিতান্ত শাদাসিধে— মদমাংসটুকুও স্পর্শ করেন না। টাকা যা উপার্জন করেন তার বেশির ভাগ খরচ হয় জনহিতব্রতে। বিদ্যা অনুশীলনের জন্য এঁর দেওয়া বৃত্তির টাকা সারা পৃথিবীতে ছড়ানো। প্রতি বছর এই বৃত্তির টাকায় বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বময় ঘুরে ঘুরে নানা দেশের ধর্ম- অর্থ- ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন এবং তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। পণ্ডিতবৃন্দ ছাড়া আরো একদল লোক আছেন যাঁরা ক্যামেরা হাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র কিংবা রঙিন ছবি তোলেন। এঁদের বিষয় হল বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার প্রণালী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন ও সাম্প্রতিক কালের স্থাপত্য নিয়ে চর্চা করা। মঁসিয়্য কান্-এর ধারণা, এই-সমস্ত তথ্য ও চিত্র একত্র হলে, সংগৃহীত মালমশলা দেখে বোঝা যাবে, মানুষ কোন্ পথে চলেছে এবং সে পথের শেষ লক্ষ্যস্থল কী। এটা যে কী করে সম্ভবপর হবে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু মানুষটি যে খাঁটি আদর্শবাদী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয় চোখে-দেখার অতীত কিছু একটা ইনি দেখে থাকবেন। আপাতত ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছেন, যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো হলে পরে

একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছবেন। নিজের দেশের সম্বন্ধে এঁর আশা ও উৎসাহের অন্ত নেই। এঁর ধারণা, পরস্পরবিরোধী নানা রকম মতবাদের সমন্বয় ঘটাতে পারে, এরকম দেশ পৃথিবীতে একটি মাত্র আছে এবং সে হল ফ্রান্স। প্যারিসের প্রলোভনের অন্ত নেই। বিধিনিষেধের বালাই নেই বলে এখানকার জীবন সরল, স্বাধীন। যাঁরা এই-সব সত্ত্বেও প্রলোভনের উপরে উঠতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত বীর— অন্ততপক্ষে মঁসিয়্য কান্-এর তা-ই ধারণা। মঁসিয়্য ইংরেজি বলতে পারেন, কিন্তু কথা বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে লাগসই কথাটা ঠিক যেন মুখে আসে না। ভাব রয়েছে মনে অথচ মুখে ভাষা জোগাচ্ছে না— এরকম অবস্থায় তিনি এমন বিচলিত হয়ে পড়েন যে ভঙ্গি দিয়ে বক্তব্য তাঁর বুঝিয়ে দিতে হয়। একদিন বিকেলবেলা তিনি ঠিক করলেন বাবাকে তাঁর জীবেনের গোপনতম কথাটি বলবেন। ইতিপূর্বে নাকি বের্গসঁ ছাড়া আর-কাউকে এ-কথাটা তিনি ব্যক্ত করেন নি। কথাটা হল এই : এক নিষ্ঠাবান ইহুদি পরিবারে তিনি জন্মেছেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন ধর্মগুরু। বাস্তবিকপক্ষে 'কান্' নামটাই নাকি ইহুদি ধর্মগুরুদের নাম। প্যারিসে নিজের ভাগ্য অন্বেষণে যখন এলেন তখন ধর্মে, আচরণে তিনি পুরোপুরি ইহুদি। তার পর নিজের চেষ্টায় যেমন অর্থ অর্জন করলেন, তেমনি নিজের ধর্মও নিজের মতো করে গড়ে নিলেন। জীবনে যা-কিছুকে ইতিপূর্বে তিনি অন্ধবিশ্বাসে মূল্য দিয়ে এসেছেন, সব একে একে যুক্তির মানদণ্ডে পরিমাপ করে দেখলেন। দেখা গেল এ-সবের মধ্যে অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য, সুতরাং বর্জনীয়। একে একে অনেক কিছু বাতিল হল। তৎসত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন রয়ে গেল, যুক্তিতর্ক দিয়ে যার সমাধান হল না, দ্বিধা রয়ে গেল মনের মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ঘটনার কথা বললেন মঁসিয়্য কান্। একদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ ফ্রান্সের মেঁতন শহরে তাঁর ভিলার বাগানে তিনি একা একা পায়চারি করছেন, সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা হয় না— অফুরন্ত তার সৌন্দর্য। হঠাৎ যেন আপনা থেকে তাঁর জানু নত হয়ে এল, তিনি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবনের চরম সত্য কী? হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে যেন যবনিকা সরে গেল, তিনি যেন সেই চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন। কী যে তিনি দেখেছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, যা অনুভবমাত্র করা যায় প্রকাশ করে বলা চলে না।

কার্পলেস্‌ ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। আঁদ্রে আসেন বাবার ছবি আঁকতে। ছোটো বোন সুজান সিলভ্যাঁ লেভির ছাত্রী, পাণ্ডিত্যের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দিয়েছে। সুজান আসতেন বাবার নূতন-লেখা কবিতা ফরাসিতে অনুবাদ করতে। বাবা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন, সুজান তা নোটবইয়ে টুকে নিয়ে যান, পরে নিজের ভাষা ফরাসিতে অনুবাদ করেন। কাছেই ওতই অঞ্চলে যে ফ্ল্যাটে ওঁরা থাকেন, ভারত থেকে সংগৃহীত নানা রকম প্রাচীন ও মূল্যবান শিল্পসামগ্রীতে তা একেবারে ঠাসা। ওদেব বাড়িতেই আলাপ হল মঁসিয়্য গোলুবিউ, অধ্যাপক ফিনো এবং হার্ভার্ড-এর অধ্যাপক জেম্‌স্‌ উড্‌স্‌ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। এই নভেম্বর মাসে গোলুবিউ ও ফিনো যাচ্ছেন ইন্দোচীনে, কাম্বোডিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে যোগ দিতে। তাঁদের বললাম যে ভারতে ফেরবার পথে আমরাও হয়তো কাম্বোডিয়া ঘুরে যেতে পারি। গোলুবিউ এক-দিন বিকেলের দিকে আমাদের 'ম্যুজে গিমে' নামক সংগ্রহশালাটি দেখে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তদনুসারে গত শনিবার ১৪ অগস্ট আমরা উক্ত সংগ্রহ-শালা দেখে এলাম। তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ থেকে তিনি কিছু কিছু ভারতীয় মূর্তি ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন কাচের স্লাইড-যোগে আমাদের দেখালেন। বললেন, আগামী মঙ্গলবার যদি আমি আবার তাঁর কাছে যাই তো তিনি আমার পছন্দমতো কিছু স্লাইড ও আলোকচিত্র আমাদের আশ্রম-বিদ্যালয়ের জন্য দান করবেন।

সিলভ্যাঁ লেভি হপ্তায় দু-দিন বাবার কাছে এসে বসেন। চমৎকার মানুষ— যেমন সহজ সরল, তেমনি সহৃদয়। ছাত্রেরা সবাই তাঁকে খুব ভক্তি করে। লেভি প্রস্তাব করলেন, অক্টোবরে বাবা আবার যখন ফ্রান্সে ফিরবেন তখন যেন তিনি সর্‌বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। লেভি, কান্‌ ও আরো অনেককে বাবা বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যাতে চিন্তার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির একমাত্র বাহন হল ইংরেজি সাহিত্য— ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ঠিকমতো পরিচয় এখনো ঘটে নি। ইয়োরোপের সভ্যতাও বর্তমানে একদেশদর্শী হয়ে পড়ছে, কারণ প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাযোগ নিতান্তই ক্ষীণ। এদিকে খ্রীস্টীয় আদর্শের থেকে বিচ্যুত হবার ফলে ইয়োরোপীয় সভ্যতায়

ভারসাম্যের অভাব দেখা যাচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রাচ্যদেশের ধর্ম ও আদর্শবাদের সঙ্গে যদি ইয়োরোপের পরিচয় না ঘটে তা হলে তার ফল মোটেই শুভ হবে না। বাবা বললেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে বিদ্বজ্জন-বিনিময় হলে এর একটা সমাধান হতে পারে।

ওতুর্ দ্যু মঁদ্-এ এসে পৌছনোর দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক ল্য ক্রঁ এলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। ইনি বাবার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত, বাবার সব লেখা ইনি পড়েছেন। 'দি গার্ডনার' বইখানি ইনি ফরাসি ভাষায় ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছেন— আরো কিছু অনুবাদ করার জন্য এঁর বিশেষ আগ্রহ। সেদিন তিনি এসেছিলেন তাঁর তরুণী ভার্যাকে নিয়ে। শোনা গেল এঁদের মিলন হয় বেশ রোম্যান্টিক পরিবেশে— আর তাতে নাকি অনেকখানি হাত ছিল বাবার কবিতার। উভয়েই বাবার কবিতার প্রতি অনুরাগবশত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঠিক এই রকমটি ঘটেছিল অধ্যাপক ফুশে-র ক্ষেত্রে। মাদাম ফুশে বাবার কবিতা নিয়ে থীসিস্ রচনা করেছিলেন। অধ্যাপক ফুশে ভারত সম্পর্কে আগ্রহশীল জেনে তাকে দেখাতে গিয়েছিলেন তাঁর থীসিস্। আর সেই যোগাযোগের ফলেই, অনিবার্যভাবে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা।

বাবা তাঁর রচনা অনুবাদের জন্য ভালো ফরাসি লেখকের সন্ধান করছেন। যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর অনেক লেখা এখনো ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয় নি। সবাই বললেন যে প্রকাশক হিসেবে ন্যুভেল্ রেভ্যু ফ্রাঁসে-র সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই সমীচীন হবে, কারণ 'গীতাঞ্জলি' ও 'দি গার্ডনার' গ্রন্থের ফরাসি অনুবাদ এঁরাই বের করেছেন।

ইয়োরোপের অন্যত্র

ওতুর্ দ্যা মঁদ্-এ মঁসিয়্য কান্-এর অতিথি হয়ে আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম। কান্-এর আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত, এমন দিন ছিল না যেদিন মধ্যাহ্ন- কিংবা সান্ধ্যভোজে কোনো খ্যাতনামা লেখক কিংবা শিল্পীর সঙ্গে দেখা না হত। আঁরি বের্গসঁ-র সঙ্গে বাবার একাধিকবার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এই রকম একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ সুধীর রুদ্র মহাশয় সমসাময়িক 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সুধীর রুদ্র সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরে শুনেছি, এরকম ঘরোয়া আলাপ তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে বের্গসঁ একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। ফরাসিরা ইংরেজি বড়ো একটা বলতেন না। সে দিক থেকে বের্গসঁর সঙ্গে আলাপ করে বাবা বেশ তৃপ্তি পেতেন। বের্গসঁ ইংরেজি বলতেন প্রায় তাঁর মাতৃভাষার মতো— আর তা না পারবেনই বা কেন, বের্গসঁর মা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডদেশীয়া। তবে তাঁর ইংরেজিতে একটা স্কচ টান এসে পড়ত— এই পর্যন্ত।

কঁতেস দ্য ব্রিমঁ ছিলেন ফ্রান্সের এক নামকরা মহিলা কবি। তিনি প্রায়ই আসতেন বাবার মুখে তাঁর বাংলা কবিতার সদ্য-রচিত ইংরেজি অনুবাদ শুনতে। কখনো কখনো তাঁর শখ হত মূল বাংলায় আবৃত্তি শুনতে। বাবার কিছু লেখা ফরাসিতে অনুবাদ করার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি বাবার মুখে বাংলা আবৃত্তি শুনে মূল কবিতার ভাবরূপের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইতেন। এঁর চেয়েও নামজাদা আর-একজন মহিলা কবি যিনি আসতেন— তাঁর নাম কঁতেস দ্য নোয়াই। মঁসিয়্য কান্ এঁর বিশেষ অনুরাগী। কান্-ই একদিন এঁকে নিয়ে এলেন বাবার কাছে। এঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের দীপ্তি যেন এক মুহূর্তেই আমাদের মোহিত করে ফেলল। প্রাণের উচ্ছলতায়, ভাবপ্রকাশের অকুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এবং খেয়ালখুশিতে ইনি নিখুঁত ফরাসি— যৌবনে ইনি নিশ্চয় অনেক পুরুষের মনোহরণ করে থাকবেন। বিদায় নেবার আগে কঁতেস বাবাকে বলে গেলেন তিনি এসেছিলেন প্রাচ্য কবির হৃদয় জয় করে নিতে, কিন্তু বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপে তাঁর সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন শ্রদ্ধাশীল ভক্তের হৃদয় নিয়ে।

কয়েক বছর আগে কার্পেলেস্ ভগ্নীদ্বয় যখন ভারতে এসেছিলেন তখনই তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপের সূচনা হয়। বড়ো বোন আঁদ্রে ছবি এঁকে প্যারিসের সমঝদার মহলে ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছেন। ছোটো সুজান সংস্কৃতের ছাত্রী। বাবার প্রতি এঁদের ভক্তিশ্রদ্ধার তুলনা হয় না। ফ্রান্সে আমরা যতদিন ছিলাম এঁরা সব সময় আমাদের কাছাকাছি ছিলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আঁদ্রের সখ্য ছিল নিবিড়। আমরণ (১৯৫৬-র নভেম্বরে আঁদ্রের মৃত্যু হয়) আঁদ্রের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। প্যারিসের শিল্পী- ও বিদ্বৎ-সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ ঘটেছিল কেবলমাত্র আঁদ্রের মধ্যস্থতায়। রাজনীতি ও আর্থিক ক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি বিপর্যয়ের ফলে প্যারিসের জীবনে সম্প্রতি অনেক অদলবদল ঘটে গেছে। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন প্যারিসের চেহার ছিল অন্য রকম। প্যারিসকে বলা যেতে পারে তৎকালীন ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এখানকার আবহাওয়ায় যেন ওতপ্রোত হয়ে ছিল চিন্তা ও শিল্পের জগতে দুঃসাহসিক অভিযানের অক্লান্ত প্রয়াস। ছিল জীবনের রস নিঃশেষে সম্ভোগ করার জন্য আকুল আগ্রহ। এই বহুবিচিত্র ঐশ্বর্যময় প্যারিসীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন আঁদ্রে। চিত্রকলার জগতে এই সময় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট সম্প্রদায়। সেজান্, মানে, রেনোয়া, গোগ্যাঁ, ভ্যান গগ্, রদ্যাঁ প্রভৃতির কাজ নিয়ে তখন প্যারিসের সর্বত্র আলোচনা চলছে— মতদ্বৈধের ঝড় বয়ে যাচ্ছে রাজধানীর সর্বত্র। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তখন যে-সব প্রদর্শনী হত—এই-সব শিল্পীর কাজ তখনো সে-সব প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার লাভ করে নি। এই নতুন গোষ্ঠীর কিছু কাজ দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, আঁদ্রে একদিন প্লাস্ দ্য মাদলেইন-এর এক ছবির দোকানে আমাদের নিয়ে গেলেন। বোধ করি সেই প্রথম ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট গোষ্ঠীর অনেকগুলি ছবি একত্র করে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই-সব ছবি দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম আমরা। আমার নিজের বিশেষ ভালো লাগল ভ্যান গগ্-এর ছবি। এই পাগল শিল্পীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আজও অটুট রয়ে গেছে।

বাবাকে তখন খুব আদর-যত্ন করে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন। হাল্ ও জার্দ্যাঁ দে প্লাঁত্-এর কাছে

তাঁরা যে ফ্ল্যাটে থাকেন, তার পরিবেশ একটুও মনোরম ছিল না। কিন্তু ঘরে একবার ঢুকলে পর বাইরের জগৎটা একেবারে যেন আড়ালে পড়ে যেত। সেখানকার অন্তরঙ্গ পরিবেশে আর মাদাম লেভির মাতৃসুলভ সেবাযত্নে দু-দিনেই তাঁদের সেই ফ্ল্যাট যেন আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে উঠল। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ রূপে অধ্যাপক লেভির তখন ইয়োরোপে বিশেষ খাতির। মহাপণ্ডিত হলে কী হয়, সামাজিক মেলামেশায়, হাসিঠাট্টায় তাঁর তুলনা মেলা ভার। ছাত্রেরা তাঁকে গুরুর মতো পুজো করত। গুরু-শিষ্যের সেই মধুর সম্পর্ক ভারতের তপোবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই মেলামেশার সূত্রেই বাবা অধ্যাপক লেভিকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। স্থির হল প্রথম বিদেশী অধ্যাপক হিসেবে লেভি শান্তিনিকেতনে আসবেন।

ফরাসী সাহিত্যের যে দু-জন মহারথীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য বাবা বিশেষ উৎসুক ছিলেন তাঁরা হলেন আঁদ্রে জীদ্ ও রম্যাঁ রলাঁ। কয়েক বছর আগেই জীদ্ ফরাসি ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছেন— কিন্তু তা হলে কী হয়, তাঁর সঙ্গে তখনো বাবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নি। রলাঁর বই পড়ে বাবার মনে হয়েছিল, লোকটি তাঁর সমগোত্রীয় হবেন, অথচ রলাঁর সঙ্গেও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নি। আশ্চর্যের কথা বলতে হবে, বাবা যখনই রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আমাদের ফরাসি বন্ধুরা এমন ভাব করতেন যেন কথাটা তাঁরা ঠিক শুনতে পান নি। আসলে পরাজিত জর্মানির প্রতি রলাঁ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখিয়েছেন বলে ফ্রান্সে তিনি ত্যাজ্য ও অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়েছেন। ফলে যদিও আমরা নিশ্চিত জানতাম রলাঁ তখনই প্যারিসেই আছেন— কেউ আমাদের তাঁর খোঁজখবর দেয় নি। বহু চেষ্টার পরে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাটের ওপর ফ্ল্যাট সাজানো একটা মস্ত বাড়ির একেবারে উপরতলায় রলাঁ বাসা নিয়েছেন। অপ্রশস্ত সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে, তবে সেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌছানো গেল। ইতিপূর্বে আমি রলাঁকে কখনো দেখি নি, তাঁর ছবিও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। কড়া নাড়তে রোগা ইস্কুল মাস্টারের মতো চেহারার আধবয়সী একজন লোক দরজা খুলে দিল। দেখে বুঝতেই পারি নি যে ইনিই স্বয়ং রলাঁ। রলাঁর নাম শুনে ও তাঁর লেখা পড়ে আমার কল্পনায় তাঁর

যে ছবিটি ছিল, তার সঙ্গে বাস্তবের সামান্যই মিল। দেখা তো হল, কিন্তু মুখে কি ছাই কথা আসে? বেশ বুঝলাম রলাঁ ইংরেজি একবর্ণও বলতে পারবেন না— ফরাসি ভাষায় আমার জ্ঞানও তথৈবচ। সুতরাং কাজের কথা কিছু সম্ভব নয় জেনে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করতে হল। বেশ কয়েক বছর পরে রলাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ ভালো করেই জমেছিল— তখন তিনি প্যারিসের পাট চুকিয়ে দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করছেন।

আঁদ্রে জীদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপারটা আরো চমৎকার। একদিন প্রতিমা ও আঁদ্রের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি। ওতই-এর পিছনে বোয়া দ্য বুলোঁর প্রান্তে আধুনিক ধাঁচের একটা অদ্ভুত বাড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাদের বান্ধবী বললেন, জীদ্ ওই বাড়িতে থাকেন। সেইসঙ্গে এ কথাও বললেন যে, জীদ্ খুব খামখেয়ালি ধরনের মানুষ এবং বাড়িতে অতিথিসমাগম একেবারেই পছন্দ করেন না। আমরা ঠিক করলাম একবার চেষ্টা করে দেখব। দরজার কড়া নাড়লাম, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। আমরা ফিরে আসছি, এমন সময় ঢিলে ড্রেসিং গাউন্ পরা একটি মূর্তি ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়ে, দরজা হাট করে খুলে দিয়েই অদৃশ্য! আমরা হতভম্ব হয়ে দেখলাম পলায়মান মূর্তিটি এক-এক লাফে দু-দুটো সিঁড়ি অতিক্রম করে বাড়ির রহস্যময় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আঁদ্রে জানালেন জীদ্ মানুষটি অতিরিক্ত লাজুক বলেই তাঁর এরকম অদ্ভুত ব্যবহার।

আর-একজন স্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এই প্যারিস শহরে, তিনি হলেন সেনিওরা ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো। অবশ্য এই সাক্ষাৎকার ১৯২০ সালে হয় নি, হয়েছিল আরো ছ-বছর পরে। কবি, লেখিকা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশ আর্জেন্টিনায় সুপরিচিত ছিলেন। সুদূর প্যারিসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তিনি প্রায়ই প্যারিসে বেড়াতে আসতেন। তাঁর অভিজাত আচারব্যবহার এবং তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য অনেকেই আকৃষ্ট হতেন। তিনি যখন আসতেন, লৌকিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সোজা চলে যেতেন বাবার কাছে। বাবার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর— এত স্নেহ করতেন যে বাবার তুচ্ছতম খেয়ালটুকু মেটাবার জন্য হেন কাজ ছিল না যা তিনি করতে না পারতেন। তাঁর রাজোচিত স্বভাবের জন্য মাঝে মাঝে জটিল সমস্যাও দেখা দিত। ১৯২৪-এ পেরু কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বাবা যখন পেরুর

স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন, তখন সেনিওরা ওকাম্পোর নির্বন্ধাতিশয়ে পেরু-ভ্রমণ বাতিল করে দিতে হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল অসুস্থ শরীরে আন্দিস পর্বত পেরিয়ে পেরু-অভিযানের কষ্ট বাবার সহ্য হবে না। তার বিধানমতো বাবাকে আশ্রয় নিতে হল বুয়েনোস এয়ারেসের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেনিওয়ার পল্লীনিবাসে। পরে অবশ্য জানা গেল, বাবার অসুস্থতা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিন্তু তা হলে কী হয়, পেরুর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার দরুন আর্জেণ্টিনা ও পেরুতে সে-যাত্রা দস্তুরমতো রাজনৈতিক মন-কষাকষি ঘটেছিল। বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে রোজ যে চেয়ারে বসতেন সেটি তাঁর বেশ প্রিয় হয়ে উঠল। ইয়োরোপে বাবার ফেরার সময় আসন্ন; দু-চার দিনের মধ্যে জাহাজ বুয়েনোস এয়ারেস বন্দর ছাড়বে। সেনিওরা স্থির করলেন বাবার জন্য জাহাজের যে-দুটি ক্যাবিন নির্দিষ্ট হয়েছে সে-দুটি তিনি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবেন। সে তো না হয় হল, কিন্তু তিনি যখন বললেন বাবার সেই প্রিয় চেয়ারটি সঙ্গে যাবে, জাহাজ কোম্পানির কর্তারা বেঁকে বসল, কারণ ক্যাবিনের দরজা দিয়ে সে চেয়ার ঢোকানো অসম্ভব। সেনিওরা জানতেন কী করে মানুষকে বশে এনে আজ্ঞাবহ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত কবজা খুলিয়ে ক্যাবিনের দরজা সরিয়ে, চেয়ারটিকে যথাস্থানে বসিয়ে তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন। সে চেয়ারটি বাবার প্রতি 'বিজয়া'র (সেনিওরা ভিক্তোরিয়াকে বাবা এই নামে ডাকতেন) প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এখনো শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে।

১৯৩০-এ বাবা আবার যখন প্যারিস যান, সঙ্গে ছিল তাঁর আঁকা কিছু ছবি। ছবি দেখে কয়েকজন ফরাসি শিল্পী বাবাকে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, চট করে প্যারিস শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব বললেই হয়। মোটামুটি পছন্দসই একটা হল্ পেতে হলে বছরখানেক আগের থেকে চেষ্টাচরিত্র করতে হয়। বাবা সেনিওরা ওকাম্পোকে তারযোগে অনুরোধ জানালেন তিনি এসে যেন বাবার সহায় হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে এলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হল যেন বিনা আয়াসেই প্রদর্শনীর সবরকম ব্যবস্থা তাঁর সাহায্যে হয়ে গেল। 'তেআত্র পিগাল' গ্যালারিটি পাওয়া গেল, যথাসময়ে কাগজে কাগজে প্রদর্শনী বিষয়ে প্রচার শুরু হল। অল্প কয়েকদিন পরেই বাবার জন্মদিনের কাছাকাছি একটা দিনে প্রদর্শনী

খোলা হল। আমাদের ফরাসি বন্ধুরা প্রথম প্রথম তো বিশ্বাসই করতে চান নি যে এত অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় প্যারিস শহরে এরকম একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।

আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফ্রান্স থেকে সরাসরি জর্মানি যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। আমরা গিয়েছিলাম হল্যাণ্ড হয়ে। ডাচ ভাষায় বাবার বইয়ের অনুবাদক ডক্টর ফ্রেডেরিক ভ্যান এডেন-এর সঙ্গে দেখা হল হল্যাণ্ডে। ভ্যান এডেন ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু মহাযুদ্ধের অমানুষিক বর্বরতা দেখে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস টলে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল, তিনি একটা আশ্রম-গোছের প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে ব্যস্ত। তাঁর ইচ্ছা, সে আশ্রমে যাঁরা বসবাস করতে আসবেন তাঁরা মহৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবেন, কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা হবে সরল ও অনাডম্বর। কার্যত দেখা গেল, উচ্চমার্গের চিন্তার অজুহাতে লোকেরা আরামে থাকাটাই পছন্দ করছে। বলাই বাহুল্য, অনুরূপ অন্যান্য অনেক আদর্শবাদী সাধু সংকল্পের মতো ভ্যান এডেনের আশ্রমও রূঢ় স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতে ভেঙে গিয়েছিল।

বাবা জর্মানিতে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ডার্মস্টাটে আমরা যে-একটা সপ্তাহ ছিলাম। ডার্মস্টাটে আমরা ছিলাম হেস্‌সে-র গ্র্যাণ্ড ডিউকের অতিথি হয়ে। কাইজার ও মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আত্মীয়তার জন্যই যে গ্র্যাণ্ড ডিউক সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন— এ অনুমান ঠিক নয়। সাধারণ লোকের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন তাদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার দ্বারা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে। বিপ্লবের পরেও তাঁর জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। ডিউক আমাদের একটা মজার গল্প বলেছিলেন: যেদিন বিপ্লবের শুরু, বিপ্লবীদের মস্ত একটা দল এসে তাঁর প্রাসাদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচুর হল্লা শুরু করে দিল। কী ব্যাপার? বিপ্লবীরা নাকি তাঁর প্রাসাদ দখল করে নিতে চায়। তাই নাকি? তা বেশ তো। তিনি প্রাসাদের গেট উন্মুক্ত করে দিয়ে সবাইকে ডেকে বললেন, খাও দাও, ফুর্তি করো। ডিউকের ক্ষৌরকার ছিল দলের পাণ্ডা। তার নেতৃত্বে সমস্ত দল গিয়ে ঢুকল মদের

ভাঁড়ারে। প্রচুর মদ্য পান করার পর ডিউকের অনুমতিক্রমে তাঁর যতগুলো মোটরগাড়ি ছিল সব বের করে আনল। তার পর মোটরে চড়ে শহরময় পাগলের মতো টহল দিয়ে বেড়াল। সন্ধ্যাবেলা সব উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল— ডিউককে আর তাঁর প্রাসাদ ছাড়তে হল না।

ডার্মস্টাটে আমাদের সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে বাবার কোনো ধরাবাঁধা দৈনন্দিন কার্যসূচি ছিল না। না ছিল সংবর্ধনা, না সভা-সমিতি। সে-কয়দিন প্রাসাদের বাগান খুলে দেওয়া হয়েছিল সর্বসাধারণের জন্য। সকালে কিংবা বিকালে, যখনই বেশ কিছু লোক জমায়েত হত, বাবা বাগানে নেমে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। ডার্মস্টাটে বাবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন কাউন্ট হেরমান কাইজারলিং। তিনিই এই-সব উদ্যানসভায় বাবার দোভাষীর কাজ করতেন। এ কাজে তাঁর পটুতা ছিল অসাধারণ, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্বকথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেও বাবা ক্লান্তি বোধ করতেন না। মাঝে মাঝে সমবেত লোকেদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নানা প্রশ্ন তুলত, বাবাও সাধ্যমতো সেই-সব বিষয়ে তাঁর মতামত বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন। দুঃখ হয়, এই-সব কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার হুবহু বিবরণ রাখা হয় নি। সেরকম একটা অনুলিখন থাকলে যুদ্ধোত্তর জর্মানির নানা সমস্যার বিষয়ে সাধারণ জর্মানদের মতামত যেমন জানা যেত, তেমনি জীবন- ও দর্শন-বিষয়ক অনেক প্রসঙ্গে বাবার মত ও চিন্তা সকলের গোচর হত।

গ্র্যাণ্ড ডিউকের প্রাসাদে কাইজার-পরিবারের বেশ কয়েকজন সে-সময় বসবাস করছেন। কাইজারের ছেলেদের মধ্যে সবাই সেখানে ছিলেন এক যুবরাজ ছাড়া। একদিন কাইজারের মেজো ছেলে আমায় ধরলেন, বাবার কাছে তিনি যাবেন ও একান্তে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। বাবার কাছে গিয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন এবং ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। কঠোরহৃদয় একজন জর্মান যে ভাবাবেগে এমন অভিভূত হতে পারেন, এ আমার ধারণার অতীত ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি বাবাকে একটি বিশেষ ডিজাইনের ফুলদানি উপহার দিলেন— বললেন ফুলদানিটি ওঁর অন্তরাশ্রিত ভাবের দ্যোতক। আমার লাভ হল একটা সিগারেট-কেস— তার উপরে হোহেন্‌ৎসোলের্ন রাজবংশের প্রতীকচিহ্ন খোদাই করা।

রবিবার দিন ডিউক ও কাউণ্ট কাইজারলিং আমাদের নিয়ে মোটরে করে বেড়াতে বেরোলেন। মোটর গিয়ে থামল একটা পার্কের সামনে। ছুটির দিনে সেখানে বিস্তর লোক জমায়েত হয়েছে। আমরাও তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। একটা ছোটো টিলার উপরে পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসবার জায়গা হল। খানিক বাদেই সেই টিলার নিচেকার ঢালু জায়গায় পার্কের যাবতীয় লোক গোল হয়ে দাঁড়াল। কেউ কিছু বলবার আগেই তারা আপনা থেকেই সমবেতকণ্ঠে গান ধরল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এইরকম চলল— গানের পর গান। খুব কম করেও সেখানে হাজার-দুই লোক হাজির ছিল। মূল গায়েন কেউ নেই, নির্দেশক নেই, অথচ দু-হাজার কণ্ঠের এই সমবেত সংগীত তালে মানে লয়ে নিখুঁত হয়ে প্রকাশ পেল। জর্মানির বাইরে ঠিক এরকম একটা ব্যাপার কল্পনাই করা যায় না। এই যে জনসাধারণের হৃদয় থেকে উদ্‌গত স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার এমন মধুর প্রকাশ— এটা বাবার খুব ভালো লেগেছিল। আমরা যখন ডার্মস্টাট ছাড়লাম, মনে হল প্রিয়জনদের ছেড়ে চলেছি।

জর্মানিতে একবার যখন গিয়ে পড়া গেছে, বাবার পক্ষে সুইডেন না গিয়ে উপায় নেই। তা ছাড়া নোবেল-কমিটির আমন্ত্রণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা শিষ্টাচারসম্মত হয় না। কাজেই যেতে হল। ইয়োরোপের সুন্দর সুন্দর নগরীর মধ্যে স্টকহল্‌ম্‌ অন্যতম এখানে কয়েকটা দিন বেশ ভালোই কাটল। আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় বাবার সঙ্গে এমন অনেক লেখকের দেখা হয়ে গেল, যাঁদের লেখা তিনি অনুবাদে পড়েছেন। এই ভোজসভার সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং সুইডেনের রাজা। অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করলেন সেল্‌মা লায়েরলফ (Selma Lagerlof)। বাবার আসন পড়ল এই দুইজনার মাঝখানে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার গুণী, জ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, মনীষী অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ক্নুট হাম্‌সুন, বিওর্নসন, স্‌ভেন হেডিন ও ইয়োহান বোইয়ের। নোবেল-কমিটির সেক্রেটারির পাশে আমি বসেছিলাম। তিনি আমার কানে কানে একটা মজার গল্প বললেন— ক্নুট হামসুন যেবার প্রাইজ নিতে এলেন, সেবারকার একটি ঘটনা। ভোজসভার টেবিলে ভোজ্য যেমন পর্যাপ্ত থাকে, পানীয়ও তেমনি। নানা রকম মদের ব্যবস্থা থাকে। হামসুন

জন্মেছেন গ্রামদেশে— পৈতৃক পেশা ছিল চাষবাস। সুরার প্রতি অনুরাগ তাঁর প্রবল। নোবেল প্রাইজ লাভের জন্য হামসুনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতাদি হল। এবার হামসুন প্রত্যুত্তরে তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। কোথায় হামসুন? তিনি যে-আসনে বসেছিলেন সে আসন শূন্য। হামসুন ততক্ষণে নেশায় চুর হয়ে টেবিলের তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন ও সেল্‌মা লায়েরলফের গাউনের প্রান্ত ধরে উঠে বসবার বৃথা চেষ্টা করছেন! এ-যাত্রা কিন্তু হামসুন কোনো বেচাল করেন নি।

পর্যটক স্‌ভেন হেডিনের সঙ্গে আমাদের আগের থেকেই আলাপ ছিল। আচম্‌কা যত্র তত্র তাঁর আবির্ভাব হত ; সকল দেশই ছিল তাঁর আপন দেশ : তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। বাবা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে খুব ভালোবাসতেন। এখন সাক্ষাৎ-পবিচয়ের ফলে মানুষটিকেও তাঁর খুব ভালো লাগল। খুব সহজে এঁর সঙ্গে বন্ধুতা জমে। ইংরেজ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, এক-কালে তাঁকে যে-মানসম্মান দিয়েছিল, সব প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এজন্য হেডিন তখন ইংরেজের উপরে ভীষণ চটা। বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক অল্পবয়সি মনে হয়। মনটাও বেশ তাজা। আমাদের বললেন, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার কোনো দুর্গম অঞ্চলে অভিযান করতে যাবেন।

সুইডেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একদিন বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে জানালেন, বাবা যদি জর্মানিতে ফিরে যেতে চান, সুইডিশ সরকার তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁদের সেনাবিভাগ থেকে একটি সী-প্লেনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। প্রস্তাবটা বাবার ভালোই লাগল, বিমানযোগে যাত্রার আয়োজনও শুরু হল। স্‌ভেন হেডিন বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে এই খবর পেলেন। খবর শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দিলেন, আমি যেন বাবাকে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা থেকে নিবৃত্ত করি। বললেন, নিজের দেশকে তিনি খুবই ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে সুইডিশ হাওয়াই জাহাজে বাবা বর্লিন যাবেন— এ হতেই পারে না। হ্যাঁ, যদি একজন জর্মান পাইলট পাওয়া যায় তো সে অন্য কথা। তখনকার দিনে বিমানপথে চলাফেরা এখনকার মতো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল না। হেডিন নিজেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে টেলিফোন করে তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ফলে আমাদের ফিরতে হল সেই গতানুগতিক রেলগাড়ি আর স্টিমারেই।

জর্মানিতে ফিরে এসে বাবাকে উত্তর-জর্মানির কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হল। অতঃপর আমরা গিয়ে পৌঁছলাম দক্ষিণ-জর্মানির ম্যুন্‌খেন শহরে। এমন একটি সুন্দর জায়গা সচরাচর দেখা যায় না। বাবার বইয়ের জর্মান অনুবাদ যিনি প্রকাশ করতেন সেই কুর্ট ভোল্‌ফ-এর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেই আমরা অতিথি হয়েছিলাম। বাবা তাঁর প্রকাশকের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সেই সুযোগে আমরা আর্ট গ্যালারি ও ম্যুজিয়ম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। জর্মানির বেশির ভাগ শহরই বেশ ছিমছাম ও শ্রীসম্পন্ন। কিন্তু বাভারিয়ার রাজধানী এই ছোটোখাটো ম্যুন্‌খেন শহরের সঙ্গে যেন অন্য শহরের তুলনা হয় না। ম্যুনখেনের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ। হিটলার তখন চেলাচামুণ্ডা জোগাড় করে তাঁর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তোলায় ব্যস্ত। সে সময় কেউ হিটলারকে পাত্তা দিত না। যে ব্যের্-হল্ পরে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছিল— একদিন আমায় সেখানে নিয়ে গেলেন আমার ম্যুন্‌খেনের বন্ধুরা। মনে আছে, তাঁরা আমায় একটা টেবিল দেখিয়েছিলেন যেখানে হিটলার ও তাঁর শিষ্যেরা প্রত্যহ আসর জমাতেন।

একদিন একজন অস্ট্রীয় মহিলা এলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বললেন সোজা ভিয়েনা থেকে তিনি এসেছেন বাবাকে সেখানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। আমরা তখন প্যারিসে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছি। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা, তিনি আমাদের রাজি করিয়ে তবে ছাড়বেন। তিনি বললেন, যুদ্ধোত্তর জগতে কোনো দেশ যদি দুর্গতির চরমে পৌঁছে থাকে, সে হল অস্ট্রীয়া। জর্মানির যতটা না দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার অস্ট্রীয়ায় বাবার উপস্থিতি— বাবা তাঁদের দুঃখে সান্ত্বনাবিধান করতে পারবেন। যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন তিনি বক্তৃতার জন্য দক্ষিণা দেবার কথা তুললেন। বললেন, ভিয়েনার লোক দরিদ্র, কিন্তু কবিকে একবার চোখে দেখবার জন্য, কবির দু-চারটে কথা শোনবার জন্য, তারা খুশি হয়ে এক সপ্তাহ অভুক্ত থেকে, দক্ষিণা দেবার টাকা সংগ্রহ করবে। সোজা ভিয়েনা না গিয়ে আমরা প্রাহা হয়ে গেলাম। চেক্‌দের কাছে বাবা প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাঁদের দেশ একবার ঘুরে যাবেন। তা ছাড়া অধ্যাপক ভিন্‌টেরনিৎসের প্রতি বাবা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ

করতেন, ইচ্ছা ছিল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। শত শত বৎসর ধরে বোহেমিয়ানরা পরপদানত থেকে প্রচুর দুঃখ সয়েছে। ভার্সাই চুক্তির পর, প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কল্যাণে এই প্রথম তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তারা তখন আনন্দে আত্মহারা। ঠিক এই সময়ে বাবা প্রাহাতে এসে পড়ায় চেক্‌রা আরো উল্লসিত হয়ে উঠল। যাতে বাবার চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট মাসারিক অধ্যাপক ভিন্‌টেরনিৎস ও ডক্টর লেস্‌নির হাতে সমস্ত ভার তুলে দিলেন। ইতিপূর্বে কাপ্‌ মার্‌ত্যাঁয় বাবার সঙ্গে মাসারিকের পরিচয় ঘটেছিল। এইভাবে ইয়োরোপের দুজন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল এবং এই আলাপের ফলে বাবার আমন্ত্রণক্রমে এঁরা পরে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিদিনই অনেক নিমন্ত্রণ আসত। একদিন য়ুনিভার্সিটি থেকে দুটি পৃথক নিমন্ত্রণপত্র এল— স্থান য়ুনিভার্সিটি, দিন একই, একটি সকালবেলার, অন্যটি বিকেলের। গোড়ায় একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জানা গেল বোহেমিয়া যখন জর্মান-শাসনে ছিল তখন প্রাহায় জর্মানরা একটি স্টেট য়ুনিভার্সিটির পত্তন করেছিলেন। অধ্যাপক ভিন্‌টেরনিৎস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকের ধারণা হল জর্মানদের প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় পরাধীনতার স্মারকচিহ্ন। তাঁরা চাইলেন চেক্‌দের জন্য আলাদা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর প্রাহা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় হবার মতো ইমারত ছিল ওই একটিই। সুতরাং স্থির হল, সকালবেলার দিকে যা স্টেট য়ুনিভার্সিটি, বিকেলের দিকে তা-ই হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাপক ও ছাত্র থাকবেন। এইভাবে সকালের দিকে আমাদের জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অধ্যাপক ভিন্‌টেরনিৎস অভ্যর্থনা করলেন, বিকেলে চেক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডক্টর লেস্‌নি।

সংবর্ধনা-সভার ব্যাপার সেরে আমরা হোটেলে ফিরছি, আমার কেমন মনে হল আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি না। প্রাহা শহরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমার মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে। হঠাৎ মাঝরাস্তায় মোটর গেল থেমে, চালক আমাদের জানালো মোটরের কলকব্জা কিছু-একটা বিগড়েছে বলে মনে হচ্ছে, সারাতে দু-চার মিনিট সময় লাগবে। চালকের কথা শেষ না হতেই একজন লোক এসে হাজির। বলল, পাশেই তার দোকান, সেখানে গেলেই তো

হয়, কবি গাড়িতে বসে থাকবেন তাও কি কখনো হয়, ইত্যাদি। আমাদের একপ্রকার জোর করে নামিয়ে লোকটি তার স্টুডিয়োতে নিয়ে হাজির করল। লোকটিকে চিনি-চিনি বলে মনে হচ্ছিল; এবার মনে পড়ে গেল, এ তো সেই ফোটোগ্রাফার, বাবার ছবি তুলবার অনুমতি আদায়ের জন্য যে আমাকে প্রায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল! প্রত্যেকবারই তাকে তখন ফিরিয়ে দিয়েছি। অনন্যোপায় হয়ে সে নিশ্চয় আমাদের গাড়ির চালকের সঙ্গে একটা-কিছু রফা করে থাকবে। সে যাই হোক, অসাধু উপায় অবলম্বন করলে কী হয়, এই সুযোগের সে অপব্যবহার করে নি। দু-চার মিনিটের মধ্যে সে ডজন ডজন ছবি তুলে নিল। তার একদল সহকর্মী ছবি তোলা মাত্র হাতে হাতে সেই নেগেটিভ নিয়ে যায় আবার নতুন নেগেটিভ চালান করে। বাবার যত ভালো ভালো ছবি আছে, প্রাহায় তোলা এই ছবিগুলোকে তার মধ্যে ধরা যায়।

আমরা প্রাহাতে যে-কিছুকাল ছিলাম, অধ্যাপক-বন্ধুদের কল্যাণে তা যেন প্রবাস বলেই মনে হয় নি। ভিন্‌টের়নিৎস, লেসনি ও অতিথিবৎসল অন্যান্য চেক্ বন্ধুদের ছেড়ে যেতে আমাদের দস্তুরমতো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া প্রাহা শহরটা ভারি মনোরম, চতুর্দিকে প্রাচীন অট্টালিকা ও দুর্গের ছড়াছড়ি— স্থাপত্যের দিক থেকে এদের তুলনা হয় না। কিন্তু ভিয়েনা তখন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভিয়েনারও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যদিচ যুদ্ধোত্তর ভিয়েনায় সাধারণ লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁচেছিল। প্রাহায় দেখেছিলাম, অভাবিতপূর্ব স্বাধীনতার আস্বাদে লোকের মন আনন্দে ভরপুর। ঘণ্টা-কয়েকের রাস্তা পার হয়ে ভিয়েনায় পৌঁছে দেখা গেল, শহরের অধিকাংশ লোক অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে— হৃদয় তাদের নিরানন্দ। ইয়োরোপের সর্বত্র তখন এইরকম অবস্থা— কোথাও হর্ষ, কোথাও বা বিষাদ। এক দেশের সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে গিয়ে বার বার দেখেছি অবস্থার এরকম অদ্ভুত তারতম্য। ফ্রান্স থেকে আমরা যখন হল্যাণ্ড গেলাম, তখনকার একটি ঘটনা আমি জীবনে ভুলব না। জর্মানিতে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা তা তখনো পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল না কিন্তু বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, অধ্যাপক মায়ার্ বেন্‌ফে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। কেননা এঁরা বাবার কিছু লেখা জর্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। বাবা তাঁদের

চিঠি লিখে বললেন, তাঁরা যেন হামবুর্গ থেকে হল্যাণ্ডের একটি গ্রামে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করেন। সেই গ্রামে শ্রীমতী ভ্যান্ এগেনের অতিথিরূপে আমাদের কিছুদিন থাকবার কথা। অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী এসে পৌঁছলেন রাত্রে। পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় টেবিলে তাঁদের সঙ্গে দেখা। অল্পাহারে শীর্ণ এই জর্মান-দম্পতি টেবিলের ধারে চুপচাপ বসে আছেন। টেবিল-ভরা আহার্য—নানারকম ফল, রুটি, মাখন, পনির, ডিম, মাংস ও আরো কত কী। তাঁরা যেন কী-একটা সংকোচে এ খাবার স্পর্শ করতেও পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের দু-চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। এমন পর্যাপ্ত খাবার তাঁরা পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম একসঙ্গে দেখলেন। অথচ হল্যাণ্ড ও জর্মানি পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী। হাপস্‌বুর্গ-রাজত্বের সময়ে ভিয়েনা ছিল আনন্দোচ্ছল একটি শহর। যুদ্ধের পর মনে হল এ-শহর অকালবার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই, কঙ্কালসার নরনারীর ভিড়, পরনে তাদের ছেঁড়া পোশাক। এ-সব সত্ত্বেও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাদের অনুরাগ যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তার বহু পরিচয় পেয়ে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম। থিয়েটার, কন্‌সার্ট, অপেরা কিংবা বক্তৃতাসভায় লোকসমাগম হত প্রচুর। একবেলা না খেয়েও এ-সব অনুষ্ঠানের টিকিট কিনতে এদের দ্বিধা ছিল না।

ভাগ্‌নারের অপেরা 'ডি মাইস্টারজিঙ্গার' তখন অভিনীত হচ্ছে। বাবাকে বলে কয়ে আমরা এই অপেরা দেখাতে নিয়ে গেলাম। প্রাহা থেকে আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ভিন্‌টেরনিৎস এসেছিলেন, তিনি অপেরার গল্পাংশ ও সংগীতের মর্মার্থ অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। ভারতীয়দের কাছে পাশ্চাত্ত্য সংগীত কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে— এর আগে আমি ইয়োরোপীয় সংগীত বোঝবার জন্য সত্যিকার কোনো চেষ্টাও হয়তো করি নি। 'ডি মাইস্টারজিঙ্গার' বোধহয় ভাগ্‌নারের সবচেয়ে দুর্বোধ্য অপেরা। কিন্তু ভিন্‌টেরনিৎস এমন সুন্দর করে সবটুকু ব্যাখ্যা করলেন যে মনে হল, আমরা তা থেকে অনেকখানি রস আহরণ করতে পেরেছি। অপেরা যখন শেষ হল তখন আমাদের মাথা যেন ঝিমঝিম করছে। একটা বিষয় আমার কিছুতেই বোধগম্য হয় না, পাশ্চাত্ত্য সংগীত কেবল ভাব উদ্রেক করে ক্ষান্ত হয় না কেন। এই সংগীতের শেষ লক্ষ্য যেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমস্ত রসটুকু নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে শ্রোতার সামনে পরিবেশন করা।

যে অস্ট্রীয় মহিলার আগ্রহে আমাদের ভিয়েনায় আসা, তিনি তাঁর কথা ঠিকই রেখেছিলেন। বাবা যে-সব বক্তৃতা দিলেন তার জন্য তিনি বেশ মোটা-রকম দক্ষিণা দিয়েছিলেন। বাবা কিন্তু সে-সব টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ভিয়েনার অভুক্ত শিশুদের মুখে কিছু আহার তুলে দেবার জন্য টাকাটা যেন খরচ করা হয়। পরে আমি শুনেছিলাম, বাবার দেওয়া এই উপহার অস্ট্রীয়া-বাসীদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

ইতালি-ভ্রমণ

মুসোলিনির আমন্ত্রণক্রমে বাবার ইতালি-ভ্রমণের ব্যাপারটা স্বদেশে বিদেশে নানা রকম বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল। প্রথমে স্থির হয়েছিল অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর স্ত্রী এই সফরে বাবার সঙ্গী হবেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে বাবার আদেশ এল যে—প্রতিমা, আমাদের মেয়ে নন্দিনী এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ইতালি যাব। সুতরাং দলটি বেশ ভারীই হয়ে পড়ল। মুসোলিনি আমাদের সফরের তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকিকে নিযুক্ত করেছিলেন। ফর্মিকি ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে বছরখানেক অধ্যাপনা করে এসেছেন; সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের ভালোরকমই পরিচয় ছিল: চমৎকার মানুষটি। নেপ্‌ল্‌সে পৌঁছতেই তাঁর আন্তরিক অভ্যর্থনা আমাদের মনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল। আশা হল, বুঝি-বা সরকারি সফর-সূচির শৃঙ্খলতার থেকে এবারকার মতো রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু এমনটি আশা করার যে কোনোই কারণ নেই, তা বোঝা গেল পরের একটি ঘটনা থেকে।

বিলেত থেকে লেনার্ড এল্‌ম্‌হর্স্ট এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বছর-দুই আগে বাবা যখন আর্জেন্টিনায় সফরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে এই প্রাণোচ্ছল তরুণটি তাঁর পরম স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। লেনার্ডকে ইতালিতে পেয়ে বাবা তো ভারি খুশি। হাস্যচ্ছলে বললেন: বিলিতি সাহেবই হবে মুসোলিনির খাঁটি প্রতিষেধক, সুতরাং লেনার্ডও চলুক আমাদের সঙ্গে। নেপ্‌ল্‌সের বন্দর থেকে রোমে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য স্পেশাল ট্রেন এসে হাজির। লেনার্ড ছুটলেন তাঁর মালপত্র আনতে, টিকিটও কিনতে হবে তাঁকে। এই ফাঁকে ফর্মিকি প্রায় ঠেলেঠুলেই আমাদের ট্রেনের কামরায় তুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন দিল ছেড়ে—কোনোরকম সংকেত না জানিয়েই। মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম লেনার্ড এসে পৌঁছলেন কিনা। ট্রেনের গতি বেশ বেড়ে গেছে, প্ল্যাটফর্ম প্রায় ছাড়ে ছাড়ে—এমন সময় লেনার্ড হন্তদন্ত হয়ে এসে ফর্মিকির বিস্তর নিষেধ সত্ত্বেও পিছনের একটা কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন। এই ঘটনা থেকে লেনার্ড বুঝতে

পারলেন, তাঁর উপস্থিতিকে ইতালির কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখছেন না। কদিন বাদেই তিনি ফিরে চলে গেলেন।

বাবা এবারকার সফরে সর্বত্রই রাজকীয় সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। তখনকার পত্র-পত্রিকায় সে-সব সংবর্ধনার কথা বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। সুতরাং সে বিষয়ে বেশি কিছু বলা অনাবশ্যক। তার চেয়ে বরং কিছু ছোটো-খাটো ঘটনার কথা বলি, যা আজকের দিনেও অনেকের কৌতূহল জাগাবে।

আমরা রোমে থাকতে থাকতেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাবার কয়েকটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু সভা-সমিতিতে বাবা ভাষণ দিয়েছিলেন। অধ্যাপক মহলানবিশ ও আমার কেমন জানি সন্দেহ হল, খবরের কাগজের বিবরণে বাবার কথাবার্তা ঠিকঠিক ছাপা হচ্ছে না। আমাদের পুরনো বন্ধু আঁদ্রে কার্পেলেস্ সেই সময়ে ইতালিতে এসেছেন তাঁর সদ্য-পরিণীত সুইডিশ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। ইচ্ছে ইতালিদেশের সঙ্গে স্বামীর পরিচয় ঘটানো আর আমাদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যাবে সেই সুযোগে। আঁদ্রে ইতালীয় ভাষা পড়তে পাড়তেন, তাঁর কাছে' জানা গেল আমাদের সন্দেহ অমূলক নয়। চেষ্টাচরিত্র করে আমরাও ইতিমধ্যে কাজ চালানো গোছের একটু ইতালীয় শিখে নিয়েছি। কিন্তু এই যৎসামান্য ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে ভরসা হল না। রিপোর্টগুলি অনুবাদ করার জন্যে একজন অষ্ট্রীয় মহিলাকে নিযুক্ত করা হল— যিনি ইংরেজি ও ইতালীয় দুইই জানেন। কিন্তু তাঁর অনুবাদও সন্তোষজনক ঠেকল না। শেষপর্যন্ত জানা গেল, মহিলাটি আসলে মুসোলিনির বেতনভোগী এক গুপ্তচর। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরিতে এঁর বেশ নামডাক আছে। কাজেই এঁকে বিদায় করতে হল।

আমরা যখন রোমে ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে নানান জায়গা থেকে অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধব সেখানে এসে জড়ো হলেন। এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। লেনার্ড এল্‌মহর্স্ট, আঁদ্রে কার্পেলেস্ ও তাঁর স্বামী হগ্‌মান (Dal Hogman)— এঁরা তো ছিলেনই, উপরন্তু, আমাদের অবাক করে দিয়ে হাজির হলেন মিসেস ভন্ মোড়ি। এঁরা আবার তাঁদের পরিচিত বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আসর জমাতেন। এর ফলে গরমের মরশুমটা রোমে আমাদের কাটল ভালো। লোকজন নিয়ে আলাপ

জমানো খুব পছন্দ করতেন বাবা, সুতরাং তিনি যে বেশ খুশি-মেজাজে ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। একদিন কথায় কথায় মিসেস মোডি বললেন, বাবা রোম পর্যন্ত এসেও বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে যাবেন সে কি কখনো হয়! বাবার খুবই ইচ্ছা, যাবার আগে ক্রোচের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কী করে তা সম্ভবপর হবে? ক্রোচের সঙ্গে বাবার পূর্বপরিচয় নেই, তিনি যে ঠিক কোথায় থাকেন আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রফেসর ফর্মিকির বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে হল না। ইতিমধ্যে মিসেস মোডি ইতালীয় সেনা-বিভাগের একজন তরুণ অফিসারকে এনে হাজির করলেন। অফিসারটি বললেন, ক্রোচের সঙ্গে তাঁর ভালোরকম আলাপ-পরিচয় আছে, বাবার কাছে তাঁকে এমনভাবে হাজির করে দেবেন যে কাকপক্ষীটিও সে বিষয়ে কিছু জানতে পারবে না। সৈন্যবাহিনীর অফিসার হিসেবে তাঁর আনুগত্য রাজার কাছে, মুসোলিনির কাছে নয়— এই সুযোগে মুসোলিনিকে একহাত নিতে পারবেন মনে করে তিনি বেজায় খুশি। বাবা তাঁকে বললেন, অত তাড়াহুড়ো করে কাজ নেই, তিনি নিজেই বরং মুসোলিনিকে বলবেন ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে। বাবা সত্যিই কথাটা পাড়লেন তাঁর কাছে। মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ব্যবস্থা করার জন্যে ফর্মিকিকে হুকুম দিয়ে দিলেন। অনুমতি তো পাওয়া গেল, এখন প্রশ্ন দাঁড়াল মুসোলিনির অনুচরদের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে ক্রোচের সঙ্গে বাবা মন খুলে আলাপ করতে পারেন। এবারও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন সেই তরুণ অফিসার। তিনি বিমানযোগে নেপল্‌স্ গিয়ে পরদিন ভোর পাঁচটার সময় ক্রোচেকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে হাজির। একটি প্রাণীরও নিদ্রাভঙ্গ হয় নি তখন, সুতরাং সেই জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে বাবা অবাধে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে নানান প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারলেন। ক্রোচের সঙ্গে বাবা প্রাতরাশে বসেছেন, এমন সময় ফর্মিকি এসে উপস্থিত। আমি তখন বারান্দায় বসে পাহারা দিচ্ছি। ফর্মিকি আমার মুখেই শুনলেন, বাবা একজন অতিথির সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রত আছেন, সে অতিথি স্বয়ং ক্রোচে। তখন তাঁর যা অবস্থা তা হল অবর্ণনীয়। অক্ষম ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন, মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

দুজনের সাক্ষাৎকারে কী আলাপ-আলোচনা হল, বাবার কাছে শুনে পরে

অধ্যাপক. মহলানবিশ তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছিলন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। তবে আমরা কেউই সেই দীর্ঘকালব্যাপী সাক্ষাৎকারের সময় হাজির ছিলাম না। ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে বাবা যে খুব খুশি হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে ডিউক স্কোত্তিকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। এ চিঠি লিখেছিলেন ঘটনার অব্যবহিত পরে :

আপনাদের দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে সেদিন আমার এক-পলক দেখা হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলতে অবশ্য একটু বেগ পেতে হয়েছিল। স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা বীর, যাঁরা অকুতোভয়, তাঁদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ে আমার অশেষ আনন্দ। আমরা যখন ইয়োরোপে আসি, তখন চিন্তাজগতে আপনাদের স্বেচ্ছাবিহারের স্বাধীনতা থেকে, আপনাদের নবনব-উন্মেষশালী সৃজনপ্রতিভা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চাই। এবার দেখে দুঃখ হল যে, আপনারা আমেরিকার অনুকরণে যন্ত্রসিদ্ধি ও কর্মকুশলতা নিয়ে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়েছেন। আমাদের মতো নিষ্কর্মা দেশ এ-সব পটুতা দেখে হতভম্ব হতে পারে, কিন্তু আপনাদের পক্ষে এই পরানুকরণ মারাত্মক। আমেরিকা মনে করে স্থূল হওয়াটই বড়ো হওয়া। তাই আদর্শবাদ ও সত্যানুশীলনের মতো সূক্ষ্ম ব্যাপারে তাদের সন্দেহের অন্ত নেই।

১৯২৫ সালে আমরা প্রথম যেবার ইতালি আসি, ডিউক স্কোত্তি মিলানে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইতালির প্রখ্যাত এক বনেদি বংশে তাঁর জন্ম। আভিজাত্যে তিনি যেমন কুলীন, বৈদগ্ধ্যেও তেমনি। মিলান শহরে 'সির্কোলো ফিলোলোজিকো মিলানেসে' নামে ভাষাতাত্ত্বিকদের যে সংস্থা আছে, তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্কোত্তি। ইতালিতে ফাশিস্ট বিপ্লবের সূচনা হয় মিলান শহর থেকে— এখান থেকেই মুসোলিনি দক্ষিণ ইতালির পথে বিজয়-অভিযানে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, উত্তর ইতালির লোকেরা কোনোকালে মুসোলিনির প্রতি খুব আনুগত্য দেখায় নি। মিলানে পা দেবার অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল 'হোটেল কাভুর' নামে যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম,

সেখানে মুসোলিনি তাঁর বিশ্বস্ত একজন সহচরীকে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিয়েছেন— উদ্দেশ্য, বাবার উপর নজর রাখা এবং ডিউক স্কোত্তির সঙ্গে দেখা-শুনো, আলাপ-আলোচনার খবরাখবর সংগ্রহ করা। ডিউকের সঙ্গে এবং মিলানের অন্য যাঁদের সঙ্গে বাবার দেখা হল তাঁরা এ-যাত্রায় ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে বাবার সঙ্গে বেশ খোলাখুলি কথাবার্তা বললেন।

এক বছর বাদে ১৯২৬-এ এসে দেখি, সব কেমন যেন পালটে গেছে। ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলে ফাশিস্টদের প্রভাব আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। আতঙ্কে লোকেরা পেটের কথা পেটেই রাখে— মুখ আর খুলতে চায় না। ডিউকের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু তিনি যেন অন্য মানুষ। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে একবার এসে দেখা করে গেলেন। ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি বেশ কষ্ট করে বাক্‌সংযম করছেন। আমরা যখন তুরিনে অবস্থান করছি, সেই সময়ে স্কোত্তি তাঁর এক নিকট-আত্মীয়া, ইতালির রাজার সম্পর্কিতা এক ভগ্নীকে গোপনে বাবার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন, পাছে বাবা তাঁকে ভুল বোঝেন। এই রাজকুমারীর কাছ থেকে জানা গেল যে ফাশিস্ট আমলে স্কোত্তি-পরিবারের প্রভূত ক্ষতি ও দুর্দশা ঘটেছে। তাঁর মারফত স্কোত্তি জানিয়েছেন, মিলানে যদি তাঁর ব্যবহারে কোনো ত্রুটি ঘটে থাকে সেজন্য দোষটা ঠিক তাঁর নয়, ফাশিস্টরাই তার জন্যে দায়ী। স্কোত্তি সেই মহিলার সঙ্গে কিছু নথিপত্রও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে-সব থেকে জানা যায়, ফাশিস্টদের যজ্ঞবেদিতে যে-সব জ্ঞানী গুণী তাঁদের আত্মাকে আহুতি দিতে রাজি হন নি তাঁদের উপর কিরকম অকথ্য অত্যাচার ঘটেছে। বাবার ইতালি-সফর সম্পর্কে ফাশিস্ট কাগজে যে-সব অপপ্রচার হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের ক্ষোভের সীমা ছিল না। মুসোলিনির অনুচরবৃন্দের অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু কিছু কানাঘুষোও শুনেছিলাম, সে-সব যে মোটেই মিথ্যে নয়, তা বেশ বোঝা গেল স্কোত্তির প্রেরিত কাগজপত্র থেকে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে লোকের সুখ-সমৃদ্ধি বলে মনে হচ্ছে, তার নেপথ্যে অনেক গ্লানি লুকিয়ে আছে। বাবা যতদিন ইতালিতে থাকবেন ততদিন তাঁর পক্ষে মুখ খোলা শক্ত, যদিচ ইতিমধ্যে ফাশিস্ট কাগজে বাবাকে মুসোলিনির পরম অনুরাগী প্রতিপন্ন করার জন্য বিধিমতো চেষ্টা চলেছে। বাবা তো গৃহস্বামীর ঘরে বসে আতিথ্যের

অপমান করতে পারেন না, তাই তিনি ইতালি থেকে বেরোবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছা সুইট্জারল্যাণ্ডে যান, কারণ সে দেশে তিনি নিজেই মন খুলে কথাবার্তা বলতে পারবেন। জেনেভা হ্রদের কাছে ভিয়েন্যভ্ বলে একটি শান্ত নিরিবিলি জায়গায় রম্যাঁ রলাঁ বসবাস করছেন, আমরা সেখানেই যাব বলে স্থির করলাম।

ইয়োরোপের সীমান্তে

১৯২৬ সালে বাবার এই ইয়োরোপ-সফর নানা কারণে স্মরণীয়। যাঁরা এই সফরে বাবার সঙ্গে ছিলেন না তাঁদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত, কী হৃদ্যতার সঙ্গে সর্বত্র বাবা সংবর্ধিত হয়েছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় লোক থেকে শুরু করে আপামর সাধারণ সবাই তাঁকে প্রভূত সমাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। কেবল কবি বা মনীষী বলে নয়, দ্রষ্টা সাধক রূপেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন সমস্ত লোকের। আমরা সচরাচর মনে করি, পশ্চিমদেশের লোকেরা যুক্তিবাদী, ভাবের আতিশয্য তাদের স্বভাবগত নয়। এই ধারণা যে কত ভিত্তি-হীন, সে কথা প্রমাণ হল ইয়োরোপে। স্টেশনে স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। বাবাকে দর্শন করবে, বাবার জোব্বার প্রান্তটুকু নত হয়ে চুম্বন করবে, এর জন্যে লোকে একেবারে ভেঙে পড়ত। ইয়োরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই ভক্তির বন্যা বয়ে যেতে দেখেছি।

আমাদের সফরের একেবারে শেষ দিকে আমরা গিয়েছিলাম দক্ষিণ বাল্‌কান অঞ্চলে। এ-সব দেশের আচার-আচরণ, পোশাক, আবহাওয়া অনেকটা প্রাচ্যদেশের মতো। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহরে দুটো দিন কাটল অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনার আনন্দ-উৎসবে। এবার আমরা রওনা হব বুলগেরিয়া-রুমানিয়ার সীমান্তস্থিত একটি ছোটোখাটো রুমানীয় শহর অভিমুখে। অল্প কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির ঘটা দেখে আমরা একটু বিস্মিত হলাম। অভ্যর্থনার আড়ম্বর দেখে দেখে আমাদের খানিকটা গা-সহা হয়ে গেছে, কিন্তু বিদায় দেবার জন্য এত আয়োজনের আড়ম্বর কেন? স্বয়ং বুলগেরিয়ার রাজার হুকুমমাফিক আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, লেখক ও সংবাদ-পত্রসেবীদের একটা বিরাট দল আমাদের সঙ্গেই চলল। রাজকীয় ট্রেন গিয়ে থামল দানিয়ুব নদীর ঘাটে— এই নদীই হল দুই দেশের মধ্যেকার সীমান্তরেখা। গতিপথের শেষ ভাগে দানিয়ুব বেশ চওড়া হয়ে এসেছে অনেকটা আমাদের দেশের গঙ্গার মতো। নদীর ঘাটে পা দিয়ে তো আমরা অবাক। নদীর অপর পারে রুমানিয়ার যে ছোট্ট শহরে আমাদের

পৌঁছবার কথা, সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে জাতীয় পতাকায় সুসজ্জিত একটি বুলগেরীয় যুদ্ধজাহাজ। ক্রুজার চলতে শুরু করলে পর কামান-নির্ঘোষে বুলগেরীয়রা বাবাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাল, ব্যাণ্ড বেজে উঠল আকাশ-ফাটানো শব্দে। এপারের লোকেরা তারস্বরে গাইতে লাগল বুলগেরিয়ার জাতীয় সংগীত। এই-সব হৈহল্লার মাঝখানে দেখা গেল, কয়েকজন বুলগেরীয় রুমানিয়ার ঘাটের দিকে খুব কৌতূহলসহকারে তাকিয়ে আছে। ততক্ষণে আমরা প্রায় অপর পারে পৌঁছে গেছি। হঠাৎ শোনা গেল ওপারের লোকেরা উচ্চহাস্যে যেন ফেটে পড়ছে। রুমানিয়ার ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে একটিমাত্র লোক আমাদের ক্রুজারের দিকে তাকিয়ে মাথা চাপড়াচ্ছে, ঘাটে দ্বিতীয় প্রাণী উপস্থিত নেই। রুমানিয়ার ঘাটে ক্রুজার এসে পৌঁছতে, আমাদের সঙ্গে যে-সব বুলগেরীয় অফিসার এসেছিলেন তাঁরা ঘাট অবধি আমাদের পৌঁছে দিলেন, বিনয়বচনে বিদায়সম্ভাষণ জানালেন। এ ঘাটের উদ্‌ভ্রান্ত লোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বুলগেরিয়ার ঘাটে আর-একবার কামান গর্জে উঠল, আর-একবার আকাশ-ফাটা শব্দে ব্যাণ্ড বাজল, সেইসঙ্গে ভেসে এল হাসির হর্‌রা। আমরা তখন এরকম উৎকট প্রমোদের তাৎপর্য বুঝতে পারি নি— কেউ আমাদের বলেও নি কিছু। ব্যাখ্যাটা শোনা গেল সেই রুমানীয় ব্যক্তিটির কাছ থেকে— তিনি হলেন সীমান্তশহরের সেই ছোট্ট রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার। বুলগেরীয়রা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর একহাত নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের পৌঁছবার ঠিক সময়টা রুমানীয় সরকারকে জানায় নি। বাবাকে অভ্যর্থনা করে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে নিয়ে যাবার সুবন্দোবস্ত যাতে আগের থেকে না করতে পারে এবং তার জন্যে রুমানিয়া যাতে বিব্রত ও অপদস্থ হয়, এইটাই ছিল বুলগেরীয়দের অভিপ্রায়। রুমানিয়ার মুখে এই সুযোগে চুনকালি মাখানো গেছে ভেবে বুলগেরীয়রা নিশ্চয় বেশ কিছুকাল আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকবে।

একজন সুইস্ কৃষক

সুইজারল্যাণ্ডের সেণ্ট মোরিৎস অঞ্চলে গ্রীষ্ম যাপনের আনন্দ সারা জীবন মনে থাকবে। এ-যাত্রায় আমাদের দলে কয়েকজন হাঙ্গেরীয় বন্ধুবান্ধব থাকায় ছুটিটা আরো বেশি জমেছিল। গ্রীষ্মের মরশুমে সচরাচর যাঁরা এ অঞ্চলে আসেন, তাঁদের অধিকাংশের লক্ষ্য হল বরফের উপর রকমারি খেলা-ধুলা করা। এ-সব ক্রীড়ামোদীদের অধ্যুষিত লোকালয় থেকে একটু দূরে সিল্‌স্‌মারিয়া হ্রদের ধারে একটি হোটেলে আমরা আশ্রয় নিলাম। জায়গাটা নিরিবিলি, হোটেলটাও ভালো। আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় বেহালাবাদক হুবের্‌মান। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কদাচিৎই সাক্ষাৎ হত। তিনি তাঁর ঘর-দোর সব বন্ধ করে একা থাকতে ভালোবাসতেন, কচিৎ কখনো আমাদের সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে খাবার ঘরে এসে হাজির হতেন। এঁর অদ্ভুত সব বাতিক সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা গেল। ভ্রমণপথে যখনই তাকে হোটেলে আশ্রয় নিতে হত, কেবল আশেপাশের কামরা নয়, মাঝে মাঝে পুরো তলাটাই তাঁর জন্যে ভাড়া নিতে হত। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সর্বদা লেপ-বালাপোশের মতো বস্তু সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। এগুলি পরদার মতো করে দরজা জানালায় এঁটে দেবার পরও তিনি হট্টগোল হচ্ছে বলে অনুযোগ করতেন।

একদিন স্থির হল, আমরা ইতালীয় সীমান্তের কাছাকাছি একটি ছোট্ট গাঁয়ে পিকনিক করব। পাইন গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে উঁচু থেকে নীচের মালভূমিতে নেমে গেছে। সেই রাস্তায় আমাদের মোটর চলল দ্রুতগতিতে। পথে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য আমাদের গাড়ি যেখানে থামল. তার উলটো দিকে একটি কুটির, আর কুটিরের সামনে কয়েকটা তালগাছ। তালগাছ দেখে আমার খুব কৌতূহল হল, সুদূর বিদেশে আমাদের দেশী গাছ কী করে এল। গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ করে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করার পরামর্শ দিলেন একজন হাঙ্গেরীয় বন্ধু। অদ্ভুত-চেহারার একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের সেই কুটিরে ডেকে নিয়ে গেল। সেই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় সে যে কী সব বলল, আমাদের ঠিক বোধগম্য হল না। ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে

একজন ওখানকার আঞ্চলিক ভাষা বুঝতেন, তাঁর সাহায্যে গৃহস্বামীর সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া গেল। প্রতিমা ও আমার নাম শুনে ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন, জিগগেস করলেন ঠাকুর-নামধেয় কবির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। যখন শুনলেন আমি তাঁরই ছেলে ও প্রতিমা আমার স্ত্রী, তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। তার পর এক লাফে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁর বোনের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। প্রতিমা ও আমার হাত ধরে একপ্রকার জোর করে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি— সে এক আশ্চর্য ব্যাপার— মেঝে থেকে ছাদ অবধি তাকের পরে তাক বইয়ে ঠাসা! জর্মান ভাষায় অনূদিত বাবার লেখা সমস্ত বই তো আছেই, অধিকন্তু অনেকগুলো সংস্কৃত কাব্য-নাটক ও দর্শনের বইও আছে। সুইস্ কৃষকের পোশাক পরিহিত এই লোকটি যখন তাঁর মাটি-কোপানো রুক্ষ হাতে একটি সংস্কৃত কাব্য নিয়ে একটার পর একটা শ্লোক মূল সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করতে লাগলেন, তখন আমার বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। আমাদের সেই দোভাষীর সহায়তায় জানা গেল, কয়েক বছর আগে ইনি কোনো এক জর্মান বইয়ে উপনিষদের দুটি শ্লোকের সন্ধান পান। সেই শ্লোক তাঁর এত ভালো লাগে যে তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলেন, মূল সংস্কৃতে এ-সব পড়তে হবে। কিছু বই এনে তিনি ভাষা আয়ত্ত করতে উঠে পড়ে লাগলেন। নিকটতম রেলস্টেশন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এই নিরিবিলি গ্রামে একেবারে নিজের চেষ্টায় ইনি যে দেবভাষা কতখানি আয়ত্ত করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর গ্রন্থাগারে সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের মূল্যবান সংগ্রহ দেখে। অতঃপর তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে পরিচয় হল; তিনি বললেন, চিত্রাঙ্গদা, ঘরে-বাইরে ও ডাকঘর -এর অনুবাদ তাঁর বিশেষ ভালো লাগে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি এই-সব বই থেকে অংশবিশেষ গ্রামের লোকেদের পড়ে শোনান। জীবিকানির্বাহের জন্য মহিলাটি চামড়ার আসনে ভারতীয় নকশা উৎকীর্ণ করে বিক্রি করেন। নকশা দেখে মনে হল, বটতলা-সংস্করণের বাংলা রামায়ণ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা। কোথা থেকে এ বই যে তাঁর হাতে এসেছিল তা আমার কাছে রহস্য রয়ে গেল।

এই কৃষিজীবী পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এঁদের এই ভাইবোনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখে, দেশের কথা মনে করে আমাদের গর্ব হতে লাগল। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম হৃদয়ে এক গভীর আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে।

পতিসর

বাবার সঙ্গে বিদেশে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে। কিন্তু জমিদারি তদারকির ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল বলে মাঝে মাঝে আমাকে শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলে যেত হত। শৈশবকালের নানান সুখস্মৃতিজড়িত এই-সব জায়গায় যেতে আমার খুবই ভালো লাগত।

প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর পরে জরুরি কাজে আমায় একবার কিছুদিনের জন্য পতিসর যেতে হয়। রেলপথে দীর্ঘ ক্লান্তিকর রাস্তা অতিক্রম করার পর, জলপথে পতিসর যাবার উদ্দেশ্যে যখন বজরায় আশ্রয় নিলাম, মনে হল বহুকালের চেনা কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মন আনন্দে ভরে উঠল। মন্থর গতিতে বজরা এগিয়ে চলল, রেল ইঞ্জিনের সেই ঘড়িধরা হাঁসফাঁস নেই, তাড়াহুড়ো নেই। খানিকক্ষণ পরেই রেলব্রিজের তলা দিয়ে বজরা ভেসে চলল। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে রেলস্টেশনের কাছাকাছি নোংরা যে-সব টিনের চাল দেওয়া বস্তি থাকে, সেই-সব পেরিয়ে এগিয়ে চললাম।

পুরাণে ইতিহাসে যে-সব নদীর খুব নামডাক, আত্রাই সেরকম নদী নয়। এই অঞ্চলের বাইরে এর নাম বড়ো কেউ একটা জানেই না। রামায়ণ মহাভারতে এ নদীর উল্লেখমাত্র নেই। স্নানযাত্রার দিনে এই আত্রাইয়ের তীরে পুণ্যার্থীর ভিড় হয় না। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার পল্লী অঞ্চলে আঁকাবাঁকা পথ কেটে যে-সব অগুনতি ছোটো নদী ধীর পদক্ষেপে বয়ে যায়— আত্রাই হল তাদের দলে। আত্রাই জানে নদীকুলে সে অন্ত্যজ, তাই সে যেন সসংকোচে কখনো-বা দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে, কখনো-বা বিরাট একটা জলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সাহসে ভর করে কখনো আবার একটা কোনো গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অর্ধেক পথ পেরোতে-না-পেরোতেই কোনো কৃষাণের বাড়ির উঠোনের পাশ কাটিয়ে আবার লুকোয় বনজঙ্গলের ঝোপে ঝাড়ে। এঁকেবেঁকে হয়তো চলল অনেকখানি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়ো শহর, গঞ্জ কিংবা হাটের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলবার মতো সাহস নেই আত্রাইয়ের।

আত্রাইয়ের মন্থর গতিধারায় বজরা ভাসিয়ে চলতে চলতে আমার মন-মেজাজও যেন ঢিমেতালের ছন্দে বাঁধা হয়ে গেল। আর তাড়াহুড়ো নেই, নির্দিষ্ট গন্তব্যে যথাসময়ে পৌঁছবার জন্য ব্যাকুলতা নেই— ঘড়িবাঁধা সময়ের মাপে পদক্ষেপের প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেল। আরাম-কেদারাটা জানালার কাছে টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগলাম, ধীরে ধীরে কেমন করে দৃশ্য-পটের পরিবর্তন ঘটছে। নদীর দুই তীরে কত বিচিত্র রকমের মাছ ধরার জাল পাতা রয়েছে। ঝকঝকে পেতলের কলসি কাঁখে ছিপছিপে সব গাঁয়ের মেয়ে একমাথা ঘোমটা টেনে পায়ে-চলার পথ ধরে ঘাটে আসছে জল নিতে। ঘাটের একপাশে একদল উলঙ্গ ছেলে প্রচুর চেঁচামেচি হুটোপুটি করে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে। তাদের গণ্ডগোলে জ্বালাতন হয়ে একঝাঁক পোষা হাঁস যেন এ ঘাট ছেড়ে, ওপার লক্ষ্য করে ভেসে চলেছে। নদীর একটা বাঁক পেরোতেই দেখা গেল, সারি বাঁধা কঞ্চির বেড়া, তার গা বেয়ে উঠেছে শশা আর লাউ-কুমড়োর লকলকে সবুজ ডগা। বেড়ার ধারে গোবর-নিকানো ঝকঝকে একফালি উঠোন। তার আশেপাশে খড় দিয়ে ছাওয়া গুটিকতক কুঁড়েঘর আর সদ্য সদ্য খেত থেকে কেটে আনা ধানের আটি। এপাশে দুটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঢেঁকিতে ধান ভানছে। এই সব পাখিডাকা ছায়াঢাকা পল্লীগ্রামের পাশ দিয়ে চলতে চলতে, বাংলার সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের প্রাত্যহিক জীবন যেন ছবির পর ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল। খুবই একঘেয়ে সেই জীবন— পুরুষেরা কাস্তে কোদাল লাঙল নিয়ে উদয়াস্ত চাষের কাজ করছে, আর মেয়েরা সর্বক্ষণ ঘর-গৃহস্থালি নিয়ে ব্যস্ত। কালেভদ্রে পূজাপার্বণ আসে, যাত্রা কীর্তন হয়, ধূসর জীবনে একটুখানি যেন রঙের ছোঁয়া লাগে। এ-সব দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, এ দেখা চুরি করে দেখা। যাদের সঙ্গে আমার জীবনের ক্ষীণতম যোগ নেই, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের দিনযাত্রার খুঁটিনাটি দেখতে যাওয়া নিছক শখের কৌতূহল চরিতার্থ করা। আমার কেমন একটা সংকোচ হল, আমি বজরার ভিতরে ফিরে এলাম।

কিন্তু ভিতরে বসেও কি নিস্তার আছে? বাংলাদেশের এককোনায়, আত্রাই নদীর ধারে, এই পল্লীজীবনের ছবি আমার মনকে যেন পেয়ে বসল। সুদূর অতীতে মন মেলে দিলাম, সেখানেও দেখি সেই একই ছবি— পুরুষেরা চাষ করছে, মেয়েরা ধান ভানছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে

ভারতের ইতিহাস মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখলাম। কত ভাঙাগড়া, কত যে উত্থানপতন, কত ঝগড়া ভাইয়ে ভাইয়ে, কত বহিঃশত্রুর হানাদারি আক্রমণ। কিন্তু পল্লীর জীবনে কোনোকিছুই যেন দাগ কাটে নি, যেন একটা চিরাগত সনাতন পথে এই একঘেয়ে জীবন একই ভাবে চলছে যুগে যুগে, কালে কালে। সত্যিই কি একঘেয়ে? এই যে অপরিবর্তনশীলতা— এর মধ্যে কি একটা প্রতিরোধের শক্তি প্রচ্ছন্ন নয়? এদেশের ঐতিহ্যেও কি দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক কোনো নিয়মবন্ধন রয়েছে, যা বাইরের সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করে নিজেকে যুগ যুগ ধরে অবিকৃত রেখেছে? হয়তো আমি যে-শক্তির কথা অনুমান করছি তা কল্পনামাত্র, হয়তো এদেশের লোকের স্বভাবে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকারের পরিপন্থী, যা প্রকৃতিকে নিজের অনুকূল করে গড়ে তুলতে পারে না, বরঞ্চ প্রকৃতির হাতে গড়া পুতুলের মতো নিজেকে নির্বিরোধে সকল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে।

এইরকম কত শত কথা ভাবতে ভাবতে একটি গাঁয়ের ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম। গাঁয়ের মোড়লেরা আমায় সমাদর করে নিয়ে গেল তাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কোথা থেকে ভাঙা একটা বেতের চেয়ার জোগাড় করে আমাকে বসতে দিল বারান্দায়। নিজেরা মাদুর পেতে আমাকে ঘিরে বসল। তাদের সকলের পরনে খাটো ধুতি, হাঁটুর উপরে তোলা। নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি হুঁকো ঘন ঘন একহাত থেকে আর-এক হাতে ফিরতে লাগল। সব দেখেশুনে মনে হল যেন মধ্যযুগে ফিরে গেছি, যেন পল্লীসমাজের কোনো শক্ত সমস্যা আলোচনা করার জন্য পঞ্চায়ত বসেছে।

পাকা দাড়িওয়ালা এক গ্রামবৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'বাবুমশায়, এ-সব ব্যাপারে কথা বেশি বলা মানেই বাজে কথা বলা। স্বদেশী ছোঁড়ারা দেশের উন্নতি নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয় শুধু। আসল কাজের বেলা কারো টিকিটুকু দেখবার জো নেই। হাঁ, লেনিনের মতো একজন লোক দেশে জন্মাত, দেখতেন সব ঠিক হয়ে যেত।'

রূঢ় বাস্তবের মধ্যে আচমকা যেন ফিরে এলাম। চেয়ার ছেড়ে সোজা ফিরে গেলাম বজরায়।

বাবাকে যেমন দেখেছি

আত্মপ্রকাশের নানা ক্ষেত্রে বাবার অবিসংবাদী প্রতিভা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার চাইতে যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকে হয়তো করবেন। বাবা তাঁর নিজের বিষয়ে স্মৃতিকথা কিছু কিছু লিখেছেন, অন্তরঙ্গদের কাছে চিঠি লিখতে গিয়েও মনের কথা কিছু কিছু বলেছেন। একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাবা তাঁর জীবনস্মৃতিতে সাল-তারিখের বা ঘটনার অনুবর্তন করতে যান নি, যা বলতে চেয়েছেন সে হল তাঁর অন্তর্জীবনের উন্মোচন। যে ক্ষেত্রে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশই মুখ্য, সেখানে জীবনের মোটা মোটা ঘটনাবলি অনুধাবন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সাধারণ মানুষের জীবন দৈনন্দিন ঘটনাচক্রে বাঁধা, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিদিন দৈনন্দিনের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে থাকেন। প্রতিভার জগৎকে সব সময় বাস্তব জগতের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। সকল সৃজনধর্মী প্রতিভার বেলায়ই হয়তো এ কথা সত্য— কিন্তু বাবার বেলায় এ কথা যেন বিশেষভাবে সত্য। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুবিচিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক ঋষি। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাকে সম্যক বিশ্লেষণ করার যত চেষ্টাই হোক-না কেন, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সবটুকু রহস্য আয়ত্ত করা যায় না, কারণ সচরাচর আমরা মানুষকে বিচার করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকি, এ ক্ষেত্রে তা অচল।

হৃদয়ের যে-সব সুকুমারবৃত্তিকে আমরা মনুষ্যচরিত্রের প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলে মনে করি, বাবার মধ্যে সেগুলি ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু সবকিছু মিলে তাঁর স্বভাব ছিল জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তাঁর সংবেদনশীল মনে এমন একটা সহজাত দ্বিধা-সংকোচের ভাব ছিল যে ঠিক করে বলা যেত না, কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে তাঁর মন কখন কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। তাঁর মন-মেজাজ কখন কেমন থাকবে, বুঝতে পারা সহজ ছিল না। কখনো কখনো দেখেছি, তাঁর তরুণ ভক্তদের মাঝখানে তিনি বসে আছেন, গাম্ভীর্যের মুখোশ কখন খসে গেছে, হাস্যে পরিহাসে তাঁদের সঙ্গে রসালাপ করছেন, যেন তিনি তাঁদেরই

একজন। আবার যখন শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেকে নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিতেন তখন তাঁর গহন মনের অতল স্তব্ধতার থৈ পাওয়া দুঃসাধ্য হত। মন যখন খুশি থাকত, তখন দেখেছি, শিশুদের মধ্যে তিনিও একজন শিশু ভোলানাথ। তাঁর মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আবার তাঁর মতো দুরধিগম্য, যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার জীবনে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।

ঘন ঘন তাঁর মন-মেজাজ বদলাত বলে তাঁর সহচরদের পক্ষে তাঁর খেয়াল-খুশির সঙ্গে তাল রেখে চলা খুবই কষ্টসাধ্য হত। আমার কেমন যেন মনে হয় বাবা তাঁর নিজের কাছেও নিজের অনেক চিন্তা-ভাবনা গোপন করতে চাইতেন। নিজের মন অনেক সময় তিনি নিজেই জানতেন না— সুতরাং অপরে জানবে কী করে? বাবার যাঁরা কাছের মানুষ, যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁদের পক্ষেও ঠিক করে বলা মুশকিল হত কখন কিভাবে কোন কাজ তিনি করবেন। কোথায় কেমন আচরণ করবেন। নিজের অসুখবিসুখ, খাওয়া-দাওয়া, নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখসুবিধার ব্যাপারে তাঁর এমন সংকোচ ছিল, এবং অপরে কী মনে করবে এই নিয়ে তিনি এত বেশি ভাবতেন যে, নিজের ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করার জন্য তাঁকে নানা রকম ছলাকলার আশ্রয় নিতে হত। এমন অনেকদিন গেছে যখন এ-সব ব্যাপারে তাঁর ছেলেমানুষি দেখে প্রতিমা ও আমি কৌতুক বোধ করেছি।

আমার পিতামহ তাঁর এই সবকনিষ্ঠ ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখে তিনি নিশ্চয় গৌরব অনুভব করে থাকবেন। বোধকরি সেই কারণেই বাবার প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির সবচেয়ে ভালো ভালো ঘর বাবার বসবাসের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। তাতেও যখন কুলোল না, তখন জোড়াসাঁকোর হাতার মধ্যে বাবার জন্যে আলাদা বাড়ি তৈরি করার খরচ মহর্ষি দিয়েছিলেন। লাল ইটের তৈরি বলে এ-বাড়ির নাম হয় লালবাড়ি। বাবা কিন্তু এক বাড়িতে বেশি দিন থাকা একেবারে পছন্দ করতেন না, ঘন ঘন বাসা বদলাতেন। শান্তিনিকেতনে এমন দশ-বিশটা বাড়ি আছে যেখানে কোনো-না-কোনো সময়ে বাবা থেকেছেন। সাবেক কালের বাড়ি ছেড়ে, নিজের পছন্দমতো নূতন বাড়ি তৈরি করতে পারবেন

ভেবে, মহর্ষির কাছ থেকে টাকা পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। হাতে-কলমে কাজ করে, আমার জ্যাঠতুতো দাদা নীতীন্দ্র স্থাপত্যবিদ্যায় কিঞ্চিৎ অধিকার অর্জন করেছিলেন। বাবা প্রস্তব করলেন, বাড়ি হবে দোতলা এবং দুই তলাতেই থাকবে একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর। তা হলে কাঠের তৈরি স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশন খাটিয়ে হলঘরের মধ্যে যদৃচ্ছা ছোটো-বড়ো নানা আয়তনের কামরা বানানো যায়। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। আমরা যখন গৃহপ্রবেশ করতে যাব, দেখা গেল একতলা আর দোতলায় একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর ঠিকই তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই দুই তলার মধ্যে যোগাযোগের সিঁড়িটাই নেই!

পিতামহ বাবার উপর জমিদারি-পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু খরচপত্র নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি নিজেই। এই হিসাবের ব্যাপারে দেখেছি তাঁর কঠোর নিয়মনিষ্ঠা। একসময় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় দিনে বাবা হিসাবের খাতাপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মহর্ষির সামনে হাজির হতেন ও গতমাসের জমাখরচের আনুপূর্বিক হিসাব পড়ে শোনাতেন। মহর্ষির স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, হিসাব পড়ে শোনাবার সময় কোনো ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না, তিনি তখনই তা ধরে ফেলতেন ও জেরা করতেন। জবাব দিতে গিয়ে বাবাকে দস্তুরমতো গলদ্‌ঘর্ম হতে হত। শুনেছি মাসের দ্বিতীয় দিনটাকে বাবা খুব ভয় করতেন। স্কুলের ছেলেরা যেমন পরীক্ষা দিতে যায়, বাবা যেন তেমনি করে যেতেন মহর্ষির কাছে হিসাব দাখিল করতে। আমরা সব ছেলেমানুষেরা অবাক হয়ে ভাবতাম, আমাদের বাবা তাঁর বাবাকে এত ভয় পান কেন।

মহর্ষি জানতেন বাবা কবিতা লেখেন। তিনি যখন শুনলেন বাবা ভক্তিরসাশ্রিত অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, একদিন বাবাকে ডেকে সেগুলি তাঁকে পড়ে শোনাতে বললেন। একটির পর একটি কবিতা বাবা পড়ে চললেন, আর মহর্ষি নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পড়া শেষ হয়ে গেলে বাবা যখন নৈবেদ্য থেকে একটি ভক্তিরসাশ্রিত গান গাইলেন, মহর্ষির চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কবিতাগুলি পুস্তক-আকারে প্রকাশ করার জন্য তিনি তখনই বাবার হাতে টাকা তুলে দিলেন; সেই কবিতাগুলি একত্রে 'নৈবেদ্য' নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনেকগুলি কবিতা এই নৈবেদ্য বইয়ের কবিতার অনুবাদ।

ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবার আচরণে কঠোরতা ছিল না। তেমনি আবার অত্যধিক আদর দেওয়াও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। আমার তো মনে পড়ে না, বাবার হাতে আমরা কখনো দৈহিক শাস্তি পেয়েছি। মারধোর করা ছিল তাঁর প্রকৃতির বাইরে। ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে যুবা বয়সের সমস্ত বছর মিলিয়ে মাত্র তিনবার তাঁকে আমার উপর সত্যি সত্যি চটতে দেখেছি। ছোটো ছিলাম যখন, স্নান করাটা আমার কাছে বিভীষিকা বলে মনে হত। জোর করে ধরে শরীরটাকে আচ্ছা করে ঘষামাজা, আমার কাছে ছিল অত্যাচারের মতো। মা একদিন আমাকে স্নান করাতে না পেরে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বাবাকে আমার অবাধ্যতার কথা বলে দিলেন। বকুনি নেই, গালমন্দ নেই, বাবা দু-হাতে আমাকে ধরে উঠিয়ে দিলেন আলমারির মাথায়। এর পর থেকে আমাকে স্নান করানো নিয়ে মাকে আর বেগ পেতে হয় নি।

এর পরের ঘটনাটি ঘটেছিল শিলাইদহে। পরের দিন বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনের দিন। কে যেন আমাকে বলল, পদ্মার অপর পারে পাবনায় সেদিন নৌকাবাইচ হবে। ইছামতী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে নাকি হাজার হাজার প্রদীপের আলো দিয়ে সাজানো শতাধিক ভাসানের নৌকা এসে জড়ো হয়। প্রতিমা বিসর্জন হবার একটু আগে শুরু হয় নৌকাবাইচ। এই প্রতিযোগিতায় যে-সব নৌকা যোগ দেয় তাদের চেহারা অনেকটা জেলেডিঙির মতো— সরু আর লম্বা। প্রত্যেক নৌকায় বিশজন করে দাঁড়ি। আমি তখন থাকি পদ্মার ধারে। মার কাছ থেকে যে পাঁচটাকা করে আমার মাসিক বরাদ্দ ছিল, তার প্রত্যেকটি পয়সা জমিয়ে, আমি এক ডিঙি কিনেছি নিজে। সুতরাং আমাকে পায় কে, আমার ধারণা আমি একজন ওস্তাদ মাঝি। এ হেন আমি কি নৌকাবাইচ না দেখে থাকতে পারি? আমি তো ম্যানেজারবাবুকে অতিষ্ঠ করে তুললাম, বললাম ঘাটে আমাদের যে দুটো পানসি বাঁধা, তার মধ্যে যেটি বড়ো তাই নিয়ে আমরা ভাসান ও বাইচ দেখতে যাব। এই শরৎকালে পদ্মা পাড়ি দেওয়া ছেলেখেলা নয়, দস্তুরমতো বিপজ্জনক ব্যাপার। বর্ষার শেষে নদী কানায় কানায় ভরা— যেমন গভীর তেমনি খরস্রোতা। আর পদ্মার এপার থেকে ওপার তো প্রায় মাইল-সাতেকের ধাক্কা। তখন বুঝি নি যে আমাদের এই

নৌকাযাত্রা প্রায় শেষযাত্রায় পর্যবসিত হতে চলেছিল। যাক, সে পরের কথা। বাবাকে বলতেই বাবা রাজি হয়ে গেলেন। দুঃসাহসিক কিছু কাজে আমার উৎসাহ দেখলে তিনি নিষেধ করতেন না, জানতেন এইভাবেই ছেলেরা তৈরি হয়। শুধু বলে দিলেন সব ব্যবস্থা যেন ঠিক রকম হয়। পরদিন ভোরবেলায় পানসি ছাড়ল, মাঝিমাল্লারা 'বদর বদর' বলে দাঁড় ফেলল।

স্রোতের সে কী ধার! পাবনা পৌছতেই সারাটা দিন লেগে গেল। দূর থেকে আমরা দেখতে পেলাম, ইছামতীর মোহানায় যেন দেয়ালির আলো জ্বলছে। আমার মামা ও ম্যানেজারবাবু সঙ্গে এসেছেন। তাঁরা বার বার বলতে লাগলেন, এবার ফিরে যাওয়া যাক, কারণ বাবা বলে দিয়েছেন যেন রাত্রের খাবার সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই আমরা বাড়ি ফিরি। আমি তখন নাছোড়বান্দা, হাল ধরে বসে আছি। ইছামতীর মুখে পৌছে দেখি, নৌকা-বাইচ শুরু হল বলে। দুই সার বেঁধে একশোর উপর ডিঙি পাল্লা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার লোকের উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়ে বাইচ শুরু হল। কোথায় লাগে এই বাইচের কাছে কেম্‌ব্রিজ অক্সফোর্ডের বোট রেস্! পিছনে সূর্যাস্তের শেষ আভা যেন পশ্চাৎপট— সামনে খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো সরু পাতলা নৌকাগুলি বয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। বাংলা দেশের প্রাচীন অনেক ঐতিহ্যের সঙ্গে এইরকম নৌকাবাইচও সুদূর অতীতে লুপ্ত হয়ে গেছে। পরে শুনেছি, পাবনায় সে-ই নাকি শেষ নৌকাবাইচ, পরে এই খেলা হয় নি।

নৌকাবাইচের পর ভাসানের পালা। একটির পর একটি প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল। আমরা যখন উৎসব দেখতে মশগুল, লক্ষ্যও করি নি আকাশে তখন ঘন কালো হয়ে মেঘ জমছে। পানসির মুখ ঘোরানো হল, শিলাইদহের ঘাট কোন্‌দিকে হবে আন্দাজ করে। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে— মাঝিরা আর দিশা পায় না। তখনকার কালের রেওয়াজ মাফিক কয়েকজন বন্দুকধারী বরকন্দাজ আমাদের সঙ্গে এসেছিল। তারা মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল এই আশায় যে শিলাইদহের ঘাট থেকে তা হলে অন্য পাইক-বরকন্দাজরাও গুলি ছুঁড়বে এবং তা হলে সেই আওয়াজ শুনে আমরা বুঝতে পারব কোন্‌দিকে পানসি চালাতে হবে। সংকেত শেষপর্যন্ত কার্যকর হল, ওপার থেকে গুলির আওয়াজে জবাব

পাওয়া গেল। রাত তখন প্রায় দুটো বেজে গেছে। আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে, সেই দিক লক্ষ্য করে পানসি চলল অন্ধকার ভেদ করে। ঘাটে নেমে প্রথমেই দেখতে পেলাম, বাবা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত মুখের সামান্য একটুখানি দেখেই আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমি কেন, দলের সবাই যে খুব ভয় পেয়েছে স্পষ্টই বোঝা গেল। বাবা কিন্তু কারো দিকে না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলেই, কুঠিবাড়ির দিকে দ্রুতপদে ফিরে গেলেন। এই ঘটনার পরে যতদিন শিলাইদহে ছিলাম, বাবা এবিষয়ে উল্লেখমাত্র করেন নি, বকাঝকা তো দূরের কথা! আমার মতো ভুক্তভোগী অপরাধী আরো অনেকে বলতে পারবেন, এইরকম সময়ে বাবার নীরব তিরস্কার, শারীরিক শাস্তির চেয়ে কতগুণ কঠিন বলে মনে হত।

এর অনেক বছর বাদে, আমি যখন শান্তিনিকেতনে, এরকম আর-একটা কাণ্ড ঘটে। তখনো শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের পত্তন হয় নি। সুরুল গাঁয়ের কাছাকাছি বলে, ওই-সব অঞ্চলের নামও ছিল সুরুল। ঠিক হল কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক ও কর্মীদের নিয়ে আমরা সুরুলে গিয়ে বন-ভোজন করব। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি জীর্ণপ্রায় বড়ো কুঠিতে আমাদের চড়ুইভাতির সব আয়োজন হয়েছে। এককালে এই বাড়ি নাকি নীলকর সাহেব জন চীপ-এর বসতবাড়ি ছিল। সারারাত ধরে প্রচুর হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ করা গেল। শান্তিনিকেতনে যখন ফিরলাম মাস্টারমশাইরা সবাই অনিদ্রার ক্লান্তিতে অবসন্ন, সকালবেলার ক্লাস নেবেন এমন তাঁদের অবস্থা নয়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে ছুটি চাইতে সকলেরই সংকোচ। যে যার ঘরে চলে গেলেন, চোরের দায়ে ধরা পড়লাম আমি। যেহেতু বনভোজন হয়েছিল আমারই ব্যবস্থায়, সুতরাং আমাকেই আশ্রমের নিয়মভঙ্গের দায় নিতে হবে। মুখে একটু হাসি এনে, দুরুদুরু বক্ষে তো বাবার সামনে হাজির হলাম। বাবা শুধু বললেন, 'কেমন হল তোদের বনভোজন? খুব মজা করেছিস তো?' মনে মনে কত রকম অজুহাতের কথা ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু বাবার গলার স্বর শুনে সব যেন কোথায় উবে গেল— সুতরাং কোনো সাফাই না গেয়ে দ্রুত প্রস্থান! এর পর জ্ঞাতসারে এমন কিছু কখনো করি নি, যা বাবার বিরক্তির কারণ ঘটাতে পারে।

কবি ও লেখক হিসাবে বাবা যখন বিশ্ববিখ্যাত হলেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁচেছেন। কিন্তু জগৎ-জোড়া খ্যাতি হবার আগেও তাঁর ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও কলকাতার অধিকাংশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর নিয়মিত ডাক পড়ত। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে, তিনি কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, সুকণ্ঠেরও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে। একবার তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাপতি স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভায় তিলধারণের ঠাঁই ছিল না— লোকে লোকারণ্য। দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে গিয়ে গলার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করতে হল। বক্তৃতার পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী 'গান, গান' বলে বিস্তর চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। দেড়ঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দেবার পর, বাবার গান গাইবার মতো অবস্থা ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমবাবু স্বয়ং যখন অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাবার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি কী করে আর না বলেন। বাবার গান গাওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ— যেমন সুরেলা গলা, তেমনি তার জোর। কিন্তু এবারকার অত্যাচারে গলা এমন জখম হল যে তা আর কখনো সম্পূর্ণ সেরে উঠল না। কিছুদিন হাওয়া-বদল ও বিশ্রাম নেবার জন্য বাবা সিমলা গেলেন, কিন্তু তাঁর সেই গানের গলা আর ফিরে পেলেন না।

পোশাক-পরিচ্ছদে বাবার বরাবরই বেশ রুচি ছিল। তরুণ বয়সে তিনি ধুতির উপর সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি পরতেন। গলায় ঝোলাতেন সিল্কের চাদর। এই বাঙালিবাবুর পোশাকে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাত। লোকে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করত। বাংলা দেশের বাইরে তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন, তাঁর পরনে থাকত ট্রাউজার, গলাবন্ধ লম্বা কোট, অথবা আচকান, আর মাথায় থাকত ছোট্ট একটা পাগড়ি। এই ভাঁজে ভাঁজে শেলাই-করা পাগড়ি ছিল নতুন জ্যাঠামশাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবিষ্কার। লোকে এর নাম দিয়েছিল 'পিরালি পাগড়ি'। এর অনেক বছর পরে বাবা আচকানের বদলে, ঢিলেঢালা লম্বা জোব্বা ধরলেন। কখনো কখনো একটি জোব্বার উপর আর-একটি জোব্বা চড়ানো হত। মাথায় পরতেন নরম মখমলের উঁচু গোছের টুপি। রঙিন কাপড়ে বাবার কোনো বিরাগ ছিল না—

তাঁর পছন্দ ছিল ফিকে বাদামি বা কমলা রঙ। পরিণত বয়সে যাঁরা বাবাকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে এই-সব হালকা রঙের পোশাকে বাবাকে কী সুন্দর মানাত।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। বাবা ও গান্ধীজির মধ্যে বরাবর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, অথচ বাহ্যত দুজনের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল তফাত। কোথায় কটিবাসপরিহিত সন্ন্যাসী, আর কোথায় রঙিন জোব্বায় সুসজ্জিত কবি। দুজনের মধ্যে এই বৈষম্য বহু লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে সন্দেহ নেই। পোশাকে পরিচ্ছদে বাবার বিলাসী রুচি নিয়ে অনেকে বক্রোক্তি করেছেন, এমনও শুনেছি। কিন্তু একটা কথা তাঁদের জানা ছিল না, বাবার পোশাক-পরিচ্ছদ যে-সব কাপড়ে তৈরি হত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দাম বেশি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা গরিমা ছিল যে নিতান্ত শাদাসিধে পোশাকেও তাঁকে দেখাত রাজার মতো। আবার বেশ মূল্যবান পোশাকও তাঁর অঙ্গে উঠলে মনে হত যেন নিতান্তই শাদাসিধে। গান্ধিজির কটিবাস ছিল অন্নহীন বস্ত্রহীন এই দরিদ্র দেশের প্রতীক। এই প্রতীকের যে একটি গভীর তাৎপর্য ছিল তাতে সংশয় নেই। কিন্তু তা বলে বাবার সুরুচিসম্মত পরিচ্ছদের কোনো তাৎপর্য ছিল না এমন নয়। গান্ধিজি নিজের জীবনযাপনে যে আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন, তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে একটা মাত্রাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব এসে গেছে। এটা স্বয়ং গান্ধিজির অভিপ্রেত ছিল কি না জানি না, তবে এমনটি ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবা এরকম বৈরাগ্যসাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বাবা হয়তো ভাবতেন— আমাদের গরিব দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত ও বুভুক্ষিত, সেখানে ত্যাগের আদর্শ কৃত্রিম উপায়ে তুলে ধরার কোনো অর্থ হয় না। বরঞ্চ উচিত, তাবৎ সভ্যজগৎ জীবনধারণের ক্ষেত্রে যা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, সেই-সব দিকে মানুষের রুচিকে প্রবর্তিত করা।

বাবা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বেশির ভাগ সময়ে যেমন তীব্র ও অন্যায় সমালোচনার আঘাত সয়েছেন, তেমন খুব কম লেখককেই সইতে হয়েছে। এ-সব আক্রমণের অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত-বিদ্বেষপ্রসূত। যাকে সাহিত্যিক সমালোচনা বলে এ-সব সে ধরনের ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল নিছক কুৎসা। কোনো কোনো বাংলা কাগজে বা পত্রিকায় এই-সব কদর্য গালাগালি

নিয়মিত প্রকাশ করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তাতে সে-সব কাগজের কাটতি হত। সম্পাদকেরা বুঝেছিলেন, বাবার বিরুদ্ধে কটুকাটব্য করলে বেশ অর্থাগম হয়। এর পিছনে আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। দেশের বেশ বড়ো-একটা অংশের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন নন। তাঁর জন্ম অভিজাত পরিবারে, তাঁর লেখার ধরন ও ভাষা তাঁর নিজস্ব, অতীত কিংবা বর্তমানের কোনো লেখকের সঙ্গে তাঁর মিল নেই— তিনি যেন স্বয়ম্ভু। তা ছাড়া হিন্দুসমাজের বেড়া-ভাঙা প্রখ্যাত ব্রাহ্ম সংস্কারকের ছেলে তিনি, সুতরাং তিনি সমাজদ্রোহী। তরুণ বাঙালি-পাঠকদের মনে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন— বোধ করি এই-সব কারণে উক্ত সমালোচকেরা তা ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, নিন্দুকের দলে কেবল যে অপ্রধান লেখকেরাই ছিলেন তা নয়, এমন-সব সাহিত্যিকগোষ্ঠীও ছিল যার নেতৃস্বরূপ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো নামজাদা ব্যক্তি। এই বিরুদ্ধতা বাবার মনে যে দাগ কাটে নি, এমন কথা বলা ভুল হবে। বাবার সবচেয়ে বেশি বেজেছিল, যাঁদের তিনি মিত্রস্থানীয় বলে জেনে এসেছেন, যাঁদের সাহিত্যজীবনের প্রত্যুষে তিনি সঙ্গ ও উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে যখন লেখনী ধরলেন। বাবা এ-সব নিন্দাকুৎসার বিরুদ্ধে কোনো জবাব দিতে যান নি। কেবল 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতায় তাঁর মনের কথা একটুখানি ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু তাতেও কোনো উষ্মা ছিল না, তিরস্কার ছিল না।

তাঁর সমতুল্য প্রতিভাশালী অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখকদের মতো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনিও আজীবন নিঃসঙ্গ ছিলেন। তরুণ ভক্তদের মধ্যে অনেকে তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তাঁদের ভক্তির অর্ঘ্যই পেয়েছেন; চিত্তের ক্ষেত্রে সমানধর্মার সঙ্গ-সাহচর্য তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। কিন্তু তাঁর সেই একক জীবনে এরকম ভক্তিশ্রদ্ধার মূল্য ছিল অনেকখানি। এই-সব তরুণ ভক্তদের মধ্যে যাঁদের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম প্রভৃতি। এই-সব তরুণ কবি ও

লেখকেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় স্থকিয়া স্ট্রীটের এক বাড়িতে জমায়েত হতেন। এই বাড়িতেই কান্তিক প্রেসে 'ভারতী' পত্রিকা ছাপা হত। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তার তত্ত্বাবধান করতেন। এঁরা সত্যই ছিলেন বাবার একান্ত অনুরাগী ভক্ত। কেউ যদি বাবার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতেন, এঁরা রুখে দাঁড়াতেন, যেন বাবার সম্মান রাক্ষার দায়িত্ব কেবল তাঁদের উপরেই ন্যস্ত।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষা নিয়ে বাবা যে-পরীক্ষণের পত্তন করেছিলেন, তার জন্যে তাঁকে যে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছিল, সে কথা খুব কম লোকেই জানত বা বুঝত। বিদ্যালয়ের কাজ তো শুরু হল, কিন্তু ছাত্র সংগ্রহ করা সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে-সব ছাত্র এল, তাদের অনেকে ছিল, যাকে বলে, বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো দুরন্ত ছেলে। বেশ কিছু লোকের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি ছিল অসীম অবজ্ঞা। বিদ্যালয়ে বাবা যে-সমস্ত নূতন প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তিত করলেন, তা নিয়ে তাঁরা হাসাহাসি করতেন। এ বিদ্যালয় যে কেবল দুরন্ত ছেলেদের শায়েস্তা করার সংশোধনাগার নয়, এই বোধ জাগ্রত হয় অনেক পরে। তার উপর ছিল বিদ্যালয়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরাগ ও সন্দেহ। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠান 'স্বদেশী' ও রাজদ্রোহ প্রচারের কেন্দ্র। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা কোনো কোনো রাজকর্মচারীর কাছে গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে, সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছেলে না পাঠান। বৈষয়িক দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা চলে যে এইরকম প্রচেষ্টায় নামতে যাওয়া তখনকার অবস্থায় বাবার পক্ষে নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হয়েছিল। সে সময় নিজের পরিবার প্রতিপালনের দিক থেকেও তাঁর আয় যথেষ্ট ছিল না, তা ছাড়া কুষ্টিয়ার ব্যবসা ফেল পড়ায় বাজারে তখন প্রচুর দেনা। বিষয়সম্পত্তি, এমন-কি, আমার মার গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে তাঁকে বিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে। বিয়ের সময়ে যৌতুক-স্বরূপ তিনি যে সোনার পকেট-ঘড়ি ও চেন পেয়েছিলেন, সেটিও জনৈক বন্ধুর কাছে বিক্রয় করতে হয়। আমাদের শৈশবের অনেক স্মৃতি এই ঘড়ির সঙ্গে বিজড়িত। এই ঘড়ির বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে বলেছি।

বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাবা তাঁর বন্ধু লোকেন পালিতের বাবা স্যর তারকনাথ পালিতের কাছে হাত পাতলেন কিছু ঋণ পাবার উদ্দেশ্যে। পালিত মহাশয়ের জীবৎকালে এই ঋণ

পরিশোধ করা যায় নি। মৃত্যুকালে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, ফলে বাবাকে দেওয়া এই ঋণের টাকাটাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য হল। এই ঋণ নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সরস্বতীর প্রসাদ তিনি প্রভূত পরিমাণেই পেয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী তাঁকে কৃপা করেন নি। দুরদৃষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১৯১৬-১৭ সালে আমেরিকায় বাবার যে বক্তৃতা-সফর হয়, তার ফলে অর্থাগম হয়েছিল প্রচুর। এই সফরের ব্যাপারে বাবার ক্লান্তি ছিল না, তাঁর ধারণা হয়েছিল এ থেকে যেটাকা আসবে, তা দিয়ে শান্তিনিকেতনকে তিনি মনের মতন গড়ে তুলতে পারবেন, সব ধার শোধ হয়ে যাবে এবং আর কখনো কারো কাছে হাত পাততে হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ ক্ষেত্রেও তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূমিসাৎ করে দিল। যে সংস্থা এই বক্তৃতা-সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন, সফরের শেষ দিকে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলেন। বাবার পাওনা হয়েছিল, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। পিয়ার্সন সাহেব বহু কষ্টে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছিলেন, তা কয়েক হাজারের বেশি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেনা শোধ করতেই এই টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছিল, উদ্‌বৃত্ত আর কিছু ছিল না।

ইয়োরোপে যখন বাবার বইয়ের খুবই কাটতি তখন আশা করা গিয়েছিল, লক্ষ্মী ঠাকরুন এবার হয়তো মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু এমনি কপাল, যখন তাঁর নাম বিশ্ববিখ্যাত হল, জগৎজোড়া খ্যাতি জুটল, ঠিক সেই সময়ে লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ। সুতরাং রয়্যালটির টাকা সব আর হাতে এল না।

বাবাকে প্রায়ই বেরোতে হত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। ১৯২০ সালে যখন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি আমেরিকায় গেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেবার একটা বিধিমতো চেষ্টা হয়েছিল টাকা তোলার জন্য।

মিসেস উইলার্ড স্ট্রেট (পরে ডরোথি এল্‌মহর্স্ট) ও মিস্টার মরগেনথো (সিনিয়র)-র চেষ্টায়, ওয়াল্ স্ট্রীটের বেশ কয়েকজন লক্ষপতি চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্ক লিখে সই করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিছুকাল আগেও মরগেনথো ছিলেন তুরস্কে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত— সুতরাং শাসকমহলে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তা ছাড়া ওয়াল্ স্ট্রীটের সঙ্গেও তাঁর অনেক কাজ-কারবার ছিল। অর্থসংগ্রহের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বাড়িতে প্রকাণ্ড এক ভোজসভার আয়োজন করেন, শতাধিক লক্ষপতি বন্ধুবান্ধব

আমন্ত্রিত হলেন। শুনেছিলাম এই-সব চেষ্টার ফলে বেশ কয়েক লক্ষ ডলার নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব। শেষ পর্যন্ত যা হাতে এল তা কয়েক হাজার ডলার মাত্র।

বাবা যখন দেশে ফিরলেন, মন তাঁর ভেঙে গেছে। নিউ ইয়র্কের হট্টগোলের মধ্যে কেবলমাত্র অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় দীর্ঘকাল হোটেলে বসবাস তাঁর বিন্দুমাত্র ভালো লাগে নি। তাঁর সমস্ত চিত্ত গ্লানিতে ভরে গিয়েছিল। এই সময়ে অ্যান্ড্রুজকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর গভীর মনোবেদনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার পক্ষেও এ অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি। ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে যে আত্মগ্লানি ও লাঞ্ছনা আছে, বাবা সে-সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের খাতিরে ও আমার নির্বন্ধাতিশয়ে। পরে শুনেছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে ওয়াল্ স্ট্রীটের কুবেরের ভাণ্ডারে কুলুপ পড়েছিল ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে। ব্রিটিশ সরকার নাকি এমন আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতের বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা যদি টাকা ঢালে, তা হলে তা তাঁদের বিরক্তির কারণ হবে।

প্রতিষ্ঠানের জন্য বাবাকে বাধ্য হয়ে এখান্ থেকে ওখান থেকে টাকা চাইতে হয়েছে, কিন্তু বিত্তশালীদের কাছে হাত পাততে, বাবার বরাবরই একটা গভীর সংকোচ ছিল। যে মুহূর্তে তাঁর একটি কথার অপেক্ষা, সেই মুহূর্তে কিছুতেই তিনি যেন টাকার কথা বলতে পারতেন না। জেনেভায় থাকাকালে একবার বোম্বাইয়ের একজন বিত্তশালী বন্ধুর মধ্যস্থতায় বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে বাবার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। কথা হল, বাবা তাঁর কাছে একটা মোটারকম দান চাইবেন। বন্ধু বললেন, গাইকোয়াড়ের সঙ্গে লজান্-এ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তিনি বাবার কাজের সম্বন্ধে আগ্রহশীল দেখে, এ বিষয়ে কিছু আভাসও তাঁকে দিয়ে রেখেছেন। বাবা যদি গাইকোয়াড়কে একটিবার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন ও কথাটা উত্থাপন করেন, তা হলে এমন একটা মোটা অঙ্কের দান বরোদার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, যাতে নাকি শান্তিনিকেতনের খরচপত্রের বিষয়ে তাঁকে আর দুর্ভাবনা ভোগ করতে হবে না, ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটবে। আমি লজান্-এ গিয়ে বাবার হয়ে মহারাজাকে জেনেভায় আমাদের হোটেলে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে এলাম। লাঞ্চ-টেবিলে আলাপ বেশ জমে উঠেছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে

বাবা ও মহারাজার কথাবার্তা চলছে। আমি ও আমার বোম্বাইয়ের সেই বন্ধু ক্রমাগত উসখুস করছি, কিছুতে আর আসল কথাটুকু পাড়বার সুযোগ পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত বাবা আমাদের মুখচোখের অবস্থা দেখে নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে মহারাজার কাছে তাঁর পশ্চিমে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, আর বললেন, গাইকোয়াড যদি-বা তাঁকে অর্থসাহায্য করতে মনস্থ করেন, তা হলে যেন মনে করেন টাকাটা একপ্রকার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বাবার মুখে এই কথা শুনে বন্ধু টেবিলের তলায় আমার পায়ে পা ঠেকিয়ে ইশারা করলেন, ভাবখানা এই 'দেখলে তো, কর্তার ব্যাপারখানা।' মহারাজা বাবার কথা শুনে একটি কথাও বললেন না, বিদায় নিয়ে যখন চলে গেলেন, অর্থসাহায্যের কোনো কথাই তুললেন না।

শেষ পর্যন্ত মহাত্মাজিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন, বাবার মতো কবি-মানুষের পক্ষে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, কি গভীর দুঃখের বিষয়। ১৯৩৬ সালে বাবা গেছেন দিল্লি, উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়ে বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে টাকা তোলা। সে সময় গান্ধিজিও দিল্লিতে ছিলেন। তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বভারতীর তহবিলে এমন কী ঘাটতি, যার জন্যে এই পরিণত বয়সে বাবাকে এত কষ্ট সইতে হচ্ছে। বাবা দিল্লি ছাড়বার আগে, মহাত্মাজি তাঁর হাতে বিশ্বভারতীর ঋণশোধের জন্য যত টাকার দরকার, সেই অঙ্কের একটি চেক তুলে দিলেন। টাকাটা কোনো ভক্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। চেক বাবার হাতে দিয়ে গান্ধিজি বললেন, যেন আর টাকার ধান্দায় বাবাকে ঘুরে বেড়াতে না হয়।

মহাত্মাজির কাছ থেকে এই টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে আমাদের সকলের মনে তো আনন্দ ধরে না। কিন্তু বাবার মুখ দেখে মনে হল, কেমন যেন বিমর্ষ। কেন যে তাঁর মন খারাপ বুঝতে দেরি হল না। গান্ধিজির দেওয়া অর্থে সদ্য অর্থকষ্টের একটা উপশম ঘটল, কিন্তু বিনিময়ে গান্ধিজি বাবাকে দিয়ে যে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিলেন, বাবার পক্ষে তা হল খুবই কষ্টের। অভিনয়ের দলবল নিয়ে তিনি যখন বেরোতেন, শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট হত সন্দেহ নেই, কিন্তু নৃত্যে গানে রূপে রসে তাঁর সৃষ্ট নাট্যবস্তু দর্শকদের সামনে

নিজ হাতে তুলে দিতেন— সৃষ্টিকর্তার এই পরম আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা যেন তাঁর আত্মপ্রকাশকেই ক্ষুণ্ণ করা।

তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় সংগীত ও অভিনয়কে বাবা বরাবরই খুব বড়ো স্থান দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল, আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতিকে জাগ্রত করা— শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। তাতে মানুষ পূর্ণতার আস্বাদ পায় এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই পূর্ণতার সাধনা— এখানেই ছিল তার নিহিতার্থ ও সত্যকার তাৎপর্য। শহর থেকে দূরে পল্লী-পরিবেশে যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন, এর বাণী এককালে বহুবিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল— গানে, ছবিতে, নৃত্যনাট্যে ও অভিনয়ে। যদি বলি বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতে জনগণের রুচি উন্নত করায় শান্তিনিকেতনেব দান নগণ্য নয়, তা হলে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে না।

দুরদৃষ্ট আজীবন বাবার সঙ্গী হয়ে ঘুরেছে। কিন্তু অবিচলিত চিত্তে অদৃষ্টের পরিহাসকে তিনি মেনে নিতে পারতেন; তিনি ছিলেন আশাবাদী, তাঁর মনে ছিল আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যে-সব দুঃখ তিনি সয়েছেন, অর্থকষ্ট তো তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। তাঁর সংসার-জীবনে প্রথম আঘাত এসেছিল যখন তাঁর বয়স মাত্র একচল্লিশ। সৃজনপ্রতিভার সূর্য যখন তাঁর মধ্যগগনে, সেই সময়ে মায়ের মৃত্যু হল, পাঁচটি সন্তান নিয়ে তিনি যেন অকূল পাথারে পড়লেন। অবশ্য আমার দুই বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ছোটো ভাইটির বয়স তখন মাত্র বছর সাতেক।

এই সময়ে বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, অন্য লোক হলে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারত কিনা সন্দেহ। নিজের ছেলেমেয়েদের তো বটেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শতাধিক ছেলেদের মানুষ করার দায়িত্ব তখন তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, আরো আঘাত তাঁকে সইতে হল। মায়ের মৃত্যুর পর একে একে চলে গেলেন আমার পিতামহ, আমার দুই বোন ও ছোটো ভাই শমী। আমার দুই জ্যাঠতুত দাদা বলেন্দ্র ও নীতীন্দ্রকে বাবা নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। এঁরাও মারা গেলেন অকালে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যে-দুজন তাঁর কাজের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী ও সহায় ছিলেন সেই তরুণ কবি সতীশচন্দ্র রায় ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ মোহিতচন্দ্র সেন

অল্পকালের মধ্যে পর পর মারা গেলেন। মৃত্যুশোকে ও অর্থকষ্টে তিনি যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে দুরারোগ্য অর্শব্যাধিতে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। এই-সব সময়ে দুঃখ বহন করবার সে অসীম ক্ষমতা ও শক্তি তাঁর মধ্যে দেখেছি, তার তুলনা বিরল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তাঁর চিত্তের স্থৈর্য একদিনের জন্যও শিথিল হয় নি, তাঁর সৃষ্টির কাজে একদিনের জন্যও ছেদ পড়ে নি। বরঞ্চ দুঃখে শোকে তাঁর রচনায় একটা যেন গভীরতর তাৎপর্য এনে দিয়েছিল।

বাবার কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় আমার সেজো জ্যাঠামশায়ের তত্ত্বাবধানে যে শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল, তাতে বাবার বিধিদত্ত স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এক পেশাদার পালোয়ানের কাছে তিনি কুস্তিও শিখতেন। এই-সব কারণে যুবা বয়সে বাবার স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মতো। যেখানেই যেতেন তাঁর দেহের শ্রী ও মুখের লাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যৌবনে তিনি তাঁর নরম দাড়ি সযত্নে ছেঁটে রাখতেন, গুচ্ছ গুচ্ছ অলকে তাঁর মাথার চুল থাকত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। পরে যখন দাড়ি লম্বা হল ও আগুল্‌ফলম্বিত ঢিলেঢালা জোব্বা হল তাঁর পরিধেয়, সেই সময়ে পশ্চিমদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় কতবার শুনেছি— 'ঠিক যেন যিশুখ্রীস্ট !'

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও এক অর্শের কষ্ট ছাড়া তাঁর শরীরে ব্যারামের কোনো উপসর্গ দেখি নি। ১৯১২ সালে অস্ত্রোপচারের ফলে অর্শ থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। শেষ বয়সে জরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি একপ্রকার পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দিন শুরু হত ভোর চারটে থেকে— আধো-আলো-অন্ধকারে। লেখার টেবিলে বসার আগে আধঘণ্টা কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি সময় তিনি চুপ করে বসে থাকতেন যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। প্রাতরাশের সময় সঙ্গে দু-চারজন লোক না থাকলে তাঁর মনখারাপ হয়ে যেত। এই প্রাতরাশের ব্যাপারটা হত এত সকাল-সকাল যে, যাঁদের প্রাত-রাশে যোগ দেবার কথা তাঁরা প্রায়ই যথাসময়ে উপস্থিত হ'তে পারতেন না। এরকম ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতেন। এই সময়টাতে বাবা থাকতেন বেশ খোশমেজাজে— নানা রকম হাসিতামাশা গল্পগুজবে সবাইকে মাত করে রাখতেন।

আমার খুবই আশ্চর্য লাগে, কী করে তিনি, লেখার কাজ নিয়ে যখন ব্যস্ত,

তখনো লোকজনদের সঙ্গে সমানে দেখাসাক্ষাৎ ও তাঁদের আপ্যায়ন করে চলতেন। তাঁর লেখার অভ্যাসটাও ছিল বিচিত্র— অনেক সময় একই সঙ্গে কবিতা, গান, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখে চলেছেন— এমন হয়েছে। অতিথিদের উৎপাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সেক্রেটারিদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। অতিথি, সে যে-কেউই হোন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য যা-ই থাক-না কেন, বাবা তাঁকে বসিয়ে রাখা পছন্দ করতেন না। সেক্রেটারিরা অনেক সময় এজন্য তিরস্কৃত হতেন। বাবা দিনের বেলা কখনো বিশ্রাম করতেন না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, বাইরে যখন আগুনে হাওয়ার হলকা বইছে, তিনি সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে নির্বিকারচিত্তে নিবিষ্ট মনে তাঁর লেখাপড়ার কাজ করে চলেছেন— এ দৃশ্য আমরা নিত্য দেখেছি। বই পড়ার ব্যাপারটা সচরাচর রাত্রে হত। এজন্য সময়ের অকুলান কখনো ঘটত না, কারণ তিনি শুতে যেতেন বেশ রাত করে। চার থেকে পাচ ঘণ্টা ঘুম তাঁর পর্যাপ্ত ছিল। অন্যান্য নানা কাজ, অতিথি-সৎকার, ইত্যাদির পরেও যে তিনি এত অজস্র লিখতে পারতেন, এর কারণ আর কিছুই নয়, মনকে অভিনিবিষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা। ভাবনাচিন্তার খেই তিনি কিছুতেই যেন হারাতেন না। অতিথিসমাগম হয়েছে, কবিতা লেখা মুলতুবি রেখে, ঘণ্টাখানেক অতিথির সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ সেরে তিনি আবার রচনায় হাত দিতেন, যেন কোথাও কোনো ছেদ পড়ে নি। অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে গেলেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখি নি। তাঁর কবিতার নীচে স্থান ও তারিখ যে-সব উল্লেখ আছে তার থেকে বোঝা যায়, বহু বিচিত্র ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর ক্লান্তি অপনোদনের এক উপায় ছিল গান লেখা ও সেই গানে সুর দেওয়া। শেষ বয়সে গানের স্থান কতকটা নিয়েছিল ছবি-আঁকা।

আমার কর্তাদাদামহাশয় দ্বারকানাথ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে যখন বিলাত গিয়েছিলেন, সঙ্গী ছিলেন তাঁর এক আত্মীয় নবীনবাবু। ইনি দ্বারকানাথের সেক্রেটারির মতন কাজ করতেন। দেশে নবীনবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বিলাতে কর্তার কাজকর্ম সামলানো তাঁর পক্ষে প্রায়ই কেমন দুরূহ হত— বাবুমশায়ের খেয়ালখুশির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই— 'Babu often changes his mind'। আমাদের পরিবারের নবীনবাবুর এই উক্তি প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌচেছিল। তার অন্যতম কারণ এই যে নবীনবাবুর এই

উক্তি প্রিন্সের কনিষ্ঠ পৌত্রের বেলায় যেন আরো লাগসই হয়েছিল। হঠাৎ কোনো ব্যবস্থা পালটে দিয়ে বাবা নিজের সাফাই দেবার জন্য প্রতিমাকে বলতেন, 'দেখ বউমা, Babu changes his mind'। আমরা অবশ্য তাঁর মতিগতির বিষয়ে খানিকটা ওয়াকিফহাল ছিলাম— যদিও এজন্য আমাদের কম ভুগতে হয় নি। এ নিয়ে অনেক মন কষাকষি হয়েছে, এমন-কি, মাঝে মাঝে তো রীতিমতো বিপদে পড়তে হয়েছে বাবার এই খেয়ালিপনার দরুন। বাবার কল্পনাপ্রবণ মন কোনো কিছুকেই চরম বলে মেনে নিতে পারত না, বরঞ্চ একটা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এলেই, তিনি সেটা পালটে দেবার জন্য অস্থির হয়ে কোনো একটা অজুহাত খুঁজে বের করতেন। স্থাণু অবস্থা তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, ঘন ঘন বাসস্থান, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বদলানোর মধ্যে, এমন-কি, তাঁর নানাবিধ রচনার মধ্যেও এই পরিবর্তনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে তাঁর মনটা ছিল বিপ্লবধর্মী— তবে প্রবণতা ছিল গড়বার দিকে, ভাঙবার দিকে নয়। সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায়, সামাজিক প্রথায়, শিক্ষায়, রাজনীতিতে— যা-কিছু বিচারসহ না হয়েও সর্বজন-স্বীকৃত, তার বিরুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার মিথ্যার মুখোশ কঠোর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। অপর পক্ষে, তিনি বিকল্পে সর্বজনগ্রাহ্য কী ব্যবস্থা হতে পারে তার কথা বিশদভাবে বলেছেন। আর কেউ সাহস করে কাজে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লেও, নিজে সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। এই যে প্রচলিত রীতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নূতনতর আদর্শ ও ধারণা নিয়ে পরীক্ষা— এ ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

তাঁর মনের আশ্চর্য প্রাণশক্তি আমাদের বারবার বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বৃদ্ধবয়সে লোকে যখন অভ্যস্ত খাতে গা ভাসিয়ে চলতে চায়, ঠিক সেই সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি দুঃসাহসিক পরীক্ষায় রত হয়েছেন ও নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যখন তিনি কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে কাব্যরচনার সংকীর্ণ রাস্তা ছেড়ে বেড়াভাঙা ছন্দের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে পা দিলেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। সেই সময়কার লেখা কিছু কিছু গল্পে তিনি এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যাকে মনোবিকলনতত্ত্বের ভাষায় বলা চলে যৌনসমস্যা। হয়তো এ-সব গল্প পড়ে কোনো কোনো রক্ষণশীল পাঠকের সুকুমার মনে আঘাতও লেগে থাকবে। কবিতার দিক থেকে যা তাঁর

শেষ রচনা সে-সব তিনি নিজের হাতে লিখে যেতে পারেন নি। তখন তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ, তিনি অসুস্থ ও শয্যাগত। কবিতার প্রেরণা যখন এসেছে, মুখে মুখে রচনা করেছেন— তাঁর সেই মুখের কথা লিখে নিয়েছেন সেবক-সেবিকাদের কেউ কেউ। এই-সব রচনাতেও দেখি কবিতার রূপ নিয়ে, কত রকম পরীক্ষা।

কোনো জীবনীই তাঁর জীবনের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারবে বলে তো মনে হয় না, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন বিরাট তেমনি জটিল। অন্য দিকে আবার গানের সুরে যেমন মীড়, বীণার তারে যেমন ঝংকার, তেমনি মধুর ছিল তাঁর জীবনের ব্যঞ্জনা। সমানধর্মা ও সমানুভূতিবিশিষ্ট কেউ যদি কখনো কলম ধরেন, তা হলে হয়তো তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন। বস্তুত তাঁর নিজের রচনাই তাঁর জীবনের প্রকৃষ্ট ভাষ্য, সেখানেই তিনি সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করে গেছেন। তাঁর একটি কবিতায় তিনি সে কথা বলেও গেছেন :

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

. . .

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

—

সংযোজন

On the Edges of Time-এ গৃহীত রচনা ও সেগুলি অবলম্বনে বাংলা প্রবন্ধ ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রথীন্দ্রনাথ বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— সংযোজন অংশে তার কয়েকটি পুনর্মুদ্রিত হল। এর কোনো-কোনোটির বিষয়বস্তু মূল গ্রন্থেও অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে সে-সকল প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে; এইজন্য কোনো-কোনো স্থলে কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও এগুলি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হবে আশা করা যায়।

পল্লীর উন্নতি

যৌবনের প্রারম্ভেই আমার পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি কার্যভার পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন তাঁকে জমিদারি চালনা করতে হবে। সে সময় জমিদারি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল; সেগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো— বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন বিভিন্ন জেলায়; পাবনায় শাহাজাদপুর, রাজশাহিতে কালীগ্রাম ও নদিয়াতে বিরাহিমপুর। এ ছাড়া উড়িষ্যায় ছিল আরও তিনটি ছোটো ছোটো জমিদারি।

এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে। শিলাইদহে ছিল বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। কাজের সুবিধার জন্য বাবা শিলাইদহে তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র করলেন। সেখান থেকে শাহাজাদপুর ও কালীগ্রামে নদীপথে সহজেই যাওয়া যায়।

শিলাইদহ পদ্মানদীর ধারে, সেখানে থাকত 'পদ্মা' বোট। বাবা এই বোটে করে কুষ্টিয়া, কুমারখালি, শাহাজাদপুর, পতিসর ও অন্যান্য যে-সব জায়গায় আমাদের কাছারি ছিল, যাতায়াত করতেন।

বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই, জলপথে প্রায় সব স্থানেই যাওয়া যায়। বোটে করে খাল বিল নদী বেয়ে ঘুরতে বাবা ভালোবাসতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের তাঁর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশকে ভালো করে জানা, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া। জমিদারি দেখার কাজ তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পীড়াজনক হয়ে উঠত যদি-না এই সূত্রে গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ তাঁর হত।

গ্রামের ও গ্রামবাসীদের অবস্থা বাবাকে কতখানি বিচলিত করেছিল, সেই সময়কার তাঁর লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্যা যে সমগ্র দেশের সমস্যা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উন্নতির উপর, দেশসেবা মানেই যে লোকসেবা, এই-সব কথা বারবার নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, গ্রামের দুরবস্থা জানিয়ে তার প্রতি-কারের ব্যবস্থা সম্বন্ধ সচেষ্ট হবার জন্য বারবার তাদের মনকে নাড়া দেবার প্রভূত প্রয়াস করেছেন।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী শোচনীয় তার বর্ণনা ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে তিনি দিয়েছিলেন—

'গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই। যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে,... পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই,... তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুমূ্ল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত;... অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচাব উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।'

বহু বছর ধরে গ্রামজীবনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই যথাযথ বিবরণ পাবনা সম্মিলনীতে দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে জেনে এবং সকলকে কেবল জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে অবধি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে তিনি নিজে কী করতে পারেন সে বিষয় অহরহ চিন্তা করেছেন, এক-একটি সমস্যা নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন।

আমার পিতা গ্রামের উন্নতির জন্য কতখানি ভাবছেন, কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের জন্য কী কী উপায় স্থির করেছেন আমি প্রথম জানলুম ১৯১০ সালে। আমি তখন আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান

শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কী উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালির মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

'স্বদেশী সমাজ', 'সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় তিনি সর্বসাধারণকে. বিশেষত কংগ্রেসের নেতাদের, দেশসেবার কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য অনুনয় করেন। তিনি বলেন—

'দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব ? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্ম-শক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।'

অন্যত্র লিখেছেন—

'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এইখানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'

ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমতো তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। যখন দেখলেন দেশবাসী তাঁর কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং তিনি দেশসেবার যে কর্মপদ্ধতি তাদের সামনে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমলোচনাই হতে থাকল, নেতারা কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনাতেই মেতে রইলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমতো তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিন জনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবা-মাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।

শিলাইদহে কিছুদিন থেকে সেখানকার কাজকর্ম বোঝানো হয়ে গেলে বোটে করে তাঁব সঙ্গে নিয়ে গেলেন পতিসরে। যাবার পথে রোজ সন্ধেবেলায় বোটের ডেকের উপর বসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত। আমি তাঁকে আমার কলেজের পড়াশুনার কথা বলতুম— বাবা ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনতেন। তার পর তিনি বলতেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা— বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কী শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবনযাপনের কতরকমের সমস্যা লক্ষ্য করেছেন, এই-সব সমস্যার প্রতিকারেব তিনি কী চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরো কী করতে ইচ্ছা করেন। জমিদারি চালনার ভার দেবার শুরুতেই আমি গ্রামোন্নতি-প্রণালীর শিক্ষা বাবাব কাছ থেকে এইভাবে পেলুম।

বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশি বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম— এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি কবে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপিলের সুযোগ দেবারও বাবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপিল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে— আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমতো রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা।

আদালতের সাহায্য ছাড়া বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত

অনায়াসে চলেছিল। ছোটো বড়ো কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গবর্নমেণ্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে।

এই বিচার প্রবর্তিত হবার বহু বছর পরে আমাকে যখন পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহ বা পতিসরে যেতে হত আমার বেশির ভাগ সময় যেত প্রজাদের আপিল বিচার করতে। তাদের মকদ্দমা অধিকাংশ জমিজমা-সম্পর্কিত। আমি আশ্চর্য হতুম সামান্য অশিক্ষিত কৃষকদের আইন-জ্ঞান দেখে। তাদের সঙ্গে যুঝতে আমাকে বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট ভালো করে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে একদল উকিলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এরা অশিক্ষিত গ্রামেরই লোক, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতার জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। নিতান্ত অক্ষমদের, বিশেষত মেয়েদের, মামলা চালানো তাদের ব্যাবসা হয়ে গিয়েছিল।

জমিজমা বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মকদ্দমার বিচার সব সময়ে যে আমাকে করতে হত তা নয়। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকজনক আরজিও উপস্থিত হত, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে হাসা চলে না, গম্ভীরভাবে আমাকে রায় দিতে হত। শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পত্তি ভাইয়ে-ভাইয়ে ভাগ হবে, একটিমাত্র পুকুর তাকে দু-ভাগ কী করে করা যায়, না করলেও উপায় নেই, একই ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে জায়েদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগে, ফলে রান্না হয় না, ভাইদের মধ্যে কেউই খেতে পায় না— বিচিত্র কত-না নালিশ শুনতে হত।

বোটে যেতে যেতে বাবা আমাকে বোঝাতে লাগলেন— তিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেটুকু সম্ভব তাই করছেন, কিন্তু গ্রামসংস্কারের কাজ জমিদারির কর্মচারিদের দ্বারা হয় না। সেইজন্য তিনি ঠিক করেছেন, শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকজন শিক্ষককে শিলাইদহ ও পতিসরে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপরেই বিশেষভাবে এই কাজের ভার থাকবে।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। কুষ্টিয়া কুমারখালি প্রভৃতি শহরের সান্নিধ্যে প্রজাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তারা স্বাভাবিক সরল মনোভাব হারিয়েছে, নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেলেই সন্দেহ

করে। কয়েক বছর চেষ্টা করেও সেখানে বিশেষ কিছু করতে পারা যায় নি। একমাত্র কুষ্টিয়াতে তাঁদের বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছিল।

এই কারণে কালীগ্রাম পরগনাতেই তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগনাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরগনার সমস্ত প্রজারা মিলে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে— তার নাম হয়েছে 'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা'। তা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও নির্বাচন করেছে। শান্তিনিকেতন থেকে যে কর্মীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের কেন্দ্র হবে এক-একটি বিভাগে।

প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা করতে হয় নি, তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে।

কালীগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়— প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কী কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভায়

এই দুটি হল প্রধান কাজ— আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনার কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য, বাবা বললেন, এস্টেট থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ ফণ্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা দরকার, হিতৈষী সভা আপাতত কেবল কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পেরেছে, তার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হল প্রধান। সারা পরগনার মধ্যে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই পূর্বে ছিল না। অবস্থাপন্ন লোক তাদের ছেলেদের নাটোর আত্রাই বগুড়া প্রভৃতি শহরে পাঠাত ইস্কুলে পড়াবার জন্য। হিতৈষী সভা দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরাজি ও পতিসরে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেছে। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাসের ঘর নির্মাণ করার মতো টাকা সাধারণ ফণ্ড থেকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা এস্টেটের খরচে সেগুলি তৈরি করে দিয়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন ছিল। ঐ অঞ্চলে কোথাও একটিও পাস-করা ডাক্তার ছিল না। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়— তার পর ক্রমশ অন্য দুটি বিভাগেও ডাক্তারসহ ডিস্‌পেনসারি স্থাপিত হল। কর্মচারিদের চিকিৎসার জন্য এস্টেট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়। পতিসরে চিকিৎসালয় বেশ ভালো হয়েছে এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী দৈনিক চিকিৎসার জন্য আসে।

কালীগ্রাম পরগনা চলনবিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যখেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক-একটি দ্বীপের মতো। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধানখেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে।

সাধারণ ফণ্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ— সাধারণ ফণ্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও, বুজে যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষী সভা ক্রমশ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে।

আমেরিকায় যে তিন-চার বছর কলেজে পড়েছিলাম সেই সময়ে বাবা জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা কিছুই জানতুম না। বাবা যখন গল্পচ্ছলে এই-সব কথা আমাকে বলতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতুম। সব-শেষে বললেন, 'আমি যে-সব কাজ করতে চেয়েছিলুম কিন্তু এখনো হাত দিতে পারি নি, তোকে সেগুলি করতে হবে— বিশেষত কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।'

বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষিরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা money crops করা যায় কিনা তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষিদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখানো হল। শিলাইদহের দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কী কী খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটো-খাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটারি গড়ে তুললুম। চাষিদের মধ্যে ক্রমশ উৎসাহও দেখা গেল, আলু আখ টমেটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশ বাড়তে লাগল। সারের অভাব কী করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিক ভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-

এক সময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ নিকারিরা নিতে চায় না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।

শিলাইদহ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেলুম। কিন্তু পতিসরে সে সুযোগ নেই, দেশটা নিতান্তই একফসলে; বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে আর জল নেমে গেলে মাটি শুকিয়ে এত কঠিন হয়ে যায় যে লাঙল চলে না। সেইজন্য রবিশস্য কিছুই হয় না; এমন-কি, গাছপালাও জন্মায় না। বাবা কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও কালীগ্রামে আবাদের কী উন্নতি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করতে ছাড়েন নি। ১৩১৫ সালে তিনি কোনো কর্মীকে লিখছেন—

> ‘প্রজাদের বাস্তবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়-যোগ্য। শিমুল আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।··· কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।’

অনেক চেষ্টার ফলেও কালীগ্রামে চাষবাসের বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয় নি। কয়েক বছর পরে একটা সুযোগ পেলুম। উত্তর বঙ্গ বন্যার সাহায্যার্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক টাকা তুলেছিলেন। দুঃস্থদের সাহায্য করার কাজ শেষ হয়ে গেলে এই ফণ্ডে কিছু টাকা উদ্‌বৃত্ত থেকে গিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে আত্রাইতে স্থায়ীভাবে একটি খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, কয়েকটি ট্র্যাক্টরও কেনা হয়। ট্র্যাক্টর কেনার উদ্দেশ্য ছিল, বন্যাতে অনেক গোরু মরে যাওয়ায় লাঙল চালাবার উপায় ছিল না, আচার্য-দেবের কাছ থেকে পতিসরের জন্য একটা ট্র্যাক্টর চেয়ে নিলুম। আমাদের দেশে তখনো ট্র্যাক্টরের চলন হয় নি। ট্র্যাক্টর তো পেলুম কিন্তু চালক

পেলুম না। নিজেই চালাতে লাগলুম। আমেরিকায় আমার অভ্যাস ছিল এ কাজের— ক্রমশ কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামের একটি ছোকরাকে চালানো শিখিয়ে দিলুম। আমার আশঙ্কা ছিল ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করলে ধানখেতের আলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সীমানা নিয়ে চাষিরা গোলমাল করবে। ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করার পরীক্ষা যেদিন হবে সে একটা স্মরণীয় দিন কালীগ্রাম পরগনায়। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক জমে গেল এই দানবীয় মেশিনটার কাজ দেখার জন্য। তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধানখেতে। কয়েকজন চাষিকে জিজ্ঞাসা করলুম, আলের উপর দিয়ে লাঙল না চালিয়ে তো উপায় নেই— আল বাঁচিয়ে ছোটো ছোটো খেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল, 'ভাবনা নেই ; আপনি আলের উপর দিয়ে চাষ দিয়ে যান, আমরা কোদাল নিয়ে থাকব, সঙ্গে সঙ্গে আল আবার বানিয়ে নেব।' প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকেরা খুব খুশি। ট্র্যাক্টর পতিসরেই থাকবে স্থির হল। আমি জানালুম, চাষ করে দেবার জন্যে বিঘাপ্রতি এক টাকা খরচা হিসাবে নিয়ে ভাড়া দেওয়া হবে। তার পর থেকে ট্র্যাক্টরের চাষ সর্বত্র চলতে লাগল, এবং সেটা ভাড়া নেবার জন্য চাষিদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হল— আগামী বছরে আরো ট্র্যাক্টর আনিয়ে দেব।

বছরের বেশ কয়েক মাস চাষিদের কোনো কাজ থাকে না। এই সময় হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে। বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালীগ্রামে ভালো তাঁতি ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে কয়েকঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতে কাপড় বোনা শেখবার জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল, সাধারণ ফণ্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়ন-শিক্ষার ইস্কুল খোলা হল। এই সময়ে বাবা আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'বোলপুরে একটা ধানভানা কল চল্‌চে— সেইরকম একটা কল এখানে

[পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ— বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়।···এই কলের সন্ধান দেখিস্।

'তার পরে এখানে চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা।···

'আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে।

'নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।

'যাই হোক ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্— ভুলিস্ নে।'

বাবার আমলেই কালীগ্রাম পরগনায় কয়েকটি ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাবাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। তারা যে-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পাবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। পাঠশালা ইস্কুল তাড়াতাড়ি খোলবার জন্য রেষারেষি পড়ে যেত। প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সাধারণ ফণ্ডের সমস্ত টাকাই বোধ হয় তারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করে ফেলত। বাবাকে এই বিষয়ে প্রজাদের উৎসাহ অনেক সময় সংযত করতে হত। পাঠশালা ক্রমশ বাড়তে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যে পরগনার প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাঠশালা স্থাপিত হল। এইসঙ্গে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাই স্কুল খোলা হল। বর্ষাকালে চার দিক জলে ডুবে যায়, পতিসরে গেলে দেখতুম নৌকা বোঝাই করে ছাত্ররা আশেপাশের গ্রাম

থেকে ইস্কুলে পড়তে আসছে। কলকাতার ইস্কুল-কলেজের যেমন নিজেদের বাস্‌ রাখতে হয়, কালীগ্রামের ইস্কুলগুলির তেমনি কয়েকখানা করে নৌকা থাকত।

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে— শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি— কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারে নি, দূর করার ক্ষমতা ছিল না বলে।

জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ্য করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রাম-বাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পান নি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়— কিন্তু সুদের হার এত বেশি, আর সুদের সুদ আদায় হত বলে আসল কোনোদিনই শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজন-মতো কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দু-একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা— ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮ টাকা সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিক

ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১০৮০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কী করবেন। সুরেনদাদা [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল, বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন-কি, কয়েকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness-এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না— নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারে নি।

হিতৈষী সভার কাজ কিন্তু বছরের পর বছর চলতে থাকল। মাঝে অনেকদিন পতিসরে যেতে পারি নি— বিশ্বভারতীর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। এমন সময় মহাযুদ্ধের প্রকোপ ঘরের কাছে এসে পড়ল। জাপানিদের ভয়ে বাংলার নদীগুলোতে যতরকমের জলবাহন ছিল গভর্মেণ্ট সেগুলি সব ডুবিয়ে দিতে লাগল। পদ্মা বোটে আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকতুম। ভয় হল কোন্‌দিন বোটটা কেড়ে নিয়ে যায়। বোটটি বাঁচাবার জন্য গঙ্গা বয়ে আগাগোড়া নদীপথে পতিসরে যাবার জন্য রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছে নিশ্চিন্ত বোধ হল। তখনকার মতো পদ্মা বোট রক্ষা হল— কিন্তু বাবা ও মহর্ষির বিশেষ প্রিয় এই বজরা বোটটিকে শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখতে পারলুম না। যুদ্ধের সময় কাঠ ও লোহার অভাবে সময়মতো মেরামত করা গেল না, একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে নিঃশেষ হয়ে গেল। শিলাইদহ, শাহাজাদপুর বা পতিসরে যখনই বাবা থাকতেন পদ্মা বোট না হলে তাঁর চলত না।

সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাই স্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম— নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে-সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানা রকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গভর্নমেন্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষিরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরো ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?'

১৩১৫ সালে বাবা লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—

'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়— তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।

বাবার আর-একটি লেখার কথা তখন মনে পড়ে গেল—

'তার পরে মাটির কথা— যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ

যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও তো আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।'

আচার্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশের সঙ্গে আমার পিতার যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমি নিতান্ত শিশু। পরিচয় ক্রমশ যখন বন্ধুত্বে পরিণত হল তখনো আমি বালক। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার স্মৃতি তাই বাল্যস্মৃতির সঙ্গেই বেশি জড়িত।

জগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে আমার পিতাকে লিখেছিলেন, 'তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম…'।

জগদীশচন্দ্র ইয়োরোপ-ভ্রমণের পর কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস্ তাঁর বইয়ে লিখেছেন, পৌঁছ-সংবাদ পেয়ে আমার পিতা তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি বাড়িতে নেই। তখন তাঁর টেবিলে একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল রেখে আসেন। দ্বিতীয়বার যখন দেখা করতে যান দুই বন্ধুর কিরকম মিলন ঘটেছিল তার বর্ণনা গেডিসের লেখায় পাওয়া যায় না, আমার স্মৃতিপটে তার আবছায়া ছবি এখনো জেগে আছে। বিলাত থেকে ফিরে কিছুদিনের জন্যে ধর্মতলার এক বাড়িতে জগদীশচন্দ্র ছিলেন। সে বাড়ি সম্ভবত আনন্দমোহন বসুর ছিল। আমি তখন ন-বছরের শিশু; তবু, কেন জানি না, পিতা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুই বন্ধুতে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা বুঝতে পারা বা মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি; এইটুকুই কেবল মনে পড়ে: জগদীশচন্দ্র উচ্ছ্বসিতভাবে ইয়োরোপ-ভ্রমণের কাহিনী অনর্গল বলে যাচ্ছেন আর আমার পিতা সাগ্রহে তা শুনছেন এবং মাঝে মাঝে দু-জনে মিলে খুব হেসে উঠছেন। গল্প বোধ হয় আরো অনেকক্ষণ চলত, আমার দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে আমার পরিশ্রান্ত মুখের ভাব দেখেই হয়তো পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুর কাছ থেকে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন।

এই সময়ে পিতার উপর জমিদারি দেখার ভার ছিল। তাঁকে প্রায়ই শিলাইদহে যেতে হত। শীতের সময় তিনি পদ্মানদীর বালির চরের ধারে বোট বেঁধে বাস করতেন। তখন তিনি প্রথমে সাধনার পরে ভারতীর সম্পাদনা করছেন। প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে। পদ্মার দিগন্তব্যাপী বালির চরে খুব নিভৃত কোনো স্থানে বোট বাঁধা থাকত।

লোকজন সেখানে যেতে পারত না। গল্পের পর গল্প লিখে গেছেন এই পরিবেশে। ছোটোগল্প লেখাতে উৎসাহ দিতেন জগদীশচন্দ্র।...

আমার পিতা যখন শিলাইদহে বোটে থাকতে যেতেন আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন।...

আমার ছেলেবেলাকার শিলাইদহের স্মৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মধুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

তার পর মনে পড়ে বুদ্ধগয়ার কথা। ১৯০৪ সাল হবে। জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতাসহ বুদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন; পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমশ দলটি বেশ বড়ো হয়ে গেল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা), আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার—কেউ বাদ পড়লুম না। আমরা বুদ্ধগয়ার মোহান্তের অতিথি হব ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের, বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয় নি, উত্তম দুধ ঘি ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সব সময়েই প্রস্তুত। যখনই ফাঁক পেতুম, উঠোনে বৃহৎ ইঁদারা ছিল, তার ভিতরে নেমে গিয়ে বসে থাকতুম। এরকম ইঁদারা ইতিপূর্বে দেখি নি। ইঁদারার বাইরের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ির মতো গ্যালারি নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে। তার মাঝে মাঝে জানলা আছে। গরমের দিনে সেখানে বসে বড়ো আরাম।

রোদ পড়ে গেলে সন্ধের দিকে সকলে মিলে মন্দির দেখতে যাই। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর ও লালুকর্তা দুজনেরই ফোটো তোলার শখ; তাঁদের সঙ্গে ছোটো বড়ো নানা রকম ক্যামেরা ছিল; দিনের আলো থাকতে কোনো সময় গিয়ে তাঁরা বহু ফোটো তুলে রেখেছিলেন। (সে ফোটোগুলি আছে কিনা জানি না)। মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিকে নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'— বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন।

কয়েকটি জাপানি তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন; আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি। কী গভীর তাঁদের ভক্তি। ইষ্টপূজার কী অনাড়ম্বর প্রণালী। অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে মোহান্তের পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলুম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এঁদের মধ্যে কার পূজা খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন? মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারো আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।

বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই। সেই অল্প বয়সে বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য বা বয়স্কদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। না থাকলেও এই তীর্থস্থানে দুর্লভ সৎসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ফেরবার সময় সকলে মিলে গয়া স্টেশনে যাওয়া হল। সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়, তাই বিভিন্ন ট্রেন ধরতে হবে। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র বম্বে মেলে কলকাতায় যাবেন— সেই ট্রেনই প্রথম এল। দৌড়াদৌড়ি করে কোনো কামরাতেই জায়গা পেলেন না। প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় দেখা গেল দুটি লোক, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতীয়কে তারা ঢুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-একজন স্টেশনমাস্টারের কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে

তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে দেখি ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্বজাতি-দুটিকে বেশ তিক্তমধুর ধমক দিচ্ছেন। ধমক খেয়ে সাহেবেরা অবশেষে গাড়ির দরজা খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু শেষমুহূর্তে কোনোরকমে উঠে পড়লেন।

ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রজ্বলিত মূর্তি। কিছুতেই আত্ম-সংবরণ করতে পারছেন না; সেই মুহূর্তেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবে যেন স্বস্তি পান। তাঁর সেই রাগ পড়তে-না-পড়তে আর-একটা ট্রেন এসে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে পশ্চিমের দিকে। দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা—একটিতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্যটিতে একটিমাত্র ভারতীয় পুরুষ। যে-কামরায় ইংরেজ মহিলা ছিলেন, আমরা নিবেদিতার মালপত্র সেই কামরায় তুলে দিতে গেলে তিনি বললেন: 'I am not going in there।' অগত্যা অন্য কামরায় নিয়ে গেলুম। আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই ভদ্রলোকটি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতার জন্য তাঁর নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় নিবেদিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন: 'Now, you see the difference between the barbarous Englishmen and the civilized Indians'।

আমি যখন আমেরিকার কলেজে পড়ছি, জানতে পারলুম জগদীশচন্দ্র আমেরিকা-পরিভ্রমণে আসছেন। কয়েকটি ইউনিভার্সিটি বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেছে। এই খবর পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। তখনই ছুটলুম আমার কলেজের ডীনের কাছে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে আনতেই হবে আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁকে জানালুম। ডীন ড্যাভেনপোর্ট পণ্ডিত মানুষ, বিজ্ঞানজগতের যথেষ্ট খবর রাখেন। আমি তাঁর ক্লাসে পড়ি, ছাত্র হিসাবে আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। সহাস্যে বললেন, তুমি যা চাও তাই হবে। সেই শুনে আমিও জগদীশচন্দ্রকে চিঠি লিখলুম যে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেলে তিনি যেন উপেক্ষা না করেন; হার্ভার্ড, ইয়েল প্রভৃতির মতো বিখ্যাত না হলেও তিনি এই অপেক্ষাকৃত ছোটো বিদ্যায়তনে সমঝদার শ্রোতা হয়তো বেশি পাবেন। মোট কথা তাঁর আসা চাই-ই। জবাব পেলুম তিনি শীঘ্রই আসবেন। আমি তখন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান-মহলে

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে মহা উৎসাহে প্রচার করতে লেগে গেলুম।[১] এত উৎসাহ, এত আনন্দ, এত আয়োজনের পর যখন আচার্যের আসবার সময় নিকটবর্তী হল, আমি পড়লুম অসুস্থ হয়ে। ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন একটা আরোগ্যভবনে পনেরো দিন ধরে তাদের ব্যবস্থাধীনে নিরাময় হবার জন্য। সাত দিন সেখানে থেকে আমি পালিয়ে এসে সটান হাজির হলুম স্টেশনে, জগদীশচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণীকে অভ্যর্থনা করে তাঁদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাবার জন্য। তার পরদিনই প্রথম বক্তৃতা। সকালবেলায় জগদীশচন্দ্র আমাকে বললেন: 'আমার বক্তৃতাব সঙ্গে যে experimental demonstrations থাকবে তাতে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। চলো, সায়ান্স লেকচার হলে যন্ত্রগুলি খাটিয়ে রাখি ও তোমাকে দেখিয়ে দিই কী করতে হবে।' আনন্দে অধীব হয়ে উঠলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল আমার সহপাঠীরা কী ঈর্ষার চোখেই-না আমাকে এর পর দেখবে। নানা রকম অত্যাচার উপদ্রবে গাছগাছড়া কিরকম সাড়া দেয় সে-সব দেখাবার জন্য জগদীশচন্দ্র কয়েকটি আত্যাশ্চর্য যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। লজ্জাবতীর পাতায় কোনোরকম আঘাত লাগলে তার পাতা গুটিয়ে যায়, তা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যে-কোনো গাছেই আঘাত লাগলে তার আর্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া আছে, যদিও আমরা তা দেখতে পাই না। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে, গাছ কিসে কিরকম সাড়া দেয় কালো পরদার উপর একবিন্দু আলোর কম্পন দেখে আমরা তা অনায়াসে বুঝতে পারি। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি যখন কোনো experiment দেখাবার জন্য থামতেন— আগ্রহের সঙ্গে পরদার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যে মুহূর্তে আলোর রেখা আশানুরূপ নেচে উঠত তিনি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন: 'There, there, there!' আমিও তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতুম— ভুলচুক কিছু করি নি।

---

১ এই প্রসঙ্গে অবলা বসু মহোদয়া রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তা উদ্‌ধৃত হল।—

'রথী শরৎবাবুর কাছে অধ্যাপক মহাশয়ের বিষয় একটা চিঠি লিখিয়াছেন; তাহাতে জানা গেল যে Illinois হইতে ওঁকে Oct মাসে lecturer করিয়া নেবার খুব সম্ভাবনা আছে। হয়ত রথী আপনার কাছেও লিখিয়াছেন। এটা সুসংবাদ বটে।' (২০ মার্চ ১৯০৮)

'রথী ওঁর lecture দেবার সম্বন্ধে খুব খাটিয়াছে, ফলে এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে যে উনি সব রাখিতে পারিলেন না, কেবল ৫।৬টা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন।'... (২০ নভেম্বর ১৯০৮)

আমার আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর যখনই দেখা হত জগদীশচন্দ্র বলতেন, 'তুমি আমার ল্যাবরেটরিতে কবে যোগ দিতে আসছ?' শান্তি-নিকেতনে তখন আমার ডাক পড়েছে, জগদীশচন্দ্রের অনুরোধ রাখতে পারি নি। সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ কতকগুলি আমাকে দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারে সেগুলি এখনো আছে।

গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙের 'মায়াপুরী'তে জগদীশচন্দ্র থাকতেন। তার কাছেই গ্লেন ইডেনে আমাদের বাসা। যে বছরের কথা বলছি তখন জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়। আমার পিতা ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতেন। কাব্যালোচনা বিশেষ হত না। পিতৃদেবের কাছ থেকে যেন জগদীশচন্দ্র শুনতে চাইতেন দার্শনিক প্রসঙ্গ। বেশ বোঝা যেত তাঁর মনের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার তাঁকে যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারছে না। প্রচলিত ধর্ম্মমতও পুরোপুরি গ্রহণ করতে তার বৈজ্ঞানিক মন সায় দিচ্ছে না। তাই ক্রমাগত কবিকে প্রশ্ন করতেন, তাঁর সাধনার ফলে তিনি কী উপলব্ধি করেছেন। বিজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী অনেক বিচার-প্রমাণের জটিল রাস্তায় ঘুরে ফিরেও যে মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন না— কবি বা সাধক হয়তো তাঁদের সহজ অন্তর্দৃষ্টির গুণে অনায়াসে তার সন্ধান পেয়েছেন। এই ধরনের একটি বিশ্বাস হয়তো তাঁর হয়েছিল এবং এইজন্যই আমার পিতাকে এ বিষয়ে তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন করতেন।

দার্জিলিঙেই সেই শেষ দেখা। তাঁর মৃত্যুর সময় আমরা কলকাতায় ছিলুম না।

রামগড় পাহাড়

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের কথা মনে পড়ছে। ২৫শে বৈশাখে জন্মোৎসব যথারীতি হয়ে গেছে, শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে অধ্যাপক-ছাত্র সকলে যে যার বাড়ি চলে গেছেন। ছুটির মধ্যে গরমের কষ্টভোগ না করে বাবা স্থির করলেন রামগড় পাহাড়ে গিয়ে থাকবেন। দার্জিলিং, নৈনিতাল, আলমোড়া, সিমলা প্রভৃতি এত খ্যাতনামা শৈলাবাস থাকা সত্ত্বেও আমরা রামগড়ের মতো অচেনা-অজানা পাহাড়ে যেতে গেলুম কেন তার কৈফিয়ত বোধ করি দেওয়া দরকার।

বছরখানেক আগে একদিন খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়ল। নৈনিতালের কাছে রামগড় নামে এক পাহাড়ের উপর একটি বাগানবাড়ি বিক্রি আছে। বাড়িটার নাম স্নো-ভিউ। বাগান মস্ত বড়ো, তিনশো বিঘা জমি নিয়ে আপেল, পেয়ারা, পীচ, খোবানি, আখরোট প্রভৃতি ভালো ভালো ফলের গাছ লাগানো। একেবারে তৈরি বাগান, ভারি লোভ হল কিনতে। সেইদিনই সন্ধের ট্রেনে ছুটলুম সেই বাগিচার সন্ধানে। রামগড় কোথায় জানা ছিল, কেদারবদরীর হাঁটাপথে যেতে ওখানকার একটি ছোটোখাটো হোটেলে বহু পূর্বে একবার রাত্রিবাস করেছিলুম ; জায়গাটি কাঠগুদাম থেকে আলমোড়া যাবার পুরানো পথের ধারে একটি চটি মাত্র। সাহেবরা তখন ওই অঞ্চলে শিকার করতে প্রায়ই যেত বলে সাহেবদেরই কোনো পেনসনভোগী বাবুর্চি সেখানে হোটেল খুলেছিল। কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্নো-ভিউ জানবার কোনো উপায় তাড়াহুড়োর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারি নি। একরকম করে খুঁজে বের করতে পারব ভরসা নিয়ে কাঠগুদামে ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রামগড়ের উদ্দেশে সকালবেলায় বেড়িয়ে পড়লুম। রামগড় কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল, সবটাই চড়াই, ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠেছে সাত হাজার ফুট উপরে। পাহাড়ি ঘোড়া অক্লেশে এই চড়াই ভেঙে আমাকে নিয়ে চলল। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে সহিসকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সদর রাস্তা ছেড়ে শীঘ্র পৌছানো যায় এমন পাকদণ্ডী আছে কি ?' সে ঘোড়ার মুখ ধরে পাইন-বনের ভিতর দিয়ে একটা চলাপথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আমাকে

ভরসা দিল, 'ঘোড়া এখন ঠিক নিয়ে যাবে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এই চড়াই ঘোড়ার সঙ্গে সমানে আমি উঠতে পারব না।' বনের মধ্যে দিয়ে অজানা পথে একাই চললুম। পথ আর ফুরোয় না, উঠছি তো উঠছি। বেলা বাড়তে লাগল, বারোটা বাজল, একটা বেজে গেল, ঘোড়া তবু চলছে। পথ হারিয়ে ফেলেছে মনে করে যখন হতাশ হয়ে পড়েছি তখন হঠাৎ দেখি পাহাড়ের শিখর ডিঙিয়ে অপর দিকে এসে পড়েছি— সামনে বরফের পাহাড়শ্রেণী চোখের সামনে ঝকঝক করছে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের উপর বসে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলুম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অনতিদূরে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ি যখন আছে, এখানে লোকজনেরও সন্ধান মিলবে মনে করে এগিয়ে গেলুম। বাড়ি বন্ধ, তবে বাগানে দু-একজন মালি কাজ করছিল। তারা বলে দিল এইটাই স্নো-ভিউ। ঘোড়া তা হলে আমাকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাগান সব দেখলুম। ভারি ভালো লাগল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করল।

আহারের সন্ধানে গেলুম হোটেলে। সেখানে রাত কাটিয়ে তার পরদিন বিল দিতে গিয়ে দেখি পকেটে যা টাকা আছে হোটেলের খরচ দিয়ে যা বাঁচবে তাতে কলকাতায় ফেরবার ট্রেনভাড়া কুলোবে না। তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, যথেষ্ট টাকা আনা হয় নি। সোনার আংটি ও হাতের ঘড়ি বাঁধা রেখে হোটেলের মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে কোনো রকমে কলকাতায় ফিরে আসি। বাবাকে জায়গাটার বর্ণনা দিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্নো-ভিউ কেনা হয়ে গেল। নামটা বাবার পছন্দ হল না। বদলে তিনি নতুন নাম দিলেন 'হৈমন্তী'।

পরের বছর গ্রীষ্মাবকাশে সকলে মিলে সেই প্রথম যাওয়া হল 'হৈমন্তী'তে। দিনেন্দ্র ও মুকুল দে -কে নিয়ে আমি কিছুদিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম হিমালয় ভ্রমণে। বদরিকাশ্রম তীর্থদর্শন করে যখন রামগড়ে এলুম তখন দেখি 'হৈমন্তী' বাড়ি-ভর্তি। বাবার সঙ্গে অনেক লোকজন। আমাদের পরিবারের সকলে তো আছেই, তা ছাড়া লখনৌ থেকে এসেছেন কবি অতুল-প্রসাদ সেন ও পরে এলেন সি. এফ. অ্যানড্রুজ। বাড়ি জমজমাট, দিনেন্দ্রের আগমনে আরো জমে উঠল। গল্পগুজব, হাসি ও গানের বিরাম রইল না। আহারাদির প্রাচুর্যের অভাব হয় নি। নিজেদের বাগান থেকেই পর্যাপ্ত

পরিমাণে শাক-সবজি ও নানাবিধ ফল যথেষ্ট আমদানি হতে লাগল। এত স্ট্রবেরি কখনো খাই নি, খেয়ে শেষ করতে পারা যেত না বলে স্ট্রবেরির টক, স্ট্রবেরি দিয়ে মুগের ডাল— নানান উপায় আবিষ্কার করতে হত ফলগুলি সদ্ব্যবহার করার জন্য।

সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ— এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ। 'হৈমন্তী'তে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন— বাবা নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাঁধতে লাগলেন।

বাগানের এক কোণে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মতো ছিল। সকালবেলায় সেখানে আমাদের আড্ডা বসত। স্থানটি অতি সুন্দর, সকলের ভারি পছন্দ। পিছনে পাহাড় খাড়া উঠে গেছে, চুড়ো পর্যন্ত গভীর বনের আচ্ছাদন। তাতে বড়ো বড়ো পুরানো ওক গাছ, তার ডালপালা মস্-এ ঢাকা, আর তারই মাঝে কত রকমের অর্কিড ফুল ফুটে থাকে। আমরা বসতুম উত্তর-মুখ করে। সেদিকটা খোলা। বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সামনের পাহাড়গুলি যেন ঢেউয়ের মতো এগিয়ে চলেছে তিব্বতের দিকে। ঢেউগুলি যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সেখান থেকে আকাশ ভেদ করে উঠেছে তুষারাবৃত পর্বতমালা প্রাচীরের মতো দিগন্ত ব্যেপে। কেদারনাথ, বদরীনাথ, নন্দগিরি, পঞ্চচুলি— আরো কত হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গশ্রেণী তাদের তুষারোহে অঙ্গ বিস্তার করে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে, তাদের অলৌকিক সৌন্দর্যে আমাদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। যে-পাহাড়ের গায়ে আমরা বসে থাকতুম, তার ঢাল দ্রুত নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্যন্ত। নদীর জল দেখা যায় না— কেবল কানে এসে পৌঁছায় তার ক্ষীণ ঝিরঝির শব্দ।

নতুন গান কী বাঁধা হয়েছে শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে বসে থাকি। অতুলবাবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাবা দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোকে কাল যেটা শেখালুম, তুই-ই গেয়ে দে না, আমার কি ছাই এখন মনে আছে।' দিনেন্দ্র গান ধরেন, একটা শেষ হলে আর-একটা, অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে

পুরানো গান থেকে গাইতে বলেন তাঁর যেগুলি বিশেষ ভালো লাগে। বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে বলেন, 'তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও, আমরা এবার তোমার গান শুনি।' অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান। বনমালী যতক্ষণ না 'খেতে যে হবে' বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় না।

মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ একদিন বাবাকে অনুরোধ করলেন— 'আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ওই গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন।' বাবা বললেন—'সেটা যে দিনুকে এখনো শেখানো হয় নি, তা হলে আমাকেই গাইতে হয়।' বাবা গাইলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।
সুন্দর হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'বে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর॥

সকাল বেলায় ঘাসের উপর তখনো শিশির লেগে আছে। পুব দিকের পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ে রৌদ্র-ছায়ায় লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতায়। প্রকৃতির সেই প্রফুল্লতা, গানের কথা, গানের সুর— সব মিলে একটি অপরূপ রস সৃষ্টি করল। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বারবার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয়, তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর একবার শোনবার জন্যে আকুল হয়ে পড়েন।

বাবা প্রতিদিন নতুন গান রচনা করতে লাগলেন আর আমরা বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে আখরোট গাছতলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম। বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তাঁর গানে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠত। অতুলপ্রসাদের গলা যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরনও ভারি সুন্দর। সবচেয়ে ভালো লাগত তিনি যে-আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন। বাবা ও অতুল-প্রসাদ দু-জনেই যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন দিনেন্দ্রনাথের পালা শুরু হত। দিনের পর দিন এইরকম গানের উৎসব চলত সারা সকালবেলা।

আমার সঙ্গে মুকুল দে গিয়েছিল বদরিকাশ্রমে। ফিরে এসে সেও থেকে গেল 'হৈমন্তী'তে। তখন তার বয়স অল্প, বালক বললেই হয়, আর্টিস্ট মহলের পাকা খাতায় তার নাম তখনো ওঠে নি। মুকুলের শখ হল শিকারে যায়। সে শুনেছিল সাহেবরা রামগড়ের পাহাড়ে বন্যজন্তু শিকার করতে আসে। রামগড়ের আশপাশের জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের অভাব নেই, মুকুলের আবদারে কান পাতি না দেখে সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হল। শিকারের সরঞ্জাম বন্দুক, রাইফেল কিছুই আমার কাছে নেই শুনেও সে দমে গেল না। কয়েকদিন আমাকে আর কিছু বলে না দেখে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম। তার পর হঠাৎ একদিন কোথা থেকে একটা গাদাবন্দুক জোগাড় করে এনে ধরল শিকারে যেতেই হবে। বন্দুকের মালিক হল আমাদের মুনশি, যার উপর হৈমন্তী'র বাড়ি ও বাগানের তদারকের ভার ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হল, মুনশি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। সমস্ত দিন ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো হল, কপালক্রমে কোনো হিংস্র জানোয়ারের দর্শন মিলল না। দর্শন পেলে যে শোচনীয় অবস্থা হত সে কথা লেখা বাহুল্য। জলের ধারে কোথাও কোনো পায়ের দাগ দেখলেই মুকুল লাফিয়ে ওঠে 'দাদা, পেয়েছি, এইবার পেয়েছি।' কিন্তু কোনো জ্যান্ত জীব সশরীরে আমাদের সামনে হাজির হয় না। আমি মনে মনে বলতে লাগলুম ভগবানের কী দয়া! সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে আমরা বাড়ির দিকে ফিরলুম। অদূরেই বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শেষ পথটুকু যেতে পা আর চলে না। এত শ্রান্ত বোধ হতে লাগল যে আমরা তিনজনে একটা বুড়ো ওক্ গাছের তলায় পা ছড়িয়ে গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে পড়লুম। একটু বসেছি আর মাথার উপরের ডালের মধ্যে

কিসের শব্দ শুনতে পেলুম। শঙ্কিত হয়ে যেই দাঁড়িয়ে উঠেছি একটা মস্ত বড়ো ভাল্লুক অকস্মাৎ সেই ডাল থেকে ঝপ্‌ করে মাটিতে পড়ে দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমাকে পিছন থেকে কে জাপটে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। বন্দুকটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না। ভাল্লুকটা খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল, আমি মুকুলের হাত থেকে বন্দুক ছাড়িয়ে নিতে যখন টানিটানি করছি তখন ভাল্লুকটা কি মনে করল জানি না, সম্ভবত কৌতুকবোধ ক'রে হবে, যেন অবজ্ঞার হাসি হেসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিশ্রাম করা চুলোয় গেল, পা চালিয়ে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এলুম। এই ঘটনার পর মুকুল আমার কাছে শিকারের নামও আর করে নি যতদিন রামগড়ে ছিল।

'হৈমন্তী' বাড়ির ছাদ দিয়ে এক জায়গায় জল পড়ত। একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হল সেটা মেরামত করার জন্য। আমি একদিন দেখলুম সে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করে আর তার সমস্ত শরীর তখন কেমন কাঁপতে থাকে। আমার ভয় হল সে ওই অবস্থায় ছাদ থেকে গড়িয়ে না পড়ে যায়। বাবাকে জানাতে তিনি বললেন, এই ব্যামোকে St. Vitus's Dance বলে। মিস্ত্রিকে বাবার কাছে নিয়ে গেলুম। সে বাবাকে জানাল, জন্মাবধি তার এই রোগ। বাবা আমাকে বললেন, 'এই ব্যামোর হোমিওপ্যাথি একটা ওষুধ আছে, বইতে পড়েছি, তবে সারবে কিনা জানি না, আমি কখনো ব্যবহার করি নি।' তিনি ওষুধ দিলেন। দিনকয়েক বাদে মিস্ত্রি যখন কাজ করতে এল তার এই ব্যামো সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

আর যায় কোথা! প্রত্যহ রোগী আসতে লাগল। সকাল বেলায় বাবাকে রীতিমতো ডিস্‌পেনসারি খুলে বসতে হল। মুখে মুখে রটে গেছে চারদিকে চিকিৎসকের যশ। স্থানীয় পোস্টমাস্টারবাবু তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন জানতে পারলুম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্বে বাবাকে সম্মান করে 'ডক্টর' উপাধি দিয়েছিল। বাবার চিঠির খামের উপর এই ডক্টর উপাধি থাকে দেখে পোস্টমাস্টারবাবু বলে বেড়িয়েছেন যে কলকাতা থেকে বিখ্যাত একজন চিকিৎসক রামগড়ে এসেছেন। বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে ভালোবাসতেন, রামগড়ে এসে তাঁর সেই শখ চূড়ান্তভাবে মিটেছিল।

১৯১২ সালে লণ্ডনে W. Rothenstein-এর বাড়িতে কবি Yeats যখন

কয়েকজন সাহিত্যিককে গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা পড়ে শুনিয়েছিলেন, সি. এফ. অ্যান্‌ড্রুজও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাবার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ ও সেদিন থেকে তিনি বাবার একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তখন দিল্লির St. Stephen কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, ছুটিতে বিলাত গিয়েছিলেন। ছুটির পর দিল্লিতে যখন এলেন, অবকাশ পেলেই বাবার কাছে শান্তিনিকেতনে আসতেন। শান্তিনিকেতন খুব ভালো লাগল তাঁর, ইচ্ছা হল কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে বাবাব কাছে থাকবেন, আশ্রমের কাজে বাবাকে সাহায্য করবেন। আমরা যখন রামগড়ে রয়েছি হঠাৎ একদিন অ্যান্‌ড্রুজ সাহেব সেখানে এসে হাজির হলেন। দেখলুম তিনি তাঁর বেশ পরিবর্তন করেছেন, পাদরির পোশাক ছেড়ে সাধারণ কোটপ্যাণ্ট পরে এসেছেন। পরে সম্পূর্ণ ভারতবাসী বলে যখন থেকে নিজেকে মনে করতে লাগলেন তখন থেকে বিলিতি পোশাক ত্যাগ করে ধুতি পরতে আরম্ভ করেন।

রামগড়ে পৌঁছে বাবাকে জানালেন তিনি St. Stephen কলেজের অধ্যাপকের কাজ ত্যাগ করে এসেছেন। বাবা এখন তাঁকে যে কাজ দেবেন তিনি তাই করতে প্রস্তুত। তাঁর কোনো আর বন্ধন নেই। অর্থোপার্জনেরও দরকার নেই, সামান্য যা আয় আছে তাতে তাঁর স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য ও ভারতবর্ষের জন্য তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে চান। আরো জানালেন William Pearson তাঁর এই সংকল্প সমর্থন করেন। তিনিও তাঁর পথাবলম্বী হতে চান। বাবা আনন্দের সঙ্গে অ্যান্‌ড্রুজ সাহেবকে গ্রহণ করলেন। *Gitanjali, Chitra, The Gardener, The Crescent Moon* তখন বেরিয়ে গেছে। আরো ইংরেজি তর্জমার বই প্রকাশ করার আগ্রহ জানিয়ে Macmillanরা বাবাকে চিঠি লিখছে। বাবার হাতে বাংলা কবিতা থেকে ইংরেজি তর্জমা সে সময় যথেষ্ট ছিল যা প্রকাশ হয় নি। অ্যান্‌ড্রুজ সাহেব আসাতে বাবা খুশি হলেন। দুজনে মিলে বসলেন সেগুলি বাছাই করে বই আকারে ছাপতে দেবার জন্য প্রস্তুত করতে। আমারও একটা কাজ জুটল, তর্জমাগুলি যেমন বাছাই হয়ে যায় আমি সেগুলি টাইপ করে তাঁদের হাতে দিতে থাকি। আমার যতদূর মনে আছে *Fruit-Gathering*-এর কবিতা সংকলন রামগড়ে থাকতে হয়। অ্যান্‌ড্রুজ সাহেবকে এই বইয়ের সম্পাদনার ভার দেবার বাবার মনে আর-একটি উদ্দেশ্য ছিল।

রামগড়ে আমরা নির্জনে বাস করছি। সেখানে বাইরে থেকে কোনো আন্দোলন বিশেষ পৌঁছায় না। সাহেব অত্যন্ত ছটফটে লোক। তাঁকে যথেষ্ট কাজের খোরাক দিতে না পারলে তিনি কোন্‌দিন কোনো একটা কাজের অজুহাতে South Africa, Fiji Islands বা পৃথিবীর আর-কোনো সুদূর প্রান্তে উধাও হবেন। *Fruit-Gathering* কবিতা বইয়েব সম্পাদনার ভার পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই কাজেই মশগুল হয়ে আর-সব কথা ভুলে রইলেন। সমস্ত দিন ধরে বাবার খাতা থেকে কবিতা বাছাই করে নিয়ে একবার একভাবে সেগুলি সাজান, আবার বদলে অন্যভাবে সাজান। সন্ধেবেলায় সকলে মিলে যখন একত্র হই, অ্যান্‌ড্রুজ সাহেব বাবার পায়ের কাছে বসে তাঁর হাতে খাতা তুলে দিয়ে অনুরোধ করেন কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনাতে। বাবা পড়তে লাগলে সাহেব মুখ উজ্জ্বল করে তাঁর আবৃত্তি নিবিষ্ট মনে শোনেন। মাঝে মাঝে যখন কোনো কবিতা বিশেষ ভালো লাগে লাফিয়ে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। অনেক সময় তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে আমরা দেখতুম, শুনতে শুনতে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়তেন।

'হৈমন্তী'র আশেপাশে কোনো লোকালয় ছিল না। রামগড়ের গ্রাম আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু মাইল দূরে। আমাদের বাগানের সংলগ্ন একটি আপেল Orchard ছিল, তার মালিক একটি Anglo-Indian পরিবার। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি। অন্য দিকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে অবসরপ্রাপ্ত একটি ইংরেজ I. C. S. সস্ত্রীক বাস করতেন। তাঁর প্রকাণ্ড বড়ো আপেল বাগান। সেই বাগানে এত ফল হত, তিনি সারা বছর ধরে প্রত্যেক P. O. জাহাজে আপেল সরবরাহ করতেন। একদিন বিকাল বেলায় Sweetenham দম্পতি আমাদের সকলকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে তাঁদের বাড়ির চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করছি এমন সময় মেঘ এসে সেই দৃশ্য সম্পূর্ণ ঢেকে দিল। বাবাকে Sweetenham ও অ্যান্‌ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপ করার সুযোগ দেবার জন্য Mrs. Sweetenham আমাদের বাকি কয়েকজনকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। বাগানে বিলাতি ফুল প্রচুর ফুটে রয়েছে, তাদের বিবিধ রঙের সংমিশ্রণ দেখে বড়ো ভালো লাগল। মুগ্ধ হয়ে ফুলবাগানের বাহার দেখছি এমন সময় মেঘের আবরণ ছিন্ন হয়ে চোখের সামনে একটি

অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল। আমরা পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলুম, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি কাতারে কাতারে মেঘ সমুদ্রের মতো চলে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়, পশ্চিম সীমান্তে সূর্য অস্তমিত, তারই বর্ণচ্ছটা মেঘপুঞ্জের উপর ছিটিয়ে পড়েছে, সোনালি, গোলাপি, বেগুনি কতরকমের রঙ। মনে হল আমরা রয়েছি যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে কোনো দেবলোকে। মর্তের সব চিহ্ন বিলুপ্ত। কেবল দেখা যাচ্ছে মেঘসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে উঠেছে দ্বীপের মতো কয়েকটি পাহাড়ের চুড়ো। এরকম অপূর্ব দৃশ্য আর একবার মাত্র দেখেছিলুম Switzerland-এ Matterhorn পাহাড় থেকে। ছুটে গেলুম বাবার কাছে, কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের নিয়ে এলুম বাগানে এই অভিনব দৃশ্য দেখবার জন্য।

রামগড়ের আসর ভাঙবার সময় এল। প্রথমে চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ। যাবার সময় বাবাকে লখনৌতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর কাছে দু-চার দিন থাকতে হবে কেবল নয়, লখনৌতে একটি বক্তৃতাও দিতে হবে। পরে দিনেন্দ্র ও মুকুল ফিরে গেল শান্তিনিকেতনে। অ্যানড্রুজ সাহেবকে নিয়ে আমরা রইলুম সেখানে আরো কয়েকদিন।

আমাদেরও সময় হল নামবার। তখনকার দিনে এই পাহাড়ি অঞ্চল non-regulation পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডাণ্ডিবাহক কুলির জন্য কমিশনারের কাছে আবেদন করতে হয়। যথারীতি আবেদন পেশ করা সত্ত্বেও একটিমাত্র ডাণ্ডি পাওয়া গেল। অবস্থা দেখে অ্যানড্রুজ সাহেব বললেন, 'গুরুদেবের লখনৌতে বক্তৃতার দিন স্থির হয়ে গেছে, তাঁকে আজ রওনা হতেই হবে। যে একটা ডাণ্ডি এসেছে তাতে গুরুদেব যাবেন, আমি তাঁর সঙ্গে হেঁটে যাব। তোমরা পরে এসো।' বাবা এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না। সাহেব নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বাবাকে ডাণ্ডিতে উঠেই রওনা হতে হল, সাহেব সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগলেন। খানিকটা গিয়েই— আমরা দূর থেকে দেখলুম— বাবা ডাণ্ডি থেকে নেমে সাহেবের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। পরে জানতে পারলুম দুই বন্ধু সমানে কাঠগুদাম পর্যন্ত ১৬ মাইল গল্প করতে করতে হেঁটে গেছেন আর ডাণ্ডিটা পিছনে পিছনে চলেছে, তাতে আরোহী কেউ ছিল না।

১৯১৪-এর মহাযুদ্ধ বাধবার আগে থেকেই বাবার মন বিচলিত হয়েছিল।

একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায়। এইজন্যই বোধ হয় তিনি এইসময়ে বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমা করার কাজে মন এত নিবিষ্ট করে রেখেছিলেন। তবু ভিতরে ভিতরে অবচেতন মনের মধ্যে অস্বস্তি যাচ্ছিল না। তার পরিচয় পাই রামগড়ে লেখা বিখ্যাত কবিতায় —

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে,
এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই যে অভয় শঙ্খ।

রামগড়ে থাকার সময় যুদ্ধ বাধবার পর বাবার বিচলিত মনের অবস্থার কথা অ্যান্ড্রুজ সাহেব *Letters to a Friend* বইতে এক জায়গায় লিখেছেন—

'The period of the next few months was one of the increased tension followed later by a gradual recovery from the mental strain that had been oppressing the Poet for so long.

At the beginning of the European war this strain had become almost unbearable, owing both to the world tragedy of the war itself and the suffering of Belgium, which the poet felt most acutely. He wrote and published simultaneously in India and England three poems which expressed the inner conflict going on in his own mind. The first of these was called *The Boatman* and he told me, when he had written it, that the woman in the silent

courtyard, "who sits in the dust and waits", represented Belgium. The most famous of the three poems was *The Trumpet.* The third poem was named *The Oarsmen.* Its outlook is beyond the war ; for it reveals the daring venture of faith that would be needed by humanity if the old world with its dead things were to be left behind and the vast unchartered and tempestuous seas were to be essayed leading to a world that was new.'

কয় মাস ধরে মানসিক উৎকণ্ঠায় টানাপোড়েন চলতে লাগল। চিত্তের এই বিক্ষেপ শান্ত হল বেশ কিছুদিন পরে। কবি ধীরে ধীরে তাঁর মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেলেন।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর এই উদ্‌বেগ চরমে পৌঁছল। মনে হল তিনি যেন সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বজোড়া এই কুরুক্ষেত্র-রণের বেদনা তাঁর হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি বেজেছিল বেলজিয়মের দুর্দশার কথা ভেবে। এই সময়ে রচিত তাঁর কবিতাবলির মধ্যে তিনটি কবিতায় তাঁর তৎকালীন মনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই তিনটি কবিতার মূল বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রায় এক সময়ে এ দেশে ও বিলাতে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাত্রয়ের প্রথমটি হল বলাকার দুই নম্বর কবিতা 'আহ্বান'— সেই যেখানে তিনি বলেছেন :

ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে,
কোণে আঁচল মেলিস নে।

কবির মুখেই শুনেছি এই ভীত সন্ত্রস্ত রমণী হল বৈরী-অধ্যুষিত বেলজিয়মের দ্যোতক। তিনটি কবিতা স্তবকের মধ্যে যেটি প্রখ্যাত হয়েছিল, তা হল 'শঙ্খ'। তৃতীয় কবিতা হল 'ঝড়ের খেয়া'। এর মধ্যে যে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হয়েছে সে হল জীর্ণ পুরাতন মৃত্যুর বন্দর অতিক্রম করে নূতন যুগের সমুদ্রতীরে পাড়ি দেবার ডাক :

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে
ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।

বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে,

ফুরায় সত্যের যত পুঁজি—

কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—

'তুফানের মাঝখানে

নূতন সমুদ্রতীর-পানে

দিতে হবে পাড়ি।'

উপরি-উক্ত প্রসঙ্গে বাবার একটি উক্তি স্মরণীয়।

'চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙা-চোরার আয়োজন হচ্ছিল। অ্যানড্রুজ সাহেব এই সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন···

'আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল।'···

বাবা মনের মধ্যে যে দুশ্চিন্তাবোধ করছিলেন তার দুঃখ থেকে জোর করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। রামগড়ে হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে কাব্য ও গানের রসসৃষ্টির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে এই দুঃস্বপ্ন অগ্রাহ্য করে চিরন্তনের আশ্রয় নিলেন।

ডায়ারি

এই বিভাগে রথীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের ডায়ারির কোনো-কোনো প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হল। এর প্রথম দুটি অংশ সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে তিনি যে সূচনা লিখে দিয়েছিলেন তাও নীচে মুদ্রিত হচ্ছে—

'বাবামহাশয়ের আলাপ-আলোচনার আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ ছেলেবেলায় অনেক সময় পেয়েছি। অল্প বয়সেই দিনপঞ্জি রাখার উৎসাহ বেশি দেখা যায়— জীবনের প্রতি ঘটনাই ছেলেদের কাছে মূল্যবান, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস যা না হলে ডায়ারি লেখা হয় না, তখন যথেষ্ট। সম্প্রতি আবিষ্কার করলুম আমারও অল্প বয়সে দিনপঞ্জি রাখার অভ্যাস ছিল। এমন-কি, বাবামহাশয়ের কথাবার্তার অনুলেখন রাখবার চেষ্টা থেকেও বিরত হই নি, যদিও তা নিতান্তই দুঃসাহসিকতা বই কিছু না। তাঁর মুখের কথার অনুলেখন নেওয়া এমনিতেই দুঃসাধ্য— বয়সও তখন কম, ভাষাজ্ঞান সীমাবদ্ধ, সব কথা যে বোধগম্য হত তাও নয়।

'এই ধরনের কয়েকটি অনুলেখন কিছুদিন আগে আমার পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পেলুম। এদের ঠিক অনুলেখন বলা সংগত হবে না, কেননা লেখাগুলোর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সংশোধন-সাপেক্ষ। তবু বাবামহাশয়ের মতামত হিসাবে হয়তো তাদের মূল্য আছে, এই ভেবে আমি এই লেখাগুলি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করেছি।

'ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২রা অগস্ট। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একটি বিশেষ ঘটনারও উল্লেখ আছে— যোগরঞ্জনের মৃত্যু। যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘটনার সন ও মাস হবে ১৩১০ শ্রাবণ— আজ থেকে ৩৯ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন আমরা গিরিডিতে, বাবামহাশয়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসার পার্শ্ববর্তী বাংলোতে কিছুদিন ছিলুম। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভি. রায়, শশিভূষণ বসু প্রভৃতি যখন দেখা করতে আসতেন তখন প্রায়ই নানা বিষয়ে আলোচনা চলত, সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমি ঘরের এক কোণে বসে আবিষ্টমনে শুনতুম ও খাতায় নোট লিখে রাখতুম। দ্বিতীয় লেখাটি ('মেয়েদের অধিকার') বাবামহাশয়ের জবানিতেই লেখা। সন-তারিখ দেওয়া আছে— ২রা বৈশাখ, ১৩১২। —শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

মনোরঞ্জনবাবুর ছেলে যোগরঞ্জন শুক্রবার দিন বিদ্যালয়ে মারা গেছে। মনোরঞ্জনবাবু তাঁর ছোটো ছেলে দেবরঞ্জনকে নিয়ে আজ সকালে এসেছেন। আমরা সকলে তাঁর বাড়িতে গেলুম। Spiritualism সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা ও গল্প শোনা গেল। যদি এগুলো সত্যি হয় তা হলে সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

বিকেলে মনোরঞ্জনবাবু এলেন। বাবার সঙ্গে অন্য কথা হতে হতে ধর্মের কথা উঠল। বাবা বলতে লাগলেন :

আমি 'ধর্মপ্রচারে' বলতে চেষ্টা করেছিলুম যে ধর্মকে একটা বিশেষ স্থান বা বিশেষ সময় বা বিশেষ কথার সঙ্গে জড়িত করলে সেটা ধর্ম হল না। ব্রাহ্মসমাজে এই ভাবটি খুব আছে। যে যে-পরিমাণে উপাসনাশীল সে সেই পরিমাণে ধার্মিক— এটি বড়ো ভুল ধারণা। আমি চোখ বুজে ঈশ্বরের ধ্যান করলুম, মনেতে হয়তো একটু ভাবও এল, কিন্তু তার পরে যখন বাইরে গেলুম, যার সঙ্গে শত্রুতা ছিল সে শত্রুই রইল। জগৎ আমার কাছে আগে যে রকম ছিল সেই রকমই রইল, সকলকে আপনার বন্ধুর মতো দেখলুম না— একে কি ঈশ্বরের উপাসনা বলব!, অনেক লোকে এরকম ভাবে মনে করে সত্যিই ঈশ্বরকে ধারণা করেছি— নিজেদের নিজেরা প্রতারণা করে। এ একরকম মেস্‌মেরিজ্‌ম্। খোলের আওয়াজে যে অনেক সময়ে ভাব হয়, সেও একরকম মেস্‌মেরিজ্‌ম্।

আমার কাছে ধর্ম ভারি concrete— যদিচ এ-বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকম উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তা হলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা পশুপাখি ধুলোমাটি— সব জিনিস থেকেই পেয়েছি। আমি ধুলোকে ধুলো নাম দিয়েছি বলে তার কি অন্য কোনো significance নেই। আমরা এই জগতের অধিকাংশ জিনিসকেই জড় নাম দিয়ে আমাদের বাইরে ঠেলে রেখে দিই। আমি এই সমস্তের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করি। আমার কাছে ধুলো কেবল ধুলো নয়, গাছ কেবল গাছ নয়, ফুল কেবল ফুল নয়; তাদের মধ্যে একটা deeper significance আছে বলে মনে হয়। আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র তামি তাঁর স্পর্শ অনুভব করি। এক-এক সময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

আমি এইজন্য বলি ঈশ্বরকে একটা বিশেষ উপায়ের ভিতর দিয়ে, একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা পাবার দরকার নেই। সর্বত্রই, লোকজন জড়প্রকৃতি সকলের ভিতরেই তাঁকে পাওয়া যায়। আর আমার তো মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক উপায়। আমি ভারি positivist, আমি যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করব তখন সকল জিনিসের ভিতরেই তাঁকে দেখব— সব জগৎ আমার আপনার হবে, আমি সকলকে ক্ষমা করতে পারব, সবেতেই তাঁর মঙ্গলময় হাত দেখব, জগতের মধ্যে একটা harmony অনুভব করব।

১৭ শ্রাবণ ১৩১০

মেয়েদের অধিকার [এপ্রিল ১৯০৫]

একটি ঘটনার পর থেকে আমি মেয়েদের কথা প্রথম ভাবি। বাড়িতে তেতালার ছাত, তার নীচেই দোতালার ঢাকা বারান্দা। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম একটি মেয়ে উপরের ছাতে চঞ্চলভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে উপরের দিকে নুড়ি ছুঁড়ছে— তার মধ্যে কেমন একটা লীলার, একটা চঞ্চলতার ভাব। নীচের বারান্দায় ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি মেয়ে ধীরভাবে তরিতরকারি কুটছে।

এই ছবি দেখে আমার মনে হল যে মেয়েদের মধ্যে দুরকমের ভাব আছে— একটা স্ত্রীর ভাব, আর একটা মার ভাব। একটা মনোহরণ, চিত্তরঞ্জন করার ভাব— অন্যটা মঙ্গলের ভাব। যেটাতে করে মনোরঞ্জন, সেটা হল সৌন্দর্য বা লীলার ভাব।

পুরুষের শক্তির মধ্যেও দুরকমের ভাব আছে— একটা বাহুবলের শক্তি, আর একটা জ্ঞানের শক্তি। শারীরিক শক্তি উপার্জন করবার জন্য এক ধরনের জ্ঞানের দরকার, সেটাও আমি শক্তির মধ্যে ধরছি। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান মানে wisdom। Spartanদের মধ্যে এই বাহুবলের শক্তির একদিন খুব চর্চা হয়েছিল। এই শক্তিলাভের জন্য তারা নানা রকম কঠোরতার ভিতর দিয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পুরাকালে এই রকম বাহুবলের খানিকটা দরকার ছিল। তখনকার দিনে সবই ছিল অনিশ্চিত, লোকে তখনো বাসা বেঁধে শান্তিতে বসবাস করার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারে নি।

Homerএর ইলিয়ডে দেখবে সব জায়গায় বাহুবলেরই সম্মান। রামায়ণ ও মহাভারতে ঠিক তার উলটো রকমের ভাব— বাহুবলের চেয়ে জ্ঞানের শক্তির বেশির আদর। এটা আমি কেবল কথায় কথায় বললুম, কিন্তু এ একটা মস্ত কথা। এ সম্বন্ধে যথার্থ আলোচনা আজও হয় নি। আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি একটা মমত্ব থেকে এ কথা বলছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলি বিষয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটা মূলগত ভেদ আছে।

ওদের দেশে মেয়েদের স্ত্রীভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি। সেখানে মেয়েরা আছে কেবল পুরুষদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে। সৌন্দর্যের দ্বারা লীলার দ্বারা তাদের অভিভূত করবার জন্যে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোককে মা বলে মানে— তাই এত সহজে সকলকে মা সম্বোধন করে। ইয়োরোপের মেয়েরা মনোহারিণী বলে ওদেশে chivalryর উদ্‌ভব। সেখানে পুরুষেরা মেয়েদের মনোহরণ করবার শক্তির কাছে নিজেদের বাহুবলের হীনাংশকে সমর্পণ করে। এ আত্মসমর্পণ একটা ছলের মতো— পুরুষেরা মেয়েদের দাস, এরকম ছিল না।

আমাদের দেশে মেয়েদের এভাবেই দেখা হয় না বলে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের গালাগালি দেয়। যে-কোনো ভাব পরিপুষ্টি লাভ করার জন্য অনুকূল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র সন্ধান করে। ইয়োরোপে সমস্ত সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের দাম্পত্য ভাবটি বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছে। সেখানে রমণীর প্রথম ও প্রধান কাজই হল পুরুষকে তার সৌন্দর্য দ্বারা, কমনীয়তা ও রমণীয়তার দ্বারা মুগ্ধ করা— আমোদ দেওয়া। তারা যে কেবল স্বামীর চিত্তরঞ্জন করে তা নয়, সমস্ত পুরুষেরই চিত্তরঞ্জন করে; বরঞ্চ স্বামীর বেলাতে একটু মঙ্গলের ভাব। স্ত্রীলোকের মধ্যে মঙ্গলের ভাব না থেকে পারে না, দু ভাবই থাকতে বাধ্য।

ইয়োরোপে এই মঙ্গলের ভাবটা গৃহে বদ্ধ। সেখানে স্ত্রী তার স্বামী ও মা তার পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে মঙ্গলের ভাব রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই যে এই মঙ্গলভাব ইয়োরোপে বিস্তার পায় নি, কেননা তাদের সমাজের গঠন অন্য রকমের। সেখানে গৃহ বলতে কেবল স্বামী ও স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততি বোঝায়; সব যেন একটা 'বেরোও বেরোও' ভাব— সবাই স্বাধীন, সকলেই নিজেদের স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে আছে, তাদের বাড়ির গণ্ডীর ভিতর আর-কারো প্রবেশ নিষেধ। গৃহ যেখানে সংকীর্ণ সেখানে

মাতার মঙ্গলের ভাবও সংকীর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু মনোহারিণী বৃত্তিটি ওদেশে সেই পরিমাণেই যেন বিস্তার লাভ করেছে।

সেখানে স্ত্রীকে বহু পুরুষের সঙ্গে মিশতে হয়, সকলের মনোরঞ্জন করতে হয়। সকলে তাদের কাছে এইটাই চায় বলে মেয়েদেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয় এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বুড়োবয়সে যখন চুলে পাক ধরেছে, যখন স্বভাব দু-হাত তুলে বলছে আর থাক্, তখনো ঝুটো দাঁত ও পরচুলোর সাহায্যে তাদের নবীনা সাজতে হয়। Cosmetics ও make-up শিল্পের দিন দিন ইয়োরোপে ক্রমোন্নতি হচ্ছে এইজন্যেই। একটি কথা এখানে স্বীকার করতেই হবে, বহু লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের ফলে মেয়েদের সংস্কৃতিরও একটা উন্নতি হয়।

আমাদের দেশে আবার ঠিক উলটো, আগেই সে কথা উল্লেখ করেছি। স্ত্রীলোকের মাতৃভাব এদেশে খুব বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছিল— এই ভাব পরিপোষণ করেছিল এদেশের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। ইয়োরোপে যেমন মঙ্গলের ভাব স্বামীতেই আবদ্ধ— সে রকম আমাদের দেশে দাম্পত্যের ভাব কেবল স্বামীতেই আবদ্ধ, মঙ্গলের ভাব সকলের প্রতি উন্মুখ। পাড়াপ্রতিবাসী, ছেলেমেয়ে ভাইপো-ভাইঝি, দেওর-ঠাকুরঝি ইত্যাদি সকলের প্রতি তার মাতৃভাব ধাবিত। মা যখন ছেলেকে আহার পরিবেশন করেন তখন তার মধ্যে দাসত্বের কোনো ভাবই আসতে পারে না। তাতে তাঁর মাতৃস্নেহের ভাবই সূচিত হয়। মা তাঁর মাতৃত্বের দাবিতেই ছেলের সেবা করতে পারেন। এই মাতৃভাব কেবল তাঁর সন্তানের প্রতি ধাবিত তা নয়, এইভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি সকলের সেবা করেন। এইজন্যই মাতৃভাব আমাদের দেশে এত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পেয়েছিল।

ইয়োরোপে মা হওয়া ওদের কাছে ক্রমশ বিভীষিকার মতো হয়ে উঠেছে। মেয়েরা বিদ্রোহ করছে যে তারা গর্ভধারণের দায়িত্ব ও যন্ত্রণা ভোগ করবে না। সেখানে মায়ের সম্মান নেই। মা হয়ে encumbered হয়ে পড়া ওরা দাসত্ব মনে করে, তাই ওরা যৌবনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সমাজে যেখানে ওদের স্থান সেখানে যৌবন ও সৌন্দর্যলীলাচাপল্যই হল তাদের প্রধান অস্ত্র; সে অস্ত্র যদি হারায় তবে ওদের দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। মা হতে গেলে সে সব-কিছু যদি বিসর্জন দিতে হয় তা হলে

ওদের চলে না। আমাদের দেশে একটি সন্তানের জন্য স্ত্রীলোক কত মানত, কত ব্রত, পূজা-পার্বণাদি করে। ইয়োরোপে মেয়েদের চেষ্টা হল যাতে ছেলে-পিলে না হয়।

আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি জগতের জননী, এখানে তিনি পুরুষের মা বলে পূজিত। ইয়োরোপে সে শুধু পুরুষের নর্মসহচরী— স্ত্রী। আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ চলে না। যদি স্বামীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সমাজের সঙ্গে যোগ শেষ হত, তবে অন্য স্বামী নেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, স্ত্রী যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে সর্বতোভাবে জড়িত। সে-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে সে কেমন করে যাবে? ইয়োরোপে বিধবাবিবাহ একটা প্রয়োজনের ব্যাপার। স্বামী তার একমাত্র সম্বল, সে যদি যায় তবে অন্য স্বামী সংগ্রহ করা ছাড়া তার অন্য গতি থাকে না।

আমাদের দেশে যারা ওদেশী প্রথামতো পরিবার থেকে এভাবে ছিটকে পড়েছে, তাদের কথা আলাদা। তাদের পক্ষে বোধ হয় বিধবাবিবাহ প্রথাই ভালো। আমাদের দেশেও দেখছি একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, স্ত্রীলোকের সেই মাতৃভাবের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগে কোথাও যেতে হলে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা ছিল না, সম্ভব হত না। কারণ স্ত্রী তো কেবল স্বামীর নয়, সে হল সমস্ত পরিবারের, তাকে কেবল নিজের সুখের জন্য ব্যবহার করা লজ্জাকর হত। তবে লজ্জাও হয়তো মানত না, যদি বাইরে গতিবিধির সুযোগ থাকত। আজ সেই সুবিধে হয়েছে বলে স্ত্রী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সমাজে এই যে হাওয়া-বদলের যুগ এল জানি না কোথায় এর পরিণতি— কল্যাণের দিকে না কোনো অশুভ সম্ভাবনায় এর শেষ কে জানে।

২ বৈশাখ ১৩১২

বিলাত যাত্রা : ১৯১২ 25th September 1913

আমরা মে মাসের শেষে (১৯১২) City of Glasgow জাহাজে বম্বে থেকে বিলাত রওনা হয়েছিলুম। এতদিন পরে যখন দেশে আবার ফিরছি সে সময় এই diary লিখতে বসবার কারণ বোঝা শক্ত— এইটুকুই বলবার আছে

যে এতদিন যা করি নি— যে অন্যায় হয়েছে তা এখন সম্পূর্ণ পূরণ করা অসম্ভব— তবে it is never too late to repent and retrieve। Diary লেখা কখনো অভ্যেস নেই— সেইজন্যই এতদিন চেষ্টা করতে ভরসা করি নি। তা না হলে অনেকদিন থেকেই মনে হয়েছে যে বাবার সঙ্গে যখন প্রায়ই থাকি অনেক লোকের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয় সেগুলো সময়মত টুকে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে তার খুব মূল্য হবে। কিন্তু diary রাখা শুধু লেখবার ক্ষমতা থাকলেই হয় না— সঙ্গে সঙ্গে একটা লেগে থাকবার শক্তি— doggedness থাকা চাই— তারই অভাবে এতদিন কিছু করি নি।

বিলাত ভ্রমণের বৃত্তান্ত লেখবার আগে বিলাতে আসবার কল্পনা ও উদ্যোগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯১১র গ্রীষ্ম থেকে বাবার শরীর ক্রমশই দুর্বল হচ্ছিল— সেই সময় বাবা মাসখানেকের জন্যে শিলাইদায় আমাদের কাছে এসেছিলেন। তখন আমি প্রস্তাব করি যে সেবার পুজোর ছুটির সময় অন্য কোথাও না গিয়ে B. I. S N. এর একটা জাহাজে Ceylon কিংবা Singapore or Java পর্যন্ত বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না— তাতে বাবার শরীরও ভালো হবার সম্ভাবনা আর সম্পূর্ণ একটা নতুন রকমের change হবে। এইখানে বলা দরকার যে সে সময়ে বাবার শুধু যে শরীর খারাপ হয়েছিল তা নয় মনেতেও একটা খুব ক্লান্তি ও অবসন্ন ভাব অনুভব করছিলেন। অনেকদিন ধরে অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে ও অবিশ্রাম পরিশ্রমের দ্বারা বোলপুরের বিদ্যালয়কে তাঁর আদর্শে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন— সেই যে দশ বছরের উদ্যোগ, ভিতরকার আদর্শকে বাইরের কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করে তোলবার struggle, তারই মধ্যে আবার অনেক সাংসারিক দুঃখকষ্টের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। এই-সব কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারে নি— সমস্ত বাধা-বিঘ্নের উপরে জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু এই struggle কি মনের উপর তার চিহ্ন রেখে যায় নি? তার উপর এই সময় বিদ্যালয়ের কাজও বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলছিল না— এতদিনের চেষ্টায় যেটুকু ফল ফলা উচিত ছিল তা যেন ফলছিল না, financial arrangementsও যেন ক্রমশই কঠিন হয়ে আসছিল। এইজন্যে আমাদের মনে হয়েছিল যে বাবাকে যদি বিদ্যালয় থেকে কিছুদিনের জন্যে দূরে সম্পূর্ণ নূতন surroundingএর মধ্যে

নিয়ে যাওয়া যায় তো ভালো হয়। বাবা কিছুদিন দূরে থাকলে অধ্যাপকদের মধ্যেও আপনিই অনেক self-reliance, responsibilityর ভাব উদ্রেক হবে। নিজেদের উপর সম্পূর্ণ ভার পড়লে আপনা থেকেই বিদ্যালয়ের প্রতি বেশি interest, ভালোবাসা জেগে উঠবে। বাবা নিজেই তাঁর মনের অবসন্ন ভাব অনুভব করতে পারছিলেন— আমাদের কাছে অনেকদিন এ বিষয়ে বলেছিলেন। সমুদ্রে বেড়াতে যাবার কথা হবার পর তিনি বোলপুরে ফিরে যান ও সেখানে সন্তোষ ও অন্যান্য দু একজনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা হবার পর তাঁর বেড়াতে যাবার প্ল্যানটা খুব ভালোই লাগে এবং এত উৎসাহ হয় যে আমাকে লেখেন শুধু Javaয় গিয়ে কী হবে— অতটা যদি যাওয়াই হয় তো জাপানে গেলে ভালো হয়। আমি সেই সময় কলকাতায় ছিলুম— সুরেনদাদার সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ করাতে আমাদের দুজনকার মনে হল যে বাবার যখন একবার বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে হয়েছে তখন জাপানে না গিয়ে ওঁর পক্ষে ইয়োরোপ যাওয়াই ভালো হবে। জাপানে গেলে একটা নতুন দেশে গেলে নতুন লোকজন, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যেটুকু উপকার হয় তা অবশ্য হবে— কিন্তু একটা ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হবে না, তার প্রধান বাধা হবে ভাষা। বাবার physical surroundingsএর change যত না দরকার ছিল তার চেয়েও mental ও intellectual atmosphere বদল বেশি দরকার হয়েছিল। বাবাকে এ বিষয়ে বলাতে তিনিও এই নতুন প্ল্যানে রাজি হলেন। কিন্তু এই সময় একটা বাধা উপস্থিত হল। সাহিত্যপরিষদ থেকে বাবাকে যে সংবর্ধনা দেবার কথা হয়েছিল তার উদ্যোগকর্তারা বাবাকে ধরে পড়লেন সংবর্ধনা না হয়ে গেলে তিনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। বাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁকে বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল। পূজার ছুটিতে যাওয়া হল না। তার পরেই ৭ই পৌষ ও [১১ই] মাঘ কাছাকাছি এল— বাবা সেগুলো না সেরে বেশিদিনের জন্যে কোথাও যেতে রাজি হলেন না।...

পলাতকা ও চতুরঙ্গ প্রসঙ্গ 14th February 1915

বাবা পরশুদিন শিলাইদহ থেকে ফিরে এসেছেন। সেখানে গিয়ে যে বেশ ভালো ছিলেন আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তা থেকেই বোঝা যায়। অনেকগুলি

কবিতা ও একটা গল্প এই ক'টা দিনের মধ্যে লিখে ফেলেছেন। গল্প শোনবার জন্যে মণিলাল সকলকে খবর দিয়েছিল তাই আজ সকালে সত্যেন্দ্র দত্ত, ধীরেনবাবু, দ্বিজেন বাগচী, সুরেশ বন্দ্যো, চারু বন্দ্যো, অজিতবাবু প্রভৃতি ও গগনদাদারা দোতলার ঘরে বসে আড্ডা করলেন। বাবা ব্রজেন্দ্র শীলের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাই প্রথমে তাঁর নতুন কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন। বললেন কিছুদিন আগে রমণীমোহন ঘোষ তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে আপনাকে তো আজকাল আবার সেই সাধুভাষায় ফিরে যেতে হল— সেটার তখন কিছু প্রতিবাদ করেন নি— কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে নতুন ছন্দ ব্যবহার করছেন তাতে সহজ বাংলা ভাষায় লিখতে চেষ্টা করবেন। এবারে শিলাইদায় গিয়ে 'মুক্তি' কবিতা সেই প্রথম চেষ্টা। প্রথমটায় একটু শক্ত ঠেকেছিল কিন্তু একবার একটা করতে তার পর সহজেই আসতে লাগল। বরঞ্চ দেখলেন এইরকম ভাঙা ছন্দে সহজ ভাষাই ঠিক খাটে। সত্যেন্দ্র দত্তও তাই বললেন। বাবা বললেন উনি ইচ্ছা করে কোথাও কোথাও দু-একটা অক্ষর কম দিয়েছেন— যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা আর একটা লাইনের উপর গিয়ে পড়ে থেমে না যায়। নতুন যা কবিতা জমেছে তাতে একটা বই হবার মতো হয়েছে। বইটার কী নাম হবে তাই নিয়ে আলোচনা হল। বাবা প্রথমে suggest করলেন 'শৈবাল'— সেটা কারো তত পছন্দ হল না— তখন বললেন 'স্রোতের শেওলি' কি রকম হয়। সেটাতেও কেউ কেউ আপত্তি করলেন যে বৈষ্ণব কাব্যের association এসে পড়বে। তার পর suggest করলেন 'ঝরনা'— কেউ মনে করলেন সেই নামে অন্য বই থাকতে পারে— কেউ বললেন ওটাতে source suggest করে— গতি তত নয়। তার পর হঠাৎ গগনদাদা বললেন 'পাগলঝোরা' নাম দিল কেমন হয়— সেইটা বলতেই সকলের খুব পছন্দ হল ও তাই সাব্যস্ত হল। একটু পরে গল্প আরম্ভ হতেই ব্রজেন্দ্র শীল এলেন। ইতিমধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় এসেছিলেন। গল্পটা সবুজ পত্রে 'জ্যেঠামহাশয়' থেকে যে তিনটে series বেরিয়েছে তারই শেষটা— এবার শ্রীবিলাসের সম্বন্ধে। সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শুনলেন— গল্পটাতে শিলাইদায়ের গন্ধ খুব। সেখানকার ভাঙা নীলকুঠি, বালির চর প্রভৃতির বর্ণনা চমৎকার। সকলের এই গল্পটা বিশেষভাবে ভালো লাগল বলে বোধ হল। এই চারটে গল্পের কী নামকরণ হবে তা নিয়েও আলোচনা হল। 'চারজনা',

'চতুষ্টয়', 'চতুষ্কোণ', 'শচীশ', 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস' প্রভৃতি অনেক রকম suggested হল। শেষটা— 'চতুরঙ্গ' কে বলাতেই সকলের একবাক্যে পছন্দ হল— বাবারও এটা একবার আগে মনে হয়েছিল।

কাল দ্বিজেন্দ্রবাবু 'হিতসাধন সমিতি'র যে সভা করেছিলেন— সে বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে···সভা ভাঙল।

—

চিঠিপত্র

রথীন্দ্রনাথের আমেরিকায় ছাত্রজীবন প্রসঙ্গে সমসাময়িক তাঁর দুখানি চিঠি ও তাঁর সহাধ্যায়ী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের একখানি চিঠি প্রবাসী ১৩১৪ কার্তিক সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। রথীন্দ্রনাথের চিঠি দুটি রবীন্দ্রনাথকে এবং সন্তোষচন্দ্রের চিঠিখানি তাঁর মাতৃদেবীকে লিখিত বলে অনুমিত।

আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র

১

Illinois Street
978, Urbana, Illinois,
U. S. A.

শ্রীচরণকমলেষু,

এবারে ডাকের কি গোলমাল হয়েছিল, সমস্ত সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইলুম কোনো চিঠিই এল না, ভাবলুম তোমরা হয়তো খুব ব্যস্ত ছিলে তাই চিঠি দিতে পার নি। তার পরে সব চিঠিপত্র এসেছে।

তোমাদের চিঠি সকালবেলায় এসেছিল কিন্তু আমি সন্ধেবেলায় সেগুলো পেলুম। এই কয়েক ঘণ্টা তোমার চিঠি বর্জিত হওয়ার কারণ কি জান? এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। তোমরা জান তো আমি পোকা সম্বন্ধে (Entomology) একটা কোর্স নিয়েছি। এই কোর্সে পোকার অনুসন্ধানে ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত জানতে প্রায়ই এদিক্ ওদিক্ যেতে হয়। এখান থেকে চৌদ্দ পনেরো মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মতো আছে, সেখানে এখন একদল পঙ্গপাল দেখা দিয়েছে, তাই দেখতে অধ্যাপক আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। পোকার নাম শুনে তোমাদের নানারকম মনে হতে পারে। সেইজন্যে বলে রাখি, কেবল যে পোকা খুঁজতেই গিয়েছিলাম তা নয়, চড়িভাতি করাও উদ্দেশ্য ছিল।

জায়গাটার নাম হচ্ছে Homer Park। পার্ক শুনে গড়ের মাঠের মতো জায়গা আদবেই ভেব না। এই পার্কের ভিতর মানুষের হাত একেবারেই নেই, একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জঙ্গল। Public Park এই অর্থে যে, লোকেরা এর উপর ঘর বাড়ি না তোলে। ছুটির দিন সকলে যাতে এখানে এসে Picnic করতে পারে, তার জন্যে এই জায়গাটুকুতে যে রকম স্বাভাবিক জঙ্গল ছিল সেই রকমই রেখে দিয়েছে।

আমরা বাসা থেকে সকালবেলায় বেরলুম, সঙ্গে কিছু পয়সা, পোকা সংগ্রহের জন্যে জাল ও chloroform দেওয়া গোটা কতক শিশি ও একটা ছবি

তোলার জন্যে ছোটো ক্যামেরা। সেখানে রেলগাড়ি যায় না, বৈদ্যুতিক রেলে যেতে হয়। সেটা আর কিছু নয়, সাধারণ বৈদ্যুতিক ট্রামেরই কিছু বড়ো সংস্করণ—রেলগাড়িরই মতো জোরে যায়। আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই সেটা চলে গেছে, কিন্তু students' rate জোগাড় করবার জন্যে ট্রামগাড়িতে প্রথমে আমাদের নিকটের শহর স্যামপেনে (Champaign) গেলুম। যাতায়াতের ভাড়া ৭০ সেণ্ট অর্থাৎ দু'টাকা তিন আনা, কিন্তু আমরা ৪০ সেণ্টে পেলুম। অধ্যাপকদের সঙ্গে এইরকম করে গেলে, এখানে সর্বত্রই এইরকম অর্ধেক ভাড়ায় যেতে দেয়। স্যামপেন্ থেকে সেই গাড়িতে প্রথমে তো আরবানায় (Urbana) গেলুম। তার পর শহর ছাড়িয়ে গাড়ি বরাবর মাঠ ও ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলল। এই জায়গাটা সত্যিই আমাদের দেশের মতো। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন বর্ধমানের কাছাকাছি রেলে করে যাচ্ছি। দু'ধারে ধানের বদলে কেবল ভুট্টা ও যবের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক-একটা গাছের ঝোপ। তার ভিতর থেকে যদি দু-একটা বাঁশের ঝাড় ও খোড়ো ঘরের চাল উঁকি মারত তো দেশের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকত না। কিন্তু এখানে জান তো গ্রাম বলে কোনও জিনিস নেই, ওই-সব গাছের ভিতর একটিমাত্র করে চাষার ঘর, ঘর বলা চলে না, বেশ একটি সুন্দর বাড়ি। এখানে জমির তো কোনো অভাব নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে, এইরকম ঘর বেঁধে চাষারা দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে—কেবল শহরের লোকেরাই ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্রে থাকে।

এক-একজন চাষার কত বড়ো বড়ো ক্ষেত তা আমাদের কোনো ধারণা নেই। ওই বোলপুরের মাঠটা বোধ হয় দু-তিন জন মাত্র অধিকার করে থাকবে। যন্ত্রপাতির এত উন্নতি করেছে যে, অত বড়ো ক্ষেত চাষ করতে বেশি লোকেরও দরকার হয় না। প্রায় সমস্ত কাজই দু-তিন জনে করতে পারে। এই-সব মাঠের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা ছোটো স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দিলে। স্টেশনের কাছেই একটা ছোটো restaurant, সেখানে সব রকম খাবার পাওয়া যায়। কাছেই একটা ছোটো নদী, গিরিধির উশ্রী নদীর চেয়ে চওড়া নয়, কিন্তু সব সময়েই অনেক জল থাকে, আর বনের ভিতর দিয়ে বেশ এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেবেই পোকা দেখতে বেরলুম— নদীর ধার দিয়ে

বনের ভিতর দিয়ে চললুম। খুব পরিষ্কার বন যে তা নয়। ঘাস ও লতাপাতায় প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে যায়। এরকম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে আমাদের দেশে ভয় করে কখন সাপের গায়ে পা পড়বে, এখানে সে-সব কোনো ভয় নেই।

অনেক পোকামাকড় সংগ্রহ করা গেল। পঙ্গপাল জাতীয় যে পোকা বিশেষভাবে দেখতে গিয়েছিলুম, তা খুব দেখলুম— সমস্ত বন ছেয়ে ফেলেছে। এ ভারি মজার পোকা। পঙ্গপাল ঠিক নয়— কোথাও থেকে উড়ে আসে না। এক জায়গাতেই বরাবর থাকে, কিন্তু ১৭ বৎসর অন্তর দেখা যায়। এই পোকা-গুলো এখন ডিম পাডবে, তা থেকে যে পোকা হবে সেগুলি মাটির ভিতর ১৭ বৎসর চুপচাপ থাকবে। তার পর হঠাৎ বেরিয়ে এসে, এতদিনকার খোলস বদলে চারি দিক ছেয়ে ফেলবে— কিন্তু বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে না।

আমাদের অধ্যাপকের আদবেই প্রফেসরী ভাব নেই। ছেলেদের সঙ্গে সর্বদাই গল্প ঠাট্টা চলছে। এদিকে লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর লেখা কীট-তত্ত্বের (Entomology) পাঠ্যপুস্তক প্রায় সকল কলেজেই আজকাল পড়ানো হচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে তিনজন ছাত্রী ও বাকি সবই ছাত্র ছিল। মেয়েরা ঘণ্টা দু'য়ের পরই বাড়ি ফিরে গেল। আমরা সেই Restaurantএ ফিরে এলুম। অর্থাৎ কি বুঝতে পাচ্ছো, জঙ্গলের ভিতর বেড়িয়ে বেড়িয়ে— উদরাগ্নি বেশ জ্বলতে আরম্ভ করেছিল। খেয়েদেয়ে আমরা একটা নৌকা ভাড়া করলুম। আমার সঙ্গে দু'জন ফিলিপিনো ছেলে এসে যোগ দিল। এখানে অনেকগুলো নৌকা ভাড়া দেবার জন্যে রাখে। এক-একটা বোটে কেবল তিনজন মাত্র বসতে পারে। অনেকদিন পরে দাঁড় টানতে খুব ভালো লাগছিল। প্রায় মাইল দুই দাঁড টানলুম।

নদীটি এমন সুন্দর যে কী বলব, বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। দু ধারের বড়ো বড়ো গাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। সেই পুলটার কাছে গিরিধির উশ্রী যেমন দেখতে অনেকটা সেই রকম। তবে অত উঁচু পাড় নয়, আর অনেক জল অথচ বেশি স্রোত নেই। বনের ভিতর কেও কোথাও নেই মাঝে মাঝে নদীর ধারে দু-একটা log-cabin। এগুলো ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকে এখানে এসে সপ্তাহখানেক বা পনেরো দিন গরমের সময় এসে বাস করে।

ফিরে এসে দেখি নদীর ধারে, একটা খোলা আটচালার মতো ঘরে, আমাদের অধ্যাপক পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর অনেকগুলি মেয়ে নাচছেন, আমাদের সঙ্গীরাও এই নাচে যোগ দিয়েছেন। এই ঘরটা নাচের জন্তেই রাখা। শুনলুম একদল মেয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের অধ্যাপককে চিনতেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে দেন ও তাঁরা নিজেরা নাচ শুরু করে দেন। নাচতে এ দেশের লোক পরিশ্রান্ত হয় না। আমার সামনেই দু-এক জন মেয়ে প্রায় দু ঘণ্টা নাচ চালালেন। আমাদের দু জনের কাছে ছবি তোলবার ক্যামেরা ছিল। মেয়েরা ছবি তোলবার জন্তে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। তাঁদের একটা group তুললুম। আরো ক'টা ছবি তুলেছি, কিরকম হয়েছে দেখো।

এই-সব ব্যাপারের পর বাসায় ফিরে এলুম। ফিরে এসে ব্যায়ামাগারের (Gymnasium) ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলে সাঁতার কেটে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিলুম। সেদিন বেশ গরম পড়েছিল। বাসায় এসে দেখি, এক গাদা চিঠি ও কাগজ এসে রয়েছে। সন্তোষ আমার সঙ্গে যায় নি। সে বেশ চিঠিপত্র পড়া শেষ করে পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। যায় নি বলে সে একবেলা আগে চিঠি পেয়েছে। এজন্তে সে মনে করছে খুব ভালোই করেছে। তোমার কি মনে হয়? এরকম একটা চড়িভাতির জন্তে এক বেলা চিঠি না দেখার ক্ষতিটা স্বীকার করা যেতে পারে না কি? ইতি ৮ই শ্রাবণ রবিবার

সেবক

শ্রীরথী

২

শ্রীচরণকমলেষু,

রথী পোকা সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। তবু তোমার চিঠিটা কত ছোটো দেখেছ তো? এবারে ভেবেছিলুম রাস্তায় নিশ্চয় জাহাজডুবি হয়েছে। তাই এই তিনদিন ধরে শোক করছিলুম— চিঠিগুলো নেহাত সমুদ্রে মারা গেল। তার পর শনিবারের দিন অতগুলো হারানিধি এক-সঙ্গে পেলে কার না আনন্দ হয়?
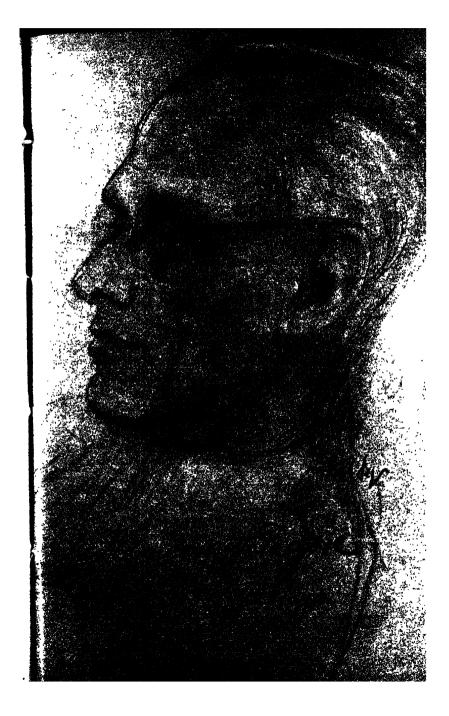
জানই তো ভায়া আজকাল কীটতত্ত্বের চর্চা করছেন। পোকার সঙ্গে তাঁর কিরকম সদ্ভাব সে তো দেখেইচ, ঘরের মধ্যে কাঁচপোকা কি আরসোলা দেখলে সে কিরকম অস্থির হয়ে পড়ত। তার অধ্যাপক আজকাল আদেশ দিয়েছেন পোকা দেখলেই বোতলে পুরবে। এখন পোকা তো আপনি আপনি বোতলে আসে না। রথীর কিরকম অগ্নিপরীক্ষা চলছে বুঝতেই পারছ! বেচারি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে দেড়গজ লংক্লথ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কোথাও একটা পোকার সন্ধান পেলেই তার উপর সেই দেড়গজ কাপড় নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তার পর ঘরে এসে, দরজা জানালা লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে কার্পেটের উপর কাপড় ঝাড়তে থাকে। কার্পেটের উপর ইট পাট্‌কেল প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস পড়তে থাকে। কিন্তু হায়— ফড়িং জাতটা এমনি দুর্বৃত্ত যে, বিজ্ঞানের খাতিরেও একটা পা দান করতে চায় না! দিনান্তে বেচারি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে আলো জেলে বসে থাকে, যদি একটা ফড়িং দৈবাৎ লাফিয়ে আলোর উপরে পড়ে! কিন্তু যেদিন থেকে ভায়া কীটতত্ত্বের সেই বড়ো বইটা ঘরে এনেছেন, সেদিন থেকে আলো দেখেও পোকারা আর ঘরে আসছে না।

এই তো অবস্থা! কাল তাই যখন ভায়া বললেন "চলো গোটাকতক পোকা ধরে আনা যাক্,— জায়গা শুন্‌চি বড়ো চমৎকার"— আমি তাতে রাজি হলুম না। তার পর ফিরে এসে অবধি ক্রমাগত আমার কাছে গল্প কচ্ছে— "কী চমৎকার! কী চমৎকার!"

ভায়ার চিঠিতে ওই যে-সব বর্ণনা কতটা খাঁটি একবার দেখতে যাব। তবে ফড়িং ধরা ব্যাপারটা যে সত্য তাতে আর সন্দেহ নেই। এক বোতল ফড়িং আমাদের পড়বার ঘরের জানালায় সাজানো রয়েছে। ইতি ৮ই শ্রাবণ

সেবক

শ্রীসন্তোষ

৩

শ্রীচরণকমলেষু,

গত ডাকের চিঠি কতকগুলো বাজে কথায় ভরানো গিয়েছিল। এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

বিশ্লেষ করে দেখবার জন্যে যে মাটি পাঠাবার কথা আছে, তা যেন বেশি পরিমাণে পাঠানো না হয়। আমাদের অধ্যাপক Dr. Hopkins বলছিলেন

পদ্মা বা বড়ো নদীর ধারের মাটি পরীক্ষা করে বিশেষ ফল হবে না। ওরকম পলিপড়া জমির পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়— ভিন্ন ভিন্ন রকম ফল পাবার সম্ভাবনা। এ-সকল জমি সাধারণত খুব ভালো, সুতরাং উর্বরতা (Soil fertility) নিয়ে কোনো হাঙ্গামা নেই, drainage প্রভৃতি নিয়েই যা-কিছু গোলযোগ।

অধ্যাপক বলছিলেন যে-জমিতে বহুকাল ধরে চাষ হয়ে এসেছে, ও চাষ ক'রে ক'রে যেখানে আর কোনো ফসলই হয় না, এমন-কি, সুটিওয়ালা কোনো ফসলও (Legume) জন্মাচ্ছে না, এ রকম পতিত জমি থেকে যদি খানিকটা মাটি পাওয়া যায়, তবে ভালো অনুসন্ধান চলে। অনেক জায়গায় ফসল হয় না, অর্থাৎ যাকে উষর জমি (Alkaline) বলে, তার মাটির দরকার নেই। যে জমি অনুর্বর নয়, কিন্তু ফসল দিয়ে দিয়ে একবারে অবসন্ন (exhausted) হয়ে পড়েছে এইরকম জমির মাটির দরকার। এরকম জমিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, হয়তো কেবল একটা কোনো ধাতু ফুরিয়ে গেছে। সেইটা দিলেই আবার বেশ আবাদ করা যায়। বাংলাদেশের উত্তর দেশে ও বিহার অঞ্চলে এ রকম জমি বোধ হয় অনেক আছে। তুমি হাতের গোড়ার যে-সব মাটিকে exhausted বলে মনে করবে, তা পাঠিয়ো। আর আমাদের অপরিচিত যে-কোনো লোক যদি ওই রকম মাটি সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তা হলে আমাদের অধ্যাপক দ্বারা তা বিশ্লেষ করিয়ে নিতে পারি। জমির গলদ কোথায় এবং তাতে কোন্ জিনিসটার অভাব আছে জানলে, অতি অল্প খরচে জমিকে খুব ভালো করা যেতে পারবে। এখানকার চাষ আবাদে লোকে ওই রকম মাটি বিশ্লেষ করে সার দেয়— আর রাশি রাশি ফসল পায়।

আমি আজকাল কেবলি যে মাটিই বিশ্লেষ করছি তা নয়, নানা রকমের grain ও গোরু-ঘোড়ার খাদ্যবস্তু (fodder) বিশ্লেষ করছি। আমাদের দেশে অনেক সুটিওয়ালা ফসল (legumes) আছে, যা এদেশে কেও জানে না। সেগুলির অল্প অল্প নমুনা যদি কেও আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তবে খুব ভালো হয়। এখানে যে-সব সুটিওয়ালা ফসল আছে, তার চেয়ে পুষ্টিকর যদি দু-একটা পাওয়া যায়, তবে এখানে সেগুলোর আবাদ শুরু করানো যেতে পারে। বজরা ও মাড়ুয়া প্রভৃতি ফসল এদেশে মোটেই নেই। সব চেয়ে যা ভালো বীজ তাই পাঠালে ভালো হয়। এখানে সুটিওয়ালা ফসল মানুষে অতি অল্পই ব্যবহার

করে। লতাপাতা ফল সবসুদ্ধ তুলে ও শুকিয়ে, এরা গোরু ও ঘোড়ার খাবার রূপে ব্যবহার করে।

আমাদের অধ্যাপক ডাক্তার হপকিন্‌স সাহেব সেদিন বলছিলেন, যদি পরীক্ষার জন্যে আমার কাছে কেউ মাটি পাঠান, তবে জমিটার সবরকম খবর যেন তার সঙ্গে লিখে পাঠান। অর্থাৎ জায়গাটা কোথায় এমনি ভাবে দেওয়া দরকার যেন, যে-কেউ গিয়ে ঠিক্ সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। আমাদের অধ্যাপক বলছিলেন, উনি একসময়ে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই যাবেন। যদি বিশেষ বিশেষ জায়গার মাটির বিশ্লেষে কোনো বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তবে উনি হয়তো ওই জায়গাগুলোতে নিজে গিয়েই উপস্থিত হবেন।

কি রকমে মাটি সংগ্রহ করতে হয় তার খবর একটু লিখে দিচ্ছি। যদি কেউ আমার কাছে মাটি পাঠাতে চান, তবে তিনি যেন এই উপায়ে নমুনা সংগ্রহ করেন—

যে-সকল স্থান বানের জলে ভেসে যায় না, (অর্থাৎ নদী থেকে দূরে), বা উপর থেকে যার উপরে ধোয়া জল জমে না, এরকম বহুদূর বিস্তৃত সমতল জমির মাটি সংগ্রহ করা উচিত। মাটি তোলবার আগর (Auger) ব্যবহার করা ভালো। যেখানকার মাটি নিতে হবে, সেখানকার ঘাস সরিয়ে আগর ঘুরিয়ে ৬-৭ ইঞ্চি বসাতে হবে। তার পর সেটাকে টেনে ওঠালেই খানিকটা মাটি উঠে আসবে। এই রকমে ১০-১৫ ফুট অন্তর ৬-৭টা গর্তের মাটি সংগ্রহ করে মিশাতে হবে। এর আন্দাজ তিন ছটাক মাটি নিলে সেটা surface soilএর নমুনা হবে।

এখন আবার সেই গর্তগুলোর কাছে গিয়ে আগর দিয়ে চেঁচে চেঁচে গর্ত একটু বড়ো করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, নীচেকার মাটি তোলবার সময় যেন উপরকার মাটি তার সঙ্গে চলে না আসে। এখন আগর ঘুরিয়ে ১৭ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত মাটি তুলতে হবে। নীচের মাটি শক্ত থাকলে একবারে তোলা যায় না। তিন-চারিবারে তুলতে হয়। সব গর্ত থেকে এইরকম মাটি নিয়ে, আগেকার মতো মিশিয়ে তবে তিন ছটাক আন্দাজ সংগ্রহ করে রাখলে, sub-surface soilএর নমুনা পাওয়া যাবে।

মাটি পাঠাবার সম্বন্ধে মোটামুটি সব খবরই দিলুম। যদি কেউ চেষ্টা করে পাঠান তবে, জমির উন্নতি সম্বন্ধে যা কর্তব্য আমি তাঁকে জানাতে পারব।

চিঠির হিসাবে মাটি প্যাক করে পাঠালে আধসেরে বোধ হয় ৪-৫ টাকা খরচ লাগে, কিন্তু parcel পোস্টে পাঠালে বোধ হয় প্রত্যেক সেরে বারো আনার বেশি— খরচ হবে না। সকল পোস্ট আফিসেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে।

কাল এখানে একজন ভারতবর্ষীয় ছেলে এসেছেন। তাঁর নাম, বি. ডি. পাঁড়ে— বাড়ি আলমোড়া। তিনি আমার সঙ্গেই জাপানে এসেছিলেন। তার পর আমরা যখন আমেরিকার জন্যে জাপান ছাড়লুম তার সপ্তাহখানেক পরে তিনি এখানে আসবার জন্যে বার হয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে, তাঁকে আমেরিকায় নামতে দেয় নি। কাজেই তাঁকে আবার জাপানে ফিবে যেতে হয়েছিল। এক বৎসর সেখানে অনিচ্ছায় বাস করে, এবারে ভালোয় ভালোয় এসে নেমেছেন। বোধ হয় আমাদের কৃষিকলেজেই পড়বেন। ইতি—১৬ই শ্রাবণ

সেবক
শ্রীরথী

প্রাসঙ্গিক

কস্‌মোপলিটান ক্লাব অধ্যায়ে রথীন্দ্রনাথের আমেরিকায় ছাত্রজীবনের কর্মধারার যে পরিচয় আছে তার পরিপূরক একটি বিবরণ প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৫ সংখ্যা থেকে উদ্‌ধৃত হল। বার্ষিক সূচী থেকে জানা যায়, লেখক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইনিও এ সময় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বরাষ্ট্রিক সমিতি

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতি বৎসরই বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক যুবক অধ্যয়ন করিতে আসেন; এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালী ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার মহা সুযোগ বিভিন্ন দেশ হইতে যুবকদিগকে এখানে আকৃষ্ট করে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই-সকল শিক্ষাকেন্দ্রস্থলে আশা ও আনন্দ লইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে যে-সকল যুবক আসেন, তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে সৌহার্দ স্থাপনের জন্য বহুদিন অবধি একটি সমিতির অভাব বোধ হইতেছিল। সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতা বিদ্বেষভাব ও 'উৎকট' স্বদেশপ্রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঔদার্যে, সার্বভৌমিক প্রীতিতে দীক্ষিত হন এই উদ্দেশ্য লইয়া একটি সমিতি স্থাপনের চেষ্টা হইল। ক্ষুদ্র চেষ্টার ভিতর দিয়া বিধাতার আশীর্বাদ কত বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠে, সার্বরাষ্ট্রিক (Cosmopolitan) সমিতির জন্ম তাহার একটি জলন্ত প্রমাণ।··· অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সমিতি বেশি দিন চলিবে না। কিন্তু যে সংকল্পে বিধাতার মঙ্গলস্পর্শে এত শক্তি, এত উদ্যম, এত উৎসাহ লইয়া আইসে তাহা জয়যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, সফলতা-নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া এই ক্ষুদ্র সমিতিটি আজ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমিতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ সর্বসুদ্ধ প্রায় ১২০ জন ইহার সভ্য। দুঃখের বিষয় আমাদের ভারতবর্ষীয় কোনো ছাত্র এখানে নাই; উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয় গোয়ালার ব্যবসায় (Dairy farming) শিক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট স্থান। আমাদের যুবকেরা যাঁহারা ওই বিদ্যা ও ব্যবসায় শিখিতে চান, উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী যুবকেরা এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের অন্যান্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রগণের সম্মুখে এক নব আদর্শ স্থাপন করিলেন। ইহাদের দৃষ্টান্তে একে একে এইরূপ সমিতি আজ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমি

সংক্ষেপে আরো দু-একটি সমিতির ইতিহাস আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে আমাদের দুই-তিন জন বন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। এখনো একাদশটি ভারতবর্ষীয় যুবক এই স্থলে অধ্যয়ন করিতেছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বরাষ্ট্রিক সমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একজন উৎসাহী আরজেণ্টাইন রিপাবলিকান (Argentine Republic, S. A.) যুবকের নাম বিশেষ ভাবে যুক্ত। ইহার নাম মডেস্টো কুইরোগা (Modesto Quiroga)। কর্নেলের কোনো ভারতবর্ষীয় বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি— কুইরোগা বিশাল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের নম্রতা, চরিত্রের মাধুর্য কর্নেলের ছাত্রমণ্ডলীকে তাঁহার ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তিনি যথার্থই জীবনে সাধনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন "Above all nation is humanity." উইস্কন্সিনের দৃষ্টান্তে বিদেশী যুবকদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করিবার জন্য কুইরোগা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি কলেজের কোনো কোনো অধ্যাপক ও বন্ধুদের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ১৯০৪ সালের ১০ই নভেম্বর বারন হলে এক মহতী সভা আহূত করিয়া তাঁহার প্রস্তাবকে সফল করিয়া তুলিলেন; কর্নেলের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফেসার কম্স্টক, বেইলি, বিস্টল, প্রভৃতি মনীষিগণ সর্বান্তঃকরণে কুইরোগার এই মহৎ চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; এক পক্ষ মধ্যে আর-একটি সভা আহূত হইল; রুসিয়ার একজন ছাত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; কর্নেলের বহুসংখ্যক অধ্যাপক, ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাকে মহাগৌরব দান করিয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে একখানি গৃহ ভাড়া করিয়া সমিতির কেন্দ্রস্থান নির্দেশ করা হইল। সভাপতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহখানিকে সুসজ্জিত করিলেন; বিভিন্ন জাতির পতাকা সংগ্রহ করিয়া গৃহে রক্ষিত হইল; এমন মিলন, এমন বিচিত্র সমাবেশ, জগতের সুদিনের মহাশান্তির সম্ভাবনাকে ঘোষণা করিতেছে।

এদেশে যতগুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কর্নেলের সমিতি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার মোট সভ্যসংখ্যা ৩৫০ জন। ভারতবর্ষীয় যুবক বাবু ইন্দুভূষণ দে মজুমদার কিছুদিন এই সমিতির সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। সার্বরাষ্ট্রিক সমিতির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতিটির বিবরণ কিছু লিখিব।

আমেরিকার নয়টি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইলিনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয় একটি। এদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকালেজের খুব খ্যাতি আছে। এতদ্‌ব্যতীত Engineering, Ceramics প্রভৃতি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত এখানে বেশ ভালো। এই শিক্ষাকেন্দ্রে বিদেশী যুবকসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাবরাষ্ট্রিক সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিল। কতিপয় উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় ১৯০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর সমিতি স্থাপিত হইল; আমাদের তিনজন বাঙালি যুবক তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহারা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সমিতির প্রতিষ্ঠাকার্যে যোগদান করিলেন। বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে সমিতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি প্রধান স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে। কতিপয় অধ্যাপকের সহানুভূতিতে, সভ্যদের উৎসাহে সমিতিটির কার্য অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষীয় যুবকদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিনটি বাঙালি যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন।

...কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সভাপতি The Hague Peace Conference-এ আমেরিকার প্রতিনিধি মাননীয় এনড্রু ডি. হোয়াইট (The Hon. Andrew D. White) আমাদের সমিতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যে কার্যে, যে উদ্দেশ্যে Hague Conference নিযুক্ত, তোমরাও সেই কার্য সম্পন্ন করিতেছ।"

...সাধারণত জনসাধারণের জন্য মাসিক একটি করিয়া সভা আহূত হয় এবং বিভিন্ন দেশের এক-একজন যুবককে তাঁহার নিজের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলিতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের কাহিনী, নানাপ্রকার সংগীত, ইত্যাদিতে সভাগুলি খুবই উপাদেয় হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীগণ উৎসাহের সঙ্গে ইহাতে যোগদান করেন।

মাঝে মাঝে এক-এক জাতিকে এক-একদিনের সমস্ত কার্যপ্রণালীর ভার লইতে হয়। এই "series of national nights" আমাদের সমিতির একটি বিশেষত্ব। এদেশের ছাত্রছাত্রীগণ খুব উৎসাহের সঙ্গে এই-সকল অভিনব ব্যাপারে যোগদান করেন। কিছুদিন পূর্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্রগণ "Indian night" সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় পতাকা ও দেশোৎপন্ন দু-একটি দ্রব্যদ্বারা গৃহখানি সজ্জিত করিয়া সমবেত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ভারতের কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন; একজন যুবক এস্রাজের সুমধুর ঝংকারে উৎসবের অঙ্গকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সেদিনকার সে উৎসবের মাধুর্য উপস্থিত জনসাধারণের স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আজও বহুজনের কাছে এস্রাজ যন্ত্রের ব্যাখ্যা ও গুণকীর্তন করিতে হয়।

সমিতির কর্তৃপক্ষগণ ইহার কার্যপ্রণালী সর্বদাই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নির্ধারণ করেন। যাহাতে বিভিন্ন জাতি ও দেশকে আমরা যথার্থ খাঁটিভাবে বুঝিতে পারি, যাহাতে একে অপরের কোনোপ্রকার স্বতন্ত্রতার জন্য ঘৃণা পোষণ না করে, আমাদের শিরায় শিরায় যে একই রক্ত প্রবাহিত ইহা আমরা যাহাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি, আমাদের সমিতির কার্যকলাপ সেই দিকেই চালিত হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য, ও নব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের সমিতি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয়

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮ ॥ ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের বংশধারা লুপ্ত হল অনেকের কাছে এই কথাই বিশেষভাবে শোকাবহ বলে বোধ হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কালের স্মৃতির 'পরে নিজগুণেও যে তাঁর কিছু দাবি ছিল সে কথা একরকম নেপথ্যেই রয়ে গেল। বস্তুত তিনি নিজেই, চেষ্টা করে নয় স্বভাববশেই, যে আত্ম-আবরণের পথে সারাজীবন চলেছিলেন তা তাঁর স্বীয় কৃতিত্ব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবার পথ নয়। পিতার জীবনব্রতের যথাসাধ্য আনুকূল্যের চেষ্টাকে তিনি তাঁর প্রধানতম কর্তব্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন— সে কর্তব্যসাধন তিনি সর্বদা নির্ভুল বিচারেই করতে পেরেছেন এমন কথা বলা চলে না, কার সম্বন্ধেই বা সে কথা বলা যায়— কিন্তু সেই কাজে তিনি যে তাঁর অবসর ও চিন্তা একরকম সম্পূর্ণই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ছাত্রজীবনের অবসানকাল থেকে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ভাষাব্যবহারে তাঁর যতটুকু অধিকার ছিল তার সম্পূর্ণ চর্চা করবার অবসর তিনি হাতে রাখেন নি; শিল্পকারুর যে-চর্চা করেছেন তা নিরহংকারভাবে লোকলোচনের অন্তরালেই করেছেন। ফলে এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে, বর্তমানে এদেশে যে-সব শিল্পকারু প্রচলিত তার কোনো-কোনোটির প্রবর্তক তিনিই; যে-শিল্পবোধ বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা শ্রীনিকেতনের বিবিধ কারুপণ্যের সুষমা- ও বৈচিত্র্য-সাধনে, শান্তিনিকেতনের শ্রীবিধানে নিয়োজিত হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর দান কতখানি তা আর স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেবার উপায় ছিল না। বস্তুত প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কোনো স্বীকৃতিতে তাঁর তেমন আগ্রহও লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি যশে বীতস্পৃহ উদাসীন পুরুষ ছিলেন না— কিন্তু তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পিতা ও তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তার বাইরে কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে তিনি কখনো ব্যগ্র হন নি। নয়তো, তাঁর পিতার কীর্তির কাছে নিষ্প্রভ হলেও, সে স্বাক্ষর সম্পূর্ণই জলের লিখন না-ও হতে পারত।

বাংলাদেশে আজ একটি প্রবল তর্ক, বাংলায় বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে কিনা। রথীন্দ্রনাথ যদি অভিনিবেশ সহকারে উদ্‌যোগ করতেন তবে তাঁর অধীত বিজ্ঞানবিষয়কে বাংলাভাষায় বহুজনবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করতে পারতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ক্ষমতার উজ্জ্বল দুটি প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন— 'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮) ও 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২)। এ দুটি বইই তাঁর পিতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত, বোধ করি আত্মপ্রকাশের দ্বিধাকে এইকালে তিনি একটুখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন। গুণগ্রাহী ইউসুফ মেহেরালি ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির একান্ত আগ্রহে তিনি ইংরেজিতে *On the Edges of Time* আখ্যায় যে আত্মজীবনস্মৃতি রচনা করেছিলেন আত্মকে অন্তরালে রেখে জীবনস্মৃতি রচনার তা একটি পরম দৃষ্টান্ত।

কর্ম বা অন্য সূত্রে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও ঘটেছিল আশা করি তাঁরা অন্তত এ কথা স্বীকার করবেন যে সৌজন্যে তাঁর সমতুল্য মানুষ বিরলদর্শন। আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন লোকব্যবহারে তাঁর গভীর ধৈর্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন মত পোষণ ও প্রকাশ কববার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি অব্যাহত ছিল। শান্তিনিকেতনের কর্মপরিচালনায় রথীন্দ্রনাথকে কখনো কখনো সহকর্মীদের কঠিন সমালোচনার ভাজন হতে হয়েছে; অনেকক্ষেত্রে এ-সকল সমালোচনার সংগত কারণ ছিল, তাঁর মতের প্রতিকূলতা কাজে বা কথায় যাঁরা করেছেন তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে তা করেন নি শান্তিনিকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাবশতই তা করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা এই যে, কঠিন সমালোচনার ফলে মনে যতই পীড়া বোধ করে থাকুন, বাক্যে বা ব্যবহারে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ধৈর্য তাঁকে রক্ষা করতে হয় নি, ধৈর্য তাঁর সহজাত ভূষণ ছিল।

মানুষের চরিত্রের এই-সকল গুণ জীবনান্তে কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন রেখে যায় না; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সহজ সৌজন্য ও বিরল ধৈর্যের ফলভোগী যাঁরা হয়েছেন জীবনে নানা অভিজ্ঞতার দিনে তাঁরা বারে বারে তাঁকে স্মরণ করবেন, তিনি কোনো অবিস্মরণীয় সাহিত্য- বা শিল্প-কীর্তি না রেখে গেলেও।

২

পিতার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার বাসনায় রথীন্দ্রনাথ প্রথম-যৌবনেই কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তরুণবয়সে তাঁর জন্মদিনে লেখা একখানি চিঠিতে— চিঠিখানি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত :

পদ্মার উপর
সোমবার
১৩ অগ্রহায়ণ

ভাই নগেন,

কালিগ্রাম থেকে আমরা বোটে করেই আবার ফিরে এলুম। বাবাকে কাল গোয়ালন্দে নামিয়ে রেখে এলুম, তিনি সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন কেননা পরশুদিন তাঁকে সেখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আমি এখন একলা পদ্মার উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি।

'আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর···
ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে ; অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি ; যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;···
গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন
করিছে কৌতুকালাপ ;···
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;'

কথাগুলো আমার না হলেও আজ দিনটা সত্যিই এমন প্রসন্ন নির্মল, অগ্রহায়ণের সুন্দর বাতাস সত্যিই মুখে চোখে এসে লেগে সব শীতল করে দিচ্ছে, আজ আবার আমার জন্মদিন, তাই বসে বসে অনেক কথা মনে হতে লাগল। এই কুড়ি বৎসবের সুখদুঃখের কথা ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এই মাসটা এলেই সেই সব কথা মনে পড়তে থাকে। সাত বৎসর হল এই সময়েতেই মা আমাদের ছেড়ে যান। আবার শমীরও এই মাসেতে জন্ম ও মৃত্যু দিন। ভগবান আমাদেব অদৃষ্টে আরও কি লিখেছেন কে জানে? বাবাকে যত দেখছি, ততই কষ্ট হচ্ছে— তিনি অবিশ্যি কিছু বলেন না— কিন্তু স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনও সুখ নেই। আমার কষ্ট আরও বেশি হয় এই জন্যে যে, আমি তাঁকে সুখী কবতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি তা হলেই যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু। আশা করি তুমিও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবে। বৈষয়িক বিষয়ে পবামর্শ দেবার ঢের লোক আছে— কিন্তু ভিতরেব কথায় সায় দেয়, ভাল কাজে সত্যিকার উৎসাহ দেয় এমন লোক খুব অল্পই। এবার শিলাইদহ পৌঁছলেই তো আমার যথার্থ কাজ আরম্ভ হবে। প্রথম কিছু মাস কাজ বুঝতেই যাবে। তাব পরে আস্তে আস্তে চাষাদের উন্নতি করবার পথে অগ্রসর হতে পাবব। শিলাইদহে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে— তবে একলা থাকবার একটিমাত্র অসুবিধা যে, কেউ নেই যাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কথা বলতে পারি, সেইজন্য আমাকে একটা library করতেই হবে। মনে করছি আমার মানিক বৃত্তি থেকে, কিছু কিছু দিয়ে standard author-দের works বছর দুইয়ের মধ্যে কিনে ফেলব। Living Age কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, একটা দু ডলার মাসিক subscriptionএ একটা masterpiece series দিচ্ছে—সস্তা বলে বোধ হল।··· এক মাসের টাকা পাঠানো হয়ে গেছে— তুমি একখানা বই নমুনা আনিয়ে দেখে, তাদের আমার নামে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিও। আর যদি অন্য কোথাও কারও Complete Works বা কোনও series সস্তায় বিক্রী হচ্ছে দেখ তো খোঁজ নিয়ে আমাকে জানিও।

Agricultural Libraryও আস্তে আস্তে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। আমি ভরসা করছি— তুমি bulletins সমস্ত সংগ্রহ করছ— যেগুলো পাও

তার মধ্যে বিশেষ interesting কিছু যদি থাকে তো আলাদা করে পাঠিয়ে দিও। আমার কাছে যা আসবে আমি যত্ন করে রাখব। Magazine পাঠাবার দরকার নেই। বিদ্যালয়ে কিছু আসে না— কিন্তু প্রবাসীর সঙ্কলন অংশের ভার বাবার হাতে পড়ায় যত exchange magazines আসে রামানন্দবাবু সব বাবাকে দেন— সঙ্কলন হয়ে গেলে সেগুলো বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বোধ হয় দেখেছ এখন প্রবাসীর খুব উন্নতি হয়েছে, ১০০ পাতা reading matter— দামও খুব কম রাখা হয়েছে। subscription আর কিছু বাড়াতে পারলেই বাইরের get-up ভাল করতে পারবেন ও লেখকদের উপযুক্ত বেতন দিতে পারবেন।...

আমি আপাততঃ চাষীদের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট industry স্থাপন করবার চেষ্টা করব মনে করছি। মুরগী ও হাঁসের ব্যবসাটা খুব সহজ হবে— সকলেই যদি দশটা বিশটা করে পাখি পোষে তা হলে ডিম ও পাখি সংগ্রহ করে আমি কলকাতায় পাঠাতে পারব; বেশ যখন চলতে থাকবে তখন নিজে ছেড়ে দিয়ে চাষারাই যাতে co-operation করে সেটা চালায় তার চেষ্টা করব। প্রথমে তারা co-operation বুঝবে না, ক্রমশ একদিকে co-operative dairying, bee-keeping প্রভৃতি ও অন্যদিকে ডালা ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি তৈরী করার ব্যবসা introduce করতে হবে। ছোট ছোট cottage industry বিনা আমাদের দেশের চাষাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যা জমি আছে তা থেকে খোরাক পোষাক চলে না। এসব জায়গায় খুব কম চাষা আছে যার মহাজনের কাছে কিছু দেনা নেই। সবসুদ্ধ দেনা শোধ দেওয়া তাদের কোনও জন্মে সম্ভব হবে না। ধান ভানার জন্য threshing machineও একটা কিনতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাহলে আবার একজন expert আনতে হয়। তোমার পক্ষে কি এটা শেখা সম্ভব হবে? সর্বদা দৃষ্টি রাখবে কোনও রকম ছোটখাট simple devices বা machineএর খোঁজ পাও কিনা। আর একটা কথা মনে রেখো যদি ইতিমধ্যে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন খবর পাও তো তাঁর সঙ্গে Californiaর seedless orangeএর কিছু চারা পাঠাতে চেষ্টা কোরো। Sylhetএ ব্রজেন্দ্রকিশোরবাবুর মস্ত লেবুর বাগান আছে— সেখানে seedless লেবুর গাছ করা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। আর আমাকে অল্প কিছু Sunn hemp, California

fig, musk melon ও water-melon-এর বীজ পাঠিও। আরও কি কি পাঠালে ভাল হয় পরে লিখব···। রথী

পিতাকে সুখী করবার জন্য নিজেকে 'একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে', পিতার আরব্ধ কর্মের প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিতে রথীন্দ্রনাথ যে যৌবনকাল থেকে জীবনের প্রায় প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেজন্য লোকলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ না করলেও পিতার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন যার চেয়ে কাম্য পুরস্কার তাঁর পক্ষে আর কিছু ছিল না। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের সে কবিতা তেমনভাবে লোকসমাজে প্রচারিত হয় নি, সেটি উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

'মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি ; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে,
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন,
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্রদেবতারূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।
সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।

তোমার সকল চিত্তে,
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
তার লাগি যশ নাই পেলে।
কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।
মানবের ইতিহাসে
যে সকল খ্যাত নাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার।

মন্দগতি গেছে কত দিন
মন্থর দৈন্যের ভারে কৃচ্ছ্রশীর্ণ বিশ্রামবিহীন।
ভাগ্যের করুণা কাজ করে
নির্মম ঔদাস্যবেশে আকাঙ্ক্ষার দূর অগোচরে
বিধাতার প্রত্যাশিত বর
প্রতিক্ষণে সেবা চাহে দেয় শুধু সন্দিগ্ধ উত্তর।
সফল ভাবীর জাগরণ
ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সংকেতে।
অবশেষে অঙ্কুরের দেখা মেলে কৃষিদীর্ণ ক্ষেতে,
প্রসন্ন অঘ্রানে
সোনার আশ্বাস লাগে ধানে।

প্রৌঢ় সেই শরতের সফল দিনের জয়ধ্বনি
অন্তর আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হোতে
আনন্দের স্রোতে।
সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায়প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র 'পরে।'

পুলিনবিহারী সেন

রথীন্দ্র-স্মৃতি

১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসে বিদ্যালয় খুলেছে পূজাবকাশের পর— আমি সম্ভ এসেছি। শুনলাম কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এসেছেন ছুটির পর তাঁর পুরাতন শিক্ষক ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই তাঁকে প্রথম দেখলাম। রথীন্দ্রনাথ আমার থেকে চার বৎসরের বড়ো। সুতরাং পরিচয় ও শখ্যতা হতে সময় লাগল না। এই ১৯১০ সাল থেকে ১৯৬০ সালে এখান থেকে শেষ বিদায় গ্রহণের দিন পর্যন্ত— দীর্ঘকাল তাঁকে নানাভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

কলকাতায় রথীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' ক্লাব গড়লেন জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে তিনি আছেন অন্তরালে কর্ণধার রূপে। আমি তখন থাকি কলকাতায়—রোজ যাই সেখানে সকাল-বিকাল। রথীন্দ্রনাথকে কর্মীরূপে দেখবার সুযোগ পেলাম। 'বিচিত্রা' ক্লাব এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার কথা বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। এই সময়ের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা মনে পড়ছে—যে-ঘটনার মধ্য থেকে তাঁর মৌল ভদ্রতার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। কবির এক জন্মোৎসবে ঠাকুরবাড়ির কোনো আত্মীয়দের ব্যবহারে আমরা কয়েকজন নিমন্ত্রিত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। রথীন্দ্রনাথ সেটি জানতে পেরে তখনই আমাদের ক্ষোভ শান্ত করলেন। তার পরদিন প্রাতে কলকাতার এক গলিতে আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় রথীন্দ্রনাথ হঠাৎ মোটর নিয়ে হাজির হলেন—গত রাত্রের ঘটনার জন্য দুঃখ-প্রকাশ করে চাইলেন মার্জনা। আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করছেন, রথীন্দ্রনাথ আছেন পিতার পাশে। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধাবিরতি ঘোষিত হয় এবং ১৯১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তি স্থাপিত হল। এই নূতন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রথীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতনে। সেই-যে এসে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নিলেন, তার পর ১৯৫৩ পর্যন্ত একাধিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার উৎসরূপে থেকে সেবা করে যান। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী ভারত-

সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। রথীন্দ্রনাথ হন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য। 'বিশ্বভারতী'র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতিলাভের পশ্চাতে রথীন্দ্রনাথের যে বিচিত্র কর্ম-প্রচেষ্টা ছিল সে-কথা আজ অজ্ঞাত।

১৯১৯ সালে জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের পঠন-পাঠন শুরু হয় স্থানীয় কর্মিবৃন্দ ও অধিবাসীদের নিয়ে। অনেকেই অধ্যাপনা করতেন। রথীন্দ্রনাথ Genetics বা সৌজাত্যবিদ্যা পড়াবার ভার নিলেন। এইখানে তাঁকে দেখলাম শিক্ষক রূপে। এই জটিল বিষয়কে সরস করে বোঝাবার জন্য উত্তমরূপেই প্রস্তুত হয়ে আসতেন তিনি, experiment দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করতেন।

রথীন্দ্রনাথের মেজাজটা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের। এই দোটানার মধ্যে তাঁর জীবন যায় কেটে। শিল্পী রথীন্দ্রনাথকে দেখা যায় উত্তরায়ণ- অট্টালিকা ও উদ্যান রচনায়। এখানেও বিজ্ঞানীকে পাই— যখন দেখি তাঁর উদ্যানের মাঝে গুহাঘরে যাবার পথে লতাবিতান। এই লতা সাধারণ বল্লরী নয়— এগুলি আম সপেটা পেয়ারার গাছ। যত্নের সঙ্গে ডাল-গুলিকে 'লতানে' করেছেন বেঁধে-বেঁধে। এই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটি আমগাছ নিয়ে ; রথীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে তার পরীক্ষা করেন।

তাঁর উদ্যান ছিল দেখবার মতো। ভিতরের দিকে কত ভাবে কত গাছ রোপণ করেছিলেন— ক্ষুদ্র হ্রদ, তার মাঝে পথ। বাড়ির বাইরে ছিল তাঁর গোলাপ বাগান— কত জায়গা থেকে নানা বর্ণের, নানা রূপের গোলাপ। জানি না, আজ সেই শিল্পীমনের দরদ নিয়ে কেউ তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কিনা। হয়তো পাসকরা মালী, উদ্যান-বিজ্ঞানী রুটিন মাফিক কাজ করেন— হয়তো গাছপালার যত্নও হয়, কিন্তু তাদের মূক-ভাষা কি তাঁরা শুনতে পান ?

রথীন্দ্রনাথ কারুশিল্পী ছিলেন। দারুশিল্পের যে-নমুনা তিনি বহুযত্নে বহু-কাল ধরে করেছিলেন, তা আজ কোথায় জানি নে। বিরাট কাষ্ঠফলকে নানাবর্ণের কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে, প্রান্তরের যে-চিত্র রচনা করেছিলেন তা তুলনাহীন-সৃষ্টি। চিত্রাঙ্কণে— বিশেষভাবে নানা ফুলের ছবি আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই-সব চিত্রাঙ্কণে বিজ্ঞান বিকৃত হয় নি।

বিশ্বভারতীকে সুন্দর করে গড়বেন—এই ছিল রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। কিন্তু

তা পূরণ হয় নি। উত্তরায়ণ-অট্টালিকা ও তার পরিবেশ রচনায় তাঁর শিল্পী-সত্তার পরিচয়ের কথা পূর্বে বলেছি। উত্তরায়ণ-অট্টালিকা নির্মাণকে construction বলব না— এটা হল creation। কারণ বাড়িটা ক্রমে-ক্রমে গড়ে উঠেছে— রূপ থেকে রূপান্তরিত হয়ে। এই কাজে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর— যিনি বিশ্বভারতীতে স্থাপত্যসৃষ্টির সুযোগ লাভ করে ভারতে স্থাপত্যবিশারদ রূপে সম্মান অর্জন করেন। সহকর্মীরূপে একটি sweet reasonableness দিয়ে সকলকে কর্মে ব্রতী রাখতেন; 'মনিবগিরি' করতে কখনো দেখি নি তাঁকে। কর্মক্ষেত্রে কতবার তাঁর সঙ্গে আমার সংঘাত বেধেছে, কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু সে-সব মনে রেখে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অনেক সময়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলেছেন—'প্রভাত, মনে কিছু কোরো না।'—সব মিটে গেল এক-কথায়।

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার স্পষ্ট ব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে না হয়ে থাকলেও বিশ্বভারতীর একটি সদন বিশেষভাবে তাঁর স্মৃতি অদৃশ্যে বহন করছে সে কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—সেটি রবীন্দ্রসদন। আমাদের দেশে বরেণ্য লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতির ধারণা নেই; রবীন্দ্র-পূর্ব স্মরণীয় লেখকদের পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র সামান্যই পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকেই পিতার পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহে তাঁর কর্মময় জীবনের অবকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন যে-সময় এ-সবের চল ছিল না। কবির বন্ধু ও অনুরাগী যাঁরা তাঁর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের অনেকের কাছ থেকেও পরে অনেক চেষ্টা করে সেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এক পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র কপি করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে বহু চিঠি রক্ষা পেয়েছে এবং অনেকটা তারই ফলে চিঠিপত্র গ্রন্থমালা প্রকাশিত হতে পারছে। তাঁর নির্দেশেই রবীন্দ্রনাথের রচনা একসময় থেকে কপি হয়ে প্রেসে যেতে আরম্ভ করে যার ফলে এক কালের বহু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়ে আজ বিচিত্র গবেষণার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার যৌবনকালের কথা মনে আছে, পৃথিবীর যেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত বিবরণ প্রকাশিত হত রথীন্দ্রনাথ তার

কর্তিকা সংগ্রহ ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন ; এগুলি বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হত—এগুলি ছিল বলে 'রবীন্দ্র-জীবনী'র অনেক অংশ লেখা সহজ হয়েছিল। এ যখনকার কথা তখন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের নিদারুণ অর্থকষ্টের কাল— তার মধ্যেও রথীন্দ্রনাথ এ-সকল ব্যবস্থা করতে অবহিত ছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে পিতার স্মরণে রবীন্দ্র-ভবন সংগঠনে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বিশ্বভারতীর সেই আর্থিক সংকটের মধ্যে যতটা সম্ভব তাঁর উদ্যোগ সফল হয়েছিল। তাঁর সারাজীবনের পাণ্ডুলিপি ফোটোগ্রাফ চিত্রসংগ্রহ তিনি এখানে দান করেন পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও অন্যান্যের অনুরূপ পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ ইত্যাদির দানে তা পুষ্ট হয়। ভবিষ্যতে যদি রবীন্দ্র-ভবন রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাথ্যিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হতে পারে তবে যেন আমরা স্মরণ রাখি যে রথীন্দ্রনাথই এর মূলে ; এই ভবনের সার্থকতার দ্বারাই অলক্ষ্যে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা হবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সেই নেপথ্যচারী মানুষটি

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে কাটিয়েছেন, শেষ নিশ্বাসটিও ত্যাগ করলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। ভিড়ের মানুষ ছিলেন না, হৈ-চৈ ভালোবাসতেন না। সমস্ত দেশ যখন রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের কলরবে মুখর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে নিঃশব্দে চলে গেলেন। শান্তিনিকেতনেও দেখেছি উৎসব কোলাহল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতেন। জীবনভর সমস্ত কাজই নিঃশব্দে করেছেন, কখনো কোনো ব্যাপারে তাঁকে ত্রস্ত ব্যস্ত হতে দেখি নি। কাঠের কাজ কিংবা চামড়ার কাজ করবার ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে মৃদুস্বরে কাজকর্মের নির্দেশ দিতেন। প্রখর বুদ্ধি এবং সহজাত রুচি-বোধের বলে কোনোরকম সোরগোল না করে দিব্য শৃঙ্খলার সঙ্গে সব কাজ সমাধা করতেন। একটা যে কাজ চলছে এবং বড়ো রকমের কাজই চলছে তা মোটেই 'টের পাওয়া যেত না। কাজেই তাঁর পরলোকগমনের সংবাদে যে কথাটি সর্বপ্রথম আমার মনে হয়েছিল সেটি এই যে— ইনি বরাবর জীবনের একটি ছন্দ বজায় রেখে চলেছিলেন, মৃত্যুতেও তার ছন্দ পতন হয় নি।

চিরকাল নেপথ্যচারী মানুষ, মৃত্যুও ঘটল নেপথ্যে। এমন-কি জয়ন্তী উৎসবের কোলাহলে মৃত্যুসংবাদটিও সহজেই ডুবে গেল। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির দীপ্তি অনুচর পরিচর সকলের উপরেই অল্পবিস্তর পড়েছিল, সব চাইতে কম পড়েছে রথীন্দ্রনাথের উপরে কারণ তিনি থাকতেন সকলের পেছনে। জনতার দৃষ্টি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলতেন। এমনভাবে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারাও একটা আর্ট। পিতা যতদিন ছিলেন ততদিন নিজস্ব জীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না। পিতার কর্মেই একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই আত্মবিলোপের মর্যাদা অপরে কতখানি বুঝেছে জানি না কিন্তু স্নেহশীল পিতা অবশ্যই তার মূল্য বুঝেছিলেন। পুত্রকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন,

> কর্মের যেখানে উচ্চদাম
> সেখানে কর্মীর নাম
> নেপথ্যেই থাকে একপাশে।

কোনো কালে এতটুকু আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেন নি। এই প্রচার-সর্বস্ব যুগে এটিকে আমি যথার্থই মহৎ গুণ বলে মনে করি। অল্পদিন পূর্বে ইংরেজি ভাষায় লিখিত তাঁর আত্মচরিতমূলক যে গ্রন্থখানি ('অন দি এজেস অব টাইম') প্রকাশিত হয়েছে তাতেও প্রধানত পিতার কথাই লিখেছেন, নিজের কথা সামান্যই বলেছেন। আজীবন পিতৃগৌরবেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন। অথচ নিজে যে-সব গুণের অধিকারী ছিলেন তাতে নিজগুণেই তিনি জীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, প্রাণতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কৃষিবিদ্যায় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেছিলেন, উদ্যান রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহ ছিল— অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিতের অনুবাদ তার নিদর্শন। চিত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য না হলেও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কাঠ এবং চামড়ার কাজে— বিশেষ করে কাঠের কাজে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাকে প্রতিভা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইদানীং সিমেণ্টের সাহায্যে নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুতের পরীক্ষায় নাকি নিযুক্ত ছিলেন। শুনেছি বলেছিলেন : এবার ছুতোরের কাজ ছেড়ে আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করেছি।

এই সূত্রে বহুদিন পূর্বে শোনা তাঁর একটি উক্তি মনে পড়ছে। আমাদের কর্মিমণ্ডলীর সভায় একবার নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন : "জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।" কথাগুলি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজেকে অকিঞ্চন ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা তাঁর স্বভাবগত ছিল, সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এখানে এই কথা কটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তিনি মূলত সাহিত্যিক। সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক সময় সাহিত্যিক প্রসাদগুণ প্রকাশ পেত। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি, এটি পরিতাপের বিষয়। ইংরেজি বাংলা কিছু কিছু লেখা এককালে তিনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। পিতার অসামান্য প্রতিভায় তাঁর মন সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন ছিল ; বোধকরি এই কারণেই আপন ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনোকালেই আস্থা আসে নি। ফলে ঐ-সব লেখার বেশির ভাগই অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছে।

সংসারে অনেক রকমের ত্যাগ আছে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপরের সেবায়

আপন সম্ভাবনার বিলোপ সাধন যে কতখানি ত্যাগ সে কথা সব সময়ে আমরা মনে রাখি না। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন : আমার নিজস্ব জীবন আমি কোনোকালে যাপন করি নি। বলা বাহুল্য, কথাটি ওঁর মুখে বড়ো করুণ শুনিয়েছিল। যা হোক্ এখানে কেবল আত্মবিলোপের কথাই বলছি না। সাংসারিক অর্থে আমরা ত্যাগ বলতে যা বুঝি সে কথাই বলছিলাম। একদা যে-সব কর্মী এবং অধ্যাপক নামমাত্র বেতনে শান্তিনিকেতনেব কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের আদর্শবাদ এবং স্বার্থত্যাগের কথা অনেকে অনেক সময় বলেছেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ যে বিনা বেতনে বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন সে কথার উল্লেখ খুব কম লোকেব মুখেই শুনেছি। এ ছাড়া আরো কোনো কোনো কথা আমরা সব সময়ে মনে রাখি না কিংবা ভেবে দেখি না। রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতার বিত্ত এবং সম্পত্তির উপরে পুত্রের অধিকার আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্ক-এ ডিপজিট রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারীর নিশ্চয় তাতে সায় ছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী— বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি— তিনি বিশ্বভারতীকে দান করলেন। তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূর সাগ্রহ সম্মতি না থাকলে কি কখনো তা সম্ভব হত? এ-সব তো বড় ছোটোখাটো ত্যাগ নয়। কিন্তু এই ত্যাগের কথা দেশবাসীর মুখে কখনো উচ্চারিত হয়েছে বলে আমি শুনি নি। দেশবাসী বলে নি, কিন্তু পুত্র যে তাঁর ন্যায্য পাওনা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন পিতা সেজন্যে নিঃসন্দেহে গর্বিত বোধ করেছেন; আশীর্বাদ করে বলেছেন—

সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।

ঋণের দায়ে জমিদারি গত-প্রায়। আয়ের অঙ্ক হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে আসছে। এই অবস্থাতেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে যে-সব বিদেশী অধ্যাপকদের এখানে আনানো হয়েছিল তাঁদের যাতায়াত, রাহা খরচ ইত্যাদি ব্যাপারে রথীন্দ্রনাথকে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, এ কথা নিজমুখেই একদিন আমাকে বলেছিলেন। শ্রীনিকেতনের নানা বিভাগের মধ্যে শিল্পসদন বিভাগটি বলতে গেলে তাঁর এবং প্রতিমা দেবীর নিজ হাতে গড়া জিনিস।

চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্পের কাজ, বটিকের কাজ এঁদের দুজনের উৎসাহেই শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় এর জন্যেও রথীন্দ্রনাথকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য সেটাই বড়ো কথা নয় কিংবা একমাত্র কথা নয়। আমার মতে শ্রীনিকেতন শিল্পসদনের সঙ্গে প্রতিমা দেবী বা রথীন্দ্রনাথের নাম এই কারণে গ্রথিত থাকা উচিত যে বাংলাদেশের রুচি গঠনে এই শিল্পসদন বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। শ্রীনিকেতনের শিল্পসামগ্রীর অনুকরণ আজ দেশময় চলছে— এর মূলে কে, কার উৎসাহে এবং উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল একদিন হয়তো দেশবাসী তা ভুলে যাবে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রথীন্দ্রনাথের ন্যায় শোভন রুচিসম্পন্ন মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। গৃহনির্মাণে, গৃহসজ্জায় এবং উদ্যান রচনায় তাঁর সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পীমনের পরিচয় সুস্পষ্ট ছিল।

তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে নানা কাজে তাঁর খুব নিকট সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছিল। তখন বিশ্বভারতী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে চলেছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন, পঠন, পাঠন রীতিনীতি দৈনন্দিন জীবনধারা কি রকম হবে তারই একটা খসড়া প্রস্তুত করবার জন্যে আমাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। ঐ সূত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি যে, শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ না হলেও বহু বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনার ফলে তিনি বিশ্বভারতীর স্বভাবচরিত্রটা বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর কোনো কোনো মতামত আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেরই শিক্ষা —পরীক্ষাসর্বস্ব— অন্তত সেই ব্যাপারটা এখানে যাতে না ঘটে, বিশ্বভারতী নিতান্ত গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত না হয় সেই দিক থেকে কিছু ভাবনা চিন্তা ঐ খসড়াতে করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, যথাবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য শুরু হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই নানাবিধ কমিটি কাউন্সিলের ধাকায় আমাদের সেই খসড়াটির অপঘাত মৃত্যু ঘটল। পরে উক্ত খসড়ার দুর্গতি নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্যপরিহাস হত। বলা বাহুল্য, সেই পরিহাসের বেশির ভাগই অত্যন্ত করুণ।

বিশ্বভারতীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বহু বৎসর কর্মসচিব রূপে তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। পরে যখন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে পরিণত হল তখন তিনিই হলেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। মাত্র দুটি বৎসর উপাচার্যরূপে বিশ্বভারতীর কার্য পরিচালনা করেছিলেন। তার পরে অকস্মাৎ তিনি কার্যভার ত্যাগ করে চলে যান। রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন আর শান্তিনিকেতনে এমন দ্রুত পরিবর্তন শুরু হল যে আজ তাকে শান্তিনিকেতন বলে চেনাই দুষ্কর। রবীন্দ্র-সংগীতের যেমন একটি নিজস্ব গায়কী আছে শান্তিনিকেতন জীবনেরও তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি তার জীবনধর্ম। শান্তিনিকেতনের মর্ম যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা জানেন যে Santiniketan is nothing if not a particular way of life. সেই জীবনধারাটি বিনষ্ট হতে বসেছে।

রবীন্দ্র-সংগীতে তান বা স্বরবিস্তারের অবকাশ নেই, বেশি মোচড়াতে গেলে কোমলস্বভাব গানটির পাছে মর্মপীড়া ঘটে সে ভয় তাঁর ছিল। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধেও ঐ কথাটি খাটে। এর মধ্যে এমন কোনো জিনিসের অন্তর্ভুক্তি তিনি চান নি যা এর স্বভাববিরুদ্ধ। বলতে গেলে সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা একটি পাঠ্যক্রমকে অবলম্বন করে, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা একটি জীবনধারাকে আশ্রয় করে। সেই মূল কথাটি স্মরণ রাখা হয় নি। এর ফল বিষময় হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ যতদিন কর্মকর্তা ছিলেন ততদিন তিনি একটি সংগতি বা লয় রক্ষা করেছিলেন। কালক্রমে আকারে প্রকারে নানা পরিবর্তন আসতেই পারে কিন্তু তার মধ্যেও সংগতি রক্ষার প্রয়োজন আছে। রথীন্দ্রনাথ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগতিবোধটি চলে গেল। ফলে শান্তিনিকেতনের জীবন সুরে লয়ে তালে সংগতির অভাবে কেমন যেন বেসুরো বাজতে লাগল। তাঁর সহজাত সৌন্দর্য-বোধ, সৌজন্যবোধ এবং কর্মকুশলতা শান্তিনিকেতনের জীবনকে আশ্চর্য এক সুষমা দিয়েছিল। এ যে কত বড়ো কৃতিত্বের কথা একটি কথা বললেই তা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও বারো বৎসর কাল তিনি বিশ্বভারতীর সর্বময় কর্তা ছিলেন। শান্তিনিকেতনের জীবনধারাটি অব্যাহত এবং শান্তিনিকেতন জীবনের লাবণ্যটিকে তিনি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিলেন বলেই কবি-প্রয়াণের এত বড়ো শূন্যতাও সেদিনকার শান্তিনিকেতন জীবনে ততখানি প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ কার্যভার ত্যাগ করে যাবার অনতিকাল মধ্যেই শান্তিনিকেতনের জীবন এতখানি শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল যে তাঁর অভাবটি সকলে স্পষ্টতঃ অনুভব করেছেন।

নানা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। নিজে গুণবান বলেই গুণের সমাদর করতে তিনি জানতেন। কর্মীদের কার কী গুণ আছে সব খবর তিনি রাখতেন। তাঁর কার্যকালে সত্যিকারের কোনো গুণী ব্যক্তির অনাদর হয়েছে এমন কথা আমি কখনো শুনি নি।

খুব অল্পকালের জন্যেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার পরে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। তবে অল্পদিনে যতটুকু তাঁকে জেনেছিলাম তাতে তাঁর সহৃদয়তার অনেক পরিচয় পেয়েছি। তাঁর অসাধারণ সৌজন্য স্বভাবগত বিনয় এবং মৃদু স্বভাব আমাকে যথার্থই মুগ্ধ করেছিল। খুব সামান্য কথা— তবু সে-সব অন্তরঙ্গ দিনের কথা আজ মনে পড়ছে। আমি অতিমাত্রায় চা-বিলাসী, এ কথা জনরবে শুনে থাকবেন। যখনই ডেকেছেন দেখেছি চায়ের সরঞ্জাম এবং আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত, নিজহাতে চা ঢেলে দিয়েছেন। আমার দরিদ্র গৃহে কখনো কখনো তাঁর শুভাগমন হত। এসে প্রায়ই দেখেছেন চায়ের কাপ সমুখে নিয়ে আমি বসে আছি। ঘরে ঢুকেই বলতেন : that inevitable cup of tea !

বিশ্বভারতীর যিনি উপাচার্য তিনি আমাদের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর কাজে সাহায্য করা আমাদের নিয়মিত কর্তব্যের অন্তর্গত। কিন্তু এমনি তাঁর সহজাত সৌজন্য যে সামান্যতম কাজের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। একবার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের ভাষণটি লিখে দিতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। দুদিন পরে এক চিঠি পেলাম : আপনার দৌলতে অনেক প্রশংসা অর্জন করা গেল। আজ দুদিন ধরে বহু লোক এসে সমাবর্তন ভাষণের জন্যে আমাকে প্রশংসা জানিয়ে গিয়েছেন। আমি যে কী ভয়ানক লজ্জিত বোধ করছি কি বলব। মনে হচ্ছে আপনার প্রাপ্য প্রশংসা আমি ছিনিয়ে নিয়েছি ইত্যাদি। কর্তা এবং কর্মীর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক একমাত্র শান্তিনিকেতনেই সম্ভব। যাক ব্যক্তিগত কথা আর নয়। আমার স্বভাব রথীন্দ্রনাথের বিপরীত। তিনি আত্মগোপনে সিদ্ধহস্ত, আমি আত্মপ্রচারে। অতএব এখানে শেষ করাই বিধেয় নতুবা নিজের কথাই এক কাহণ হবে।

শান্তিনিকেতনের যাঁরা পুরোনো অধিবাসী তাঁরা আমার চাইতে ঢের বেশি তাঁকে দেখেছেন এবং জেনেছেন। সেদিন প্রভাত মুখোপাধ্যায় মশায়

বলছিলেন—"তোমরা আর ক'দিন দেখেছ, কতটুকু জেনেছ। পুরোনোরা তো সকলেই চলে গিয়েছেন, থাকবার মধ্যে প্রভাত মুখুজ্জে আর সুরেন কর। রথীবাবুর কথা জানতে হলে এদের কাছেই যেতে হবে। পঞ্চাশ বছরের পরিচয়। সুখে দুঃখে একই স্থানে, একই কাজে দীর্ঘদিন আমরা যুক্ত ছিলাম। কত সময় কত ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো তিক্ত হয় নি। কত উপলক্ষে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পেয়েছি।" আজীবন নেপথ্যবাসী বলে তাঁর অনেক গুণের কথা এখানকার অধিবাসীরাও জানেন না। দু-একজনের মুখে শুনেছি, বিপদে আপদে নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করতেন কিন্তু সমস্তই গোপনে। ডান হাতে যা দিতেন বাঁ হাতও তা টের পেত না।

যে মানুষ সারা জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছেন আজ যখন তিনি লোকান্তরে চলে গিয়েছেন তখন লোকসমক্ষে তাঁর গুণকীর্তন করে লাভ কি? লাভ তাঁর নয়, আমার। জীবদ্দশায় প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে গেলে তিনি কতখানি কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হতেন সে আমি অনায়াসে অনুমান করতে পারি। কিন্তু লজ্জা এবং কুণ্ঠা এক-আধটু আমাদেরও তো থাকবার কথা। গুণমুগ্ধ এবং স্নেহস্নিগ্ধ সহকর্মী হয়েও তাঁর সম্পর্কে কোনোদিন যে একটি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি নি সে দুঃখ এবং লজ্জা আজ রাখব কোথায়? মনকে কী দিয়েই বা প্রবোধ দেব!

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

চিত্র-প্রসঙ্গ

দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥ কলকাতার নাগরিকবৃন্দের অভিপ্রায়ক্রমে এফ. আর. স্যে দ্বারকানাথের চিত্র অঙ্কন করেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এটি সংরক্ষিত। এই চিত্র অবলম্বনে জি. আর. ওয়র্ড যে এনগ্রেভিং-চিত্র প্রস্তুত করেন তারই প্রতিলিপি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। এই এনগ্রেভিং-এর একটি কপি কলকাতা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে রক্ষিত আছে, তার থেকেই এই প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে; শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনেও এই এন্‌গ্রেভিং-এর একটি কপি আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত এই প্রতিকৃতির মূল চিত্র শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকারে রক্ষিত। ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত এই প্রতিকৃতির মূল চিত্র বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে রক্ষিত। ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ শ্রীমুকুলচন্দ্র দে -অঙ্কিত ও তাঁর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত এই চিত্র শ্রীভোলানাথ দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পদ্মা ॥ মূল চিত্র রবীন্দ্রভারতী সমিতির সংগ্রহভুক্ত। ব্লক বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

মলাটে যে ফুলের ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি রথীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত, শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেটি প্রকাশিত হল। কারুশিল্পে রথীন্দ্রনাথের যৌবনকাল থেকেই অপরিসীম আগ্রহ ও অসামান্য দক্ষতা ছিল; প্রৌঢ় বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কণেও উৎসাহী হন। সুহৃজ্জনদের একান্ত আগ্রহে ও অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস সোসাইটির উদ্‌যোগে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে নিউ দিল্লিতে তাঁর কৃত কারুনিদর্শন ও চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার উদ্‌বোধন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ যা লিখেছিলেন এখানে তা উদ্‌ধৃত

করা গেল— এই-সকল কারুকর্ম ও চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য এই রচনায় প্রতিভাত—

'Rathindranath Tagore is a maker of Form. To the art of India of today he gives back the dignity of its craft. Out of the Storehouse of his mind he shapes the order of things and their fitness. He carves objects from many woods and paints the portraits of many flowers. His work does not belong to any school. Self-taught and straight-forward it follows the discipline of first principles and applies them with a tenderness of precision to small objects and pictures.

'They belong to the house where one should see and use them every day. Caskets and cigarette cases, trays, stands and like are proportionate each in its own parts as much as to its use. Ebony and Gambhar or any jungle wood are carved with accurate delicacy ; it is fostered by a racial memory wherein mastery over curves and planes evokes architectural associations. Nothing however is copied from and no revivals are attempted of any phase of Indian art. The traditions of Indian architecture are the unknown guardians under whose command Rathindranath Tagore gives to small objects the charm of their structure and felicities of texture. They range from rustic surfaces to agate-smooth planes rich with the grain of their wood. Some of the objects are inlaid and others painted. In some cases, designs by Pratima Devi and Surendranath Kar contribute to the enhancement of their shapes.

'The art of living has many varieties Its pattern is

indissoluble from its background. Santiniketan, the Visva-Bharati, is the background and home of Rathindranath Tagore and his work. He furnishes the edifice which Rabindranath Tagore, his father, has built so that each small thing is in its place, the seats and caskets, the flowers in their bowls, all ready for use and delight

'The flowers he painted in vraious media, in a technique of his own where colour is structural and the background of the picture pulsates with their vibrations. Rathindranath Tagore knows flowers by his love for them and by science. He is a biologist by training. He is also the architect of his garden in Santiniketan. To its luxuriant harmony he has brought plants from many parks of the earth and from the undergrowth of the Indian jungle ; he has made them all thrive together each in the soil it requires. He cares for them, knows and paints them. With loving science he draws the firm logic of their patterns and gives them the space and ground on which they breathe their fragrance.'

শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথের উদ্যানচর্চার বৈজ্ঞানিক দিক প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন ('প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) এই গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

'. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করিয়া ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং নূতন নূতন ফলমূল শাকসব্জি উৎপাদনে উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টার অগণিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষিপ্রধান হইলেও আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ব্যপদেশে দুই একটি উদ্ভিদের কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকিলেও ব্যাপকভাবে কৃষিকার্যে অথবা উদ্ভিদ উৎপাদনে তেমন কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই বিষয়ে শান্তিনিকেতনে যে সকল কাজ হইতেছে তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা ও তৎসম্পর্কিত অসাধারণ কর্মদক্ষতা লইয়া বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতার উৎকর্ষ সাধন এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রধানতঃ পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ হইলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রের অনেক স্থলে সাফল্য লাভ হইয়াছে। টোমাটো গম প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফসল যাহা শান্তিনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনুর্বর ভূমিতে কোন কালেও জন্মাইতে দেখা যাইত না, সে সবগুলিকেও তিনি সফলতার সহিত জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুদৃঢ় কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা সমন্বিত আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছগুলিকে তিনি দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া লতা গাছে পরিবর্তিত করিয়াছেন; তাহার ফলে দেওয়ালের শোভা বর্ধন, বেড়ার প্রয়োজন এবং তৎসহ ফলোৎপাদন— এই কয়েকপ্রকার কাজই সম্পাদিত হইতেছে। স্থানীয় জমির ক্ষয় এবং তজ্জনিত অসমতা নিবারণকল্পে তিনি অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত যেরূপ কৌশল সহকারে দেশী-বিদেশী বিবিধ উদ্ভিদের সহায়তা লইয়াছেন তাহা সত্যসত্যই অনুধাবনযোগ্য। মাটির আঁট বাঁধিবার জন্য একপ্রকার সুগন্ধি ঘাস আমদানি করিয়াছেন, এগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্টভাবে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে যে, মনে হয় একদিকে যেমন

ইহারা জমির ক্ষয়নিবারণ এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইবে অপর দিকে তেমনই অদূরভবিষ্যতে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। পরিত্যক্ত পুরাতন আম্রকুঞ্জের নিষ্ফলা গাছের গুড়ির সহিত নূতন ডালপালার জোড় মিলাইয়া পুনরায় সেগুলিকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তা ছাড়া এরূপ অনুর্বর ভূমিখণ্ডে কর্পূর, হিং, এলাচ প্রভৃতি নানারকমের গাছ জন্মাইয়াছেন। তাহাদের সতেজ পত্রপল্লব, আয়তন এবং বৃদ্ধির হার দেখিলে মনে হয়, অচিরেই ইহারা দেশের সর্বত্র বংশবিস্তারে সাফল্য লাভ করিবে। আলোক এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া তিনি ঐ স্থানে আনারস উৎপাদনেও কৃতকার্য হইয়াছেন। তাঁহার গোলাপবাগ এবং সব্জি বাগানের ফুলফল, লতাপাতার অবস্থা দেখিলে ঐ স্থানের মৃত্তিকার অনুর্বরতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা স্বাভাবিক। বিশ্বভারতীর বহুমুখী বিরাট কর্মক্ষেত্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া এবং অবসরমত যন্ত্রবিজ্ঞান ও ললিতকলার অনুশীলনে সময় ক্ষেপ করিয়াও তিনি যে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়াই মনে হয়।'

—